শরৎচন্দ্রের

জীবন ও সাহিত্য

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা ৭০০০৭৩

'স্বল্প-আয়ু এ জীবনের যে-কয়টি আনন্দিত দিন
কম্পিত পুলকভরে সংগীতের বেদনা-বিলীন,
লাভ করেছিলে, লক্ষ্মী, সে কি তুমি নষ্ট করি যাবে ?
সে আজি কোথায় তুমি যত্ন করি রাখিছ কী ভাবে
তাই আমি খুঁজিতেছি। সূর্যাস্তের স্বর্ণমেঘ স্তরে
চেয়ে দেখি একদৃষ্টে—সেথা কোন্ করুণ অক্ষরে
লিখিয়াছ সে জন্মের সায়াহ্নের হারানো কাহিনী !'

যাঁহার প্রবর্তনায় আমি শরৎ-সাহিত্য সমালোচনায় প্রবেশ করি,
যাঁহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের রবীন্দ্রকাব্যপাঠ আজও আমার স্মৃতি স্পন্দিত করে,
যাঁহার গণিতের অধ্যাপনানৈপুণ্য একদা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব ছিল,
যিনি স্বল্প-আয়ু এ জীবনের কয়টি আনন্দিত দিনের অবসানে
অকালে প্রিয়জনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন,
সেই সাহিত্যরসিক, বিদগ্ধ, অগ্রজপ্রতিম সুহৃদ্
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে
স্মরণ করিয়া আমার শরৎ-সমালোচনা পরিসমাপ্ত করিলাম।

ভূমিকা

বহুকাল পূর্বে শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে একটি সমালোচনাগ্রন্থ প্রকাশ করি। তারপর অনেকবার মনে হইয়াছে ব্যাপকতর পরিধিতে শরৎচন্দ্র ও তাঁহার সৃষ্টির বিচারের প্রয়োজন আছে। কিন্তু অবসরের অভাবে পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে পারি নাই। বৃহত্তম অবকাশের দ্বারপ্রান্তে পহুঁছিয়া সেই কাজ কোন-ক্রমে সমাপ্ত করিলাম। একই সমালোচকের একই উপন্যাস সম্পর্কে দুইখানি বইয়ে সুরের ঐক্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু ইহা ছাড়া আগেকার এবং এখনকার এই বইয়ের মধ্যে বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গি ও আলোচনা-পদ্ধতিতে কোন সাদৃশ্য নাই ; বরং দুই-একটি জায়গায় বৈপরীত্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। এই রকম একাধিক আলোচনার সহাবস্থান অসঙ্গত হইবে না মনে করিয়া প্রকাশক উভয় গ্রন্থই পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। যেখানে পরস্পরবিরোধী মন্তব্য দেখা যাইবে, পাঠক নিজের অভিরুচি অনুসারে একটি গ্রহণ করিবেন অথবা দুইটিই বর্জন করিতে পারেন।

বর্তমান গ্রন্থ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে শরৎচন্দ্রের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। গত পঞ্চাশ বৎসরে শরৎচন্দ্রের একাধিক পূর্ণাঙ্গ জীবনী অথবা কোন কোন অধ্যায়কে আশ্রয় করিয়া অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে এবং বিরোধেরও অভাব নাই। শরৎচন্দ্রের অনেক চিঠিপত্রও প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাও শরৎচন্দ্রের জীবনী ও চরিত্রের উপর আলোকসম্পাত করে। জীবনী ও সমালোচনা গ্রন্থ সবগুলি না হইলেও অনেকগুলি আমি পড়িয়াছি। যে সকল বিবরণ আমার কাছে সমধিক সম্ভাব্য বলিয়া মনে হইয়াছে আমি তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। সত্যাসত্যের বিতর্কের মধ্যে আমি যে প্রবেশ করি নাই এমন নহে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে প্রামাণ্য জীবনীরচনা আমার উদ্দেশ্য নহে। কিভাবে ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতা সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে বা সাহিত্যকে প্রভাবিত করিয়াছে তাহাই আমার বিবেচনার বিষয়। যাঁহারা নির্ভরযোগ্য জীবনচরিত পড়িতে চাহেন তাঁহারা শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের রচনাসমূহ পড়িতে পারেন। এই

সুযোগে আমি তাঁহার কাছে আমার ঋণ স্বীকার করিতেছি। অবশ্য তাঁহার সকল সিদ্ধান্তের সহিত আমি একমত নই।

দ্বিতীয় অংশে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার পরিচয় দিতে এবং তাঁহার প্রতিভার ক্রমবিকাশের বিবরণ দিতে প্রয়াসী হইয়াছি। প্রতিভার বিকাশে কালানুক্রমিকতা থাকে কিনা ইহা লইয়া মতভেদ আছে। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কালানুক্রমিক নিরিখ প্রয়োগে আর একটা অসুবিধাও আছে। শরৎচন্দ্র নিজেই বলিয়াছিলেন, 'In Bengal, I am the only writer who has not had to struggle.' ইহার অন্যতম কারণ এই যে, তাঁহার প্রাথমিক রচনায়ও পূর্ণপরিণতির স্বাক্ষর রহিয়াছে। 'সাহিত্য'-পত্রিকায় প্রকাশিত 'কাশীনাথ' গল্পের প্রথম খসড়ায় এবং 'বড়দিদি', 'মন্দির' প্রভৃতি গল্পে উচ্চাঙ্গের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ ইহাও বলা যাইতে পারে যে, অভিজ্ঞতার প্রাচুর্য ও অনুশীলনের ফলে তাঁহার সৃষ্টি জটিলতা ও ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। সেইজন্য কালানুক্রমিকতা, বিষয়ের বৈচিত্র্য, শিল্পকলা—এই সকল বিভিন্ন দিকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শরৎচন্দ্রের রচনার বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়াছি। আমার বক্তব্য যাহাতে স্পষ্টতা লাভ করে এবং কেন্দ্রচ্যুত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য কোন কোন রচনা অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য পাইয়াছে এবং কোন কোন রচনা অবহেলিত হইয়াছে। 'রামের সুমতি', 'সতী' প্রভৃতির দীর্ঘ আলোচনা আছে, 'বিন্দুর ছেলে', 'অনুরাধা' শুধু উল্লিখিত হইয়াছে এবং 'নববিধান', 'দর্পচূর্ণ', 'পরেশ' একেবারে বাদ পড়িয়াছে।

আলোচনার সুবিধার জন্য সাহিত্য-বিচারে শরৎচন্দ্রের রচনাবলীকে তিন বা চার পর্বে ভাগ করিয়াছি। বর্মাযাত্রার পূর্বেকার এবং বর্মায় প্রবাসের সময় (১৮৯৩-১৯১৬ সাল) এই প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বকে প্রস্তুতি পর্ব এবং কলিকাতায় অর্থাৎ শিবপুর, সামতাবেড় এবং কলিকাতায় অবস্থানকালকে পরিণতি পর্ব বলা যাইতে পারে। এই পর্বকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব আখ্যা দিয়াছি, কারণ 'পথের দাবী', 'শেষ প্রশ্ন' ও 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের রচনাপদ্ধতি অন্যান্য উপন্যাসের রচনাপদ্ধতি হইতে বিভিন্ন। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে 'প্রস্তুতি' ও 'পরিণতি' কথা দুইটি শিথিলভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। সর্বশেষে সসঙ্কোচে শরৎচন্দ্রের জীবনদর্শনের রূপ-রেখা দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

বন্ধুবর শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের অনুরোধে এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হই। কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার আগ্রহ ও উৎসাহ স্মরণ করিতেছি। সুসাহিত্যিক ডক্টর

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ইহার তাৎপর্য লইয়া তাঁহার সঙ্গে আমার আলোচনা হয়। অবশ্য আমি যে ব্যাখ্যা দিলাম তাহার সঙ্গে সুধাংশুবাবুর কোন সম্পর্ক নাই। ইহার দোষ-ত্রুটির দায়িত্ব আমার। অন্যান্য অংশেও অনেক অপূর্ণতা ও ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। আমার ছাত্র শ্রীপ্রতিভাকান্ত মৈত্র নিষ্ঠার সহিত পাণ্ডুলিপি পড়িয়া সংশোধনের পরামর্শ না দিলে ইহাদের সংখ্যা ও গুরুত্ব আরও বেশি হইত।

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

জীবনী

উপক্রমণিকা

১

কোন সাহিত্যিকের জীবনীর সঙ্গে তাঁহার স্বষ্টির কোন সম্পর্ক আছে কিনা এবং সাহিত্যবিচারে সাহিত্যিকের জীবনী-আলোচনার কোন সার্থকতা আছে কিনা তাহা বিতর্কের বিষয়। পৃথিবীর সব চেয়ে বড় সাহিত্যিক শেক্সপীয়রের জীবনের মূল ঘটনা আমরা অনেকটাই জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু তাহা হইতে তাঁহার বিচিত্র স্বষ্টির কোন সন্ধান পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না।

স্থিরমতি সমালোচকেরা মনে করেন যে, শেক্সপীয়রের নাটক ও তাঁহার বহির্জীবনের ঘটনা, ইহাদের মধ্যে কোন সংযোগসেতু নাই। হয়ত অন্যান্য অনেক কবির সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। টেনিসনের জীবনী আলোচনা করিতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'কবি কবিতা যেমন করিয়া রচনা করিয়াছেন, জীবন তেমন করিয়া রচনা করেন নাই।' তিনি এই প্রবন্ধে ও অন্যত্র যাহা বলিয়াছেন তাহাকে এই ভাবে শব্দান্তরিত করা যাইতে পারে, কবির কাব্য অলৌকিক রসের আস্বাদ বহন করিলেও তাঁহার বহির্জীবন সাধারণতঃ অন্য পাঁচজন লোকের জীবনের মতই গদ্যময় হইয়া থাকে।

শেক্সপীয়র প্রসঙ্গেই ফিরিয়া আসা যাক্। শেক্সপীয়র অভিনেতা ও নাট্যকার ছিলেন ; এই উভয় পেশাই তাঁহার আমলে ইতর বলিয়া পরিগণিত হইত। তাঁহার বাবা জন্ শেক্সপীয়র ছিলেন দস্তানা-ব্যবসায়ী (কেহ কেহ বলেন কসাই), কিন্তু সম্পন্ন গৃহস্থ হইলেও তিনি জেন্ট্‌লম্যান বা ভদ্রপদবাচ্য ছিলেন না। পুত্রের জন্মের কয়েক বৎসর পরেই তিনি জেন্ট্‌লম্যানের সরকারি খেলাতের আবেদন করিয়া ব্যর্থ হয়েন। ইহার প্রায় ত্রিশ বৎসর পর, বোধ হয় পুত্রের আগ্রহাতিশয্যে এবং অর্থানুকূল্যে, তিনি ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় দরখাস্ত করিয়া এই কৌলীন্য অর্জন করেন। কিছু কাল পরে বিত্তশালী হইয়া পুত্র শেক্সপীয়র অবসর গ্রহণ করিয়া জেন্ট্‌লম্যানের মর্যাদায় শোভিত হইয়া পল্লীনিবাসে বসবাস করিতে থাকেন। অথচ শেষ বয়সের রচনা দি উইনটার্স টেল নাটকে মেষপালক বৃদ্ধ পিতা এবং তাহার গবেট ছেলে—শেক্সপীয়র তাহাকে শুধু ক্লাউন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—জেন্ট্‌লম্যান হওয়ার সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে এবং এই বেয়াকুবি লইয়া নাট্যকার প্রচুর হাস্যরসের সঞ্চার করিয়াছেন।

আবার মোটামুটিভাবে ইহাও মানিতে হইবে যে, ভাষা মানুষের ভাবের বাহন। কবির বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি নিজের মনের ভাব এমন সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন যে তাহার মধ্যে বিশ্বের মানুষ নিজেদের অন্তরাত্মাকে চিনিতে পারে। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, শেক্সপীয়র তাঁহার নাটকে নিজের সুখদুঃখ, প্রণয়-বিদ্বেষের কথা বলেন নাই, কিন্তু সনেটের মধ্যে স্বীয় হৃদয় উদ্ঘাটিত করিয়াছেন (with this key/Shakespeare unlocked his heart)। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের এই উক্তির উপর শ্লেষাত্মক মন্তব্য করিয়া কবি ব্রাউনিঙ বলিয়াছেন, 'তাই নাকি? এই চাবি দিয়া তিনি হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দিয়াছেন? তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার শেক্সপীয়রত্ব খানিকটা ক্ষুণ্ণ হইল!' (Did Shakespeare? If so, the less Shakespeare he!) অর্থাৎ তাহা হইলে জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলিয়া তিনি যে মর্যাদা পাইয়া আসিয়াছেন তাহার খানিকটা লাঘব হইল।

ব্রাউনিঙ্ বলিতে চাহেন যে, শ্রেষ্ঠ শিল্পের প্রধান লক্ষণ নৈর্ব্যক্তিকতা এবং পরিপূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকতার জন্যই শেক্সপীয়র জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। অপর একজন কবি-সমালোচক বলিয়াছেন, সাহিত্য ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নয়, বরং নিজের নিজত্ব হইতে মুক্ত হইয়াই কবি কাব্য রচনা করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে অভিনব গুপ্তের বিখ্যাত উক্তি স্মরণীয়—ন মুনেঃ শোক ইতি মন্তব্যম্, অর্থাৎ মানুষ বাল্মীকি ক্রৌঞ্চের সহচরীনিধনজনিত যে শোক অনুভব করিয়াছিলেন আর যে শোক কবি বাল্মীকির—তথা ভারতীয় সাহিত্যের—প্রথম কবিতার স্থায়ী ভাব তাহা এক বস্তু নহে। এই মন্তব্য মানিয়া লইলেও ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রিয়জনবিয়োগ হইতে উত্থিত শোকই 'শ্লোকত্ব' প্রাপ্ত হইয়াছে। এই কথা আনন্দবর্ধনও বলিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে জীবনের অভিজ্ঞতাই কাব্যে রূপান্তরিত হয়। রস অ-লৌকিক, কিন্তু লৌকিক জীবনই তাহার ভিত্তিভূমি। সুতরাং কবির জীবন ও কাব্য একেবারে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।

সাহিত্যের এই মৌলিক সত্যটি খুব স্পষ্ট ও সহজভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব বিচার প্রসঙ্গে। তিনি দেখাইয়াছেন, কাব্যের উপাদান তিনটি—অভিজ্ঞতা, সহানুভূতি ও কল্পনা। বলা বাহুল্য কল্পনাই ইহাদের মধ্যে প্রধান। অভিজ্ঞতা সকলেরই হয়, সহানুভূতিও অনেকের থাকে, কিন্তু কবিই কল্পনার সাহায্যে নূতন জগৎ রচনা করিতে পারেন। বর্তমান

প্রসঙ্গে অভিজ্ঞতার স্থানই নির্ণয়ের বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্র একটি নেতিবাচক দৃষ্টান্তের দ্বারা অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করিয়াছেন। দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে অনেক জায়গায় কোর্টশিপের চিত্র আছে। কিন্তু বাংলার তদানীন্তন সামাজিক অবস্থায় সেই জাতীয় নায়ক-নায়িকার অস্তিত্ব ছিল না এবং দীনবন্ধুর বর্ণনানুরূপ প্রণয়-নিবেদনের অবকাশ ছিল না। সেই জন্য শুধু কল্পনার বলে লীলাবতী ও কামিনী বা বিজয় ও ললিতমোহনকে জীবন্ত করা সম্ভব হয় নাই। যাহা নাই তাহার প্রতি সহানুভূতি দেখান সম্ভব নহে এবং যেহেতু কবির কল্পনা অভিজ্ঞতার অধীন সেই জন্য এই সকল জায়গায় দীনবন্ধুর কল্পনা নিষ্ফল হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন যে, দীনবন্ধুদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবিদের কল্পনা সর্বাতিশায়ী, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি কল্পনার আজ্ঞাধীন। সেই জন্য শেক্সপীয়র এরিয়েল বা ক্যালিবান প্রভৃতি চিত্রকে জীবন্ত করিতে পারিয়াছেন। বাস্তব জগতে এরিয়েলের মত অশরীরী জীব বা ক্যালিবানের মত অর্ধ-মানব, অর্ধ-দানব অপ্রাপণীয়; শেক্সপীয়র শুধু কল্পনাবলে তাহাদিগকে জীবন্ত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম যুক্তি গ্রহণ করিয়া আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলা যাইতে পারে যে, যেখানে কবি অলীক বস্তুর কল্পনা করেন সেইখানেও কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা, বাস্তব আশা ও কামনার ভিত্তি থাকা চাই। সভ্য মানুষ সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া অসভ্য আদিম মানবকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধিতে চায় আবার স্বাধিকারচ্যুত অসভ্য মানুষ বিজেতার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করে; সে আগন্তুক প্রভুকে বিতাড়িত করিতে অক্ষম বলিয়া আজগুবি অভিযানে অবতীর্ণ হয়। যে প্রকৃতির কোলে মানুষ হইয়াছে এবং কোন কৃত্রিম শিক্ষা পায় নাই তাহার সৌন্দর্যানুভূতি খুব তীক্ষ্ণ হইবে, ইহা স্বাভাবিক এবং বঙ্কিমচন্দ্রই অন্যত্র বলিয়াছেন যে, বহিঃপ্রকৃতির প্রতি অভিমুখীনতা মানুষকে কামার্ত করিয়া তোলে। এই সকল স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়াই শেক্সপীয়র ক্যালিবানের মত অস্বাভাবিক চিত্র আঁকিতে পারিয়াছেন। আবার, শেক্সপীয়রের সমকক্ষ কবি দান্তে অনেকটা সোজাসুজিভাবেই কাব্যের মধ্যে নিজের আকাঙ্ক্ষা, জুগুপ্সা, বিদ্বেষ প্রভৃতির অবতারণা করিয়াছেন।

২

সাহিত্যিকের জীবনী রোমাঞ্চকরই হউক বা গদ্যময়ই হউক তাহার সকল অংশেরই নিজস্ব আবেদন আছে। কিন্তু সাহিত্যবিচারে সেই ঘটনারই তাৎপর্য আছে যাহা তাঁহার সৃষ্টিতে প্রতিফলিত হইয়াছে, যাহা তাঁহার সৃষ্টির পরিধির পরিচয় দেয় অথবা যাহার আলোকে সেই সৃষ্টি উদ্ভাসিত হয় বলিয়া সহৃদয়ের রসাস্বাদ সহজ হয়। যাহার সঙ্গে সৃষ্টির সম্বন্ধ স্পষ্ট হয় নাই, সেই অংশ অনেকটা অবান্তর। এই প্রসঙ্গে দুইটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রবাদ আছে, শেক্সপীয়র স্যার টমাস লুসির সংরক্ষিত বনে অনধিকার প্রবেশ করিয়া হরিণ চুরি করিয়া শাস্তি এড়াইবার জন্য পলায়ন করিয়াছিলেন এবং সেই সূত্রেই লণ্ডনে আসিয়া উপনীত হয়েন। যদি এই ঘটনা সত্য হয় তাহা হইলে ঘটনা হিসাবে ইহা যুগান্তকারী বটে, কারণ শেক্সপীয়র লণ্ডনে আসিয়া থিয়েটারে যোগদান না করিলে বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—শেক্সপীয়রের নাটক—হয়ত অলিখিতই থাকিয়া যাইত। কিন্তু শেক্সপীয়রের নাটকবিচারে ইহার কোন মূল্য নাই, কারণ দুই একটা দূরাগত, অস্পষ্ট ধ্বনি ছাড়া কোথাও ইহার কোন প্রভাব লক্ষিত হয় না। সুগায়ক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভ্রাতা রাজেন্দ্রনাথের অনুকরণে শরৎচন্দ্র ইন্দ্রনাথের চিত্র আঁকিয়াছেন ইহা অনেকেই বলিয়াছেন এবং হয়ত এই উক্তির মধ্যে খানিকটা সত্য আছে। কিন্তু সাহিত্য-বিচারে ইহার কোন মূল্য নাই। প্রথমতঃ ইহা প্রমাণও করা যায় না বা অপ্রমাণও করা যায় না যে, রাজেন্দ্রনাথকে দেখিয়া তাহারই অনুকরণে শরৎচন্দ্র ইন্দ্রনাথের চরিত্রের পরিকল্পনা করিয়াছেন। শেক্সপীয়রের প্রসিদ্ধ জীবনীকার ই. কে. চেম্বার্স বলিয়াছেন, 'One cannot be expected to argue whether Lord Buckhurst was or was not Sir Toby Belch'। দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত কাহিনীর মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্র ইন্দ্রনাথের চরিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহাদের যথাযথ, অনলঙ্কৃত বিবরণ পাইলেই শরৎচন্দ্রের দেশকাল-অনালিঙ্গিত, অ-লৌকিক প্রতিভার স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইবে। অন্য যে কোন লোকের জীবনচরিতের মত শরৎচন্দ্রের জীবনী লিখিতে হইলে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে, কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাহিত্যিকের জীবনে সেই তথ্যেরই মূল্য আছে যাহা তাঁহার রচনায় প্রতিফলিত হইয়াছে।

নানা কারণে শরৎচন্দ্রের জীবন সম্পর্কে পাঠকসম্প্রদায়ের কৌতূহল জাগ্রত হইয়াছে এবং সেই কৌতূহল চরিতার্থ করিতে বহু লোক বহু আজগুবি কাহিনী রটনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবই এত বিস্ময়কর যে তাঁহার প্রতিভার উৎসমুখে যাইবার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। আধুনিক কালে যখন সাহিত্য অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পাঠকসম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের জন্য মুদ্রিত গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে তখন হইতেই দেখা গিয়াছে লেখককে ধীরে ধীরে বহু বাধা ও বিরোধিতা অতিক্রম করিয়া স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছে। শরৎচন্দ্রকে কিন্তু এই জাতীয় বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। তিনি নিজেই নিজের সম্পর্কে লিখিয়াছেন, 'In Bengal, perhaps, I am the only fortunate writer who has not had to struggle.' (বাংলায় আমিই বোধ হয় একমাত্র লেখক যাহাকে খ্যাতির জন্য প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয় নাই।) ১৩১৪ (১৯০৭) খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতী' মাসিকপত্র নামোল্লেখ না করিয়া তাঁহার 'বড়দিদি' উপন্যাস ছাপিতে আরম্ভ করিলে পাঠকবর্গ চমৎকৃত হয় এবং কথিত আছে যে অন্যান্যের সঙ্গে বঙ্গদর্শন সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন ইহা রবীন্দ্রনাথের রচনা। ইহার কিছুকাল পরে শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে' 'রামের সুমতি' ও 'পথ-নির্দেশ' ফণীন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত 'যমুনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া পাঠক-সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেই আলোড়নের ঢেউ বাংলার নিভৃত পল্লীতেও পহুঁছিয়াছিল এবং আমরা স্কুলের ছাত্ররাও টের পাইয়াছিলাম। শরৎচন্দ্র নিজেই এই সম্পর্কে পরে লিখিয়াছিলেন, 'Some of my old acquaintances started a little magazine,.........and after much persuasion they succeeded in extracting a promise from me to write for it This was in the year 1913......I sent them a short story for their magazine Jamuna. This became at once extremely popular, and made me famous in one day. সুতরাং এই সাহিত্য-গঙ্গার উৎসধারা খুঁজিবার জন্য আগ্রহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

খুব ভাসাভাসা ভাবে যাহা জানা গেল তাহাতে রহস্য আরও ঘনীভূত হইল এবং কৌতূহল আরও বেশি উদ্রিক্ত হইল। রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আধুনিক সাহিত্যরথীরা প্রায় সকলেই উচ্চশিক্ষিত, অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত, স্বচ্ছলতার মধ্যে প্রতিপালিত এবং তাঁহাদের সকলের কর্মক্ষেত্রই

বঙ্গদেশ বিশেষ করিয়া কলিকাতা। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেন ঘোর অমাবস্যার মধ্যে শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রের অভ্যুদয় হইল। লেখক অখ্যাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার শিক্ষাদীক্ষার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া গেল না এবং শোনা গেল তিনি সুদূর ব্রহ্মপ্রদেশে কি একটা ছোট চাকুরি করেন। যে সমস্ত গল্প বাহির হইতে লাগিল তাহাদের নায়িকারা প্রেমাসক্তা বিধবা, শুদ্ধচরিত্রা বারবনিতা বা স্বামিত্যাগিনী কুলনারী। সুতরাং তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন আরও রহস্যবিজড়িত হইয়া প্রতিভাত হইল। এই সব নারীদের আদিরূপ কোথায়?

আর একটি কারণেও এই সদ্য উদীয়মান অথচ পূর্ণপ্রস্ফুটিত শিল্পীর সম্পর্কে পাঠকসম্প্রদায়ের কৌতূহল জাগ্রত হইল। ইহা তাঁহার প্রতিভারই বৈশিষ্ট্য। তাঁহার রচনায় এমন একটা প্রত্যক্ষতা, অন্তরঙ্গতা আছে যে গ্রন্থকারকে নিতান্ত কাছের মানুষ বলিয়া মনে হয়। তিনি নিজেও এই প্রত্যক্ষতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং ইহাই যে লেখকের সম্বন্ধে অদ্ভুত জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছে তিনি তাহাও জানিতেন।

তিনি বলিতেন ইহার জন্যই তিনি জনপ্রিয় লেখক, কিন্তু সমাজে অপাংক্তেয়। আবার ইহা লইয়া তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতেও ছাড়েন নাই। জনৈক তরুণ লেখক মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিতে চাহিয়াছিলেন, সাবিত্রীর মত ঝি যদি মেসে থাকিত, তাহা হইলে আমরা সবাই মেসে থাকিতাম। এই জ্যাঠামোর উত্তরে শরৎচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছিলেন: সতীশের চোখ থাকিলেই সাবিত্রীকে চেনা যায়। প্রশ্ন এই, কোন্ অভিজ্ঞতা হইতে গ্রন্থকার সতীশের চোখ, অর্থাৎ তাঁহার উপলব্ধি-শক্তি আহরণ করিলেন?

পাঠকসম্প্রদায়ের এই উদগ্র কৌতূহল আর একটা বিপদ ডাকিয়া আনিল। যেখানে প্রমাণিত তথ্য খুব সামান্য, সেইখানেই অলীক কাহিনী রচনার অবকাশ প্রচুর। যে সব বাঙ্গালী ব্রহ্মদেশে বসবাস করিতেন তাঁহাদের অনেকের সঙ্গেই শরৎচন্দ্রের হয়ত পরিচয় ছিল না। কিন্তু তাঁহার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িলে, তাঁহারা অনেকেই দেশে ফিরিয়া শরৎচন্দ্র-এক্সপার্ট হইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের দুই চার জনের সঙ্গে অল্পক্ষণ কথা বলিয়াই দেখিয়াছি, ইঁহারা শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কিছুই জানেন না। যাঁহারা শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মপ্রবাস সম্পর্কে বই লিখিয়াছেন, তাঁহারা শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে মুখ খোলেন নাই এবং শরৎচন্দ্রের পত্রাবলীতে তাঁহাদের উল্লেখ প্রায় নাই বলিলেই

চলে ; শরৎচন্দ্র নিজে তাঁহাদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলিয়াছেন বলিয়াও জানি না। তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধুবর্গ যে একেবারেই তাঁহার প্রতিভার আভাস পান নাই তাহা নহে। কিন্তু তাঁহারাও ইহার সম্যক্ মূল্যায়ন করিতে পারেন নাই। পরবর্তী কালে তাঁহারা খানিকটা স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া এবং অনেকটা কল্পনার সাহায্য লইয়া যে চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাও নির্ভরযোগ্য নহে।

শরৎচন্দ্র আত্মীয়বৎসল, বন্ধুবৎসল লোক ছিলেন এবং জীবনের শেষ তৃতীয়াংশ কলিকাতায় বা কলিকাতার সন্নিকটে বসবাসকালে খ্যাতির উচ্চতম শিখরে সমাসীন ছিলেন। বন্ধুবান্ধবদের কাছে তিনি অনেক গল্প করিয়াছেন, অনেকের কাছে অনেক চিঠি লিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রতিভাবান্ কল্পনাপ্রবণ হাস্যরসিক মানুষ আবার তিনি ইহাও মনে করিতেন যে, লেখার চেয়ে না লেখার আর্ট বড়। কাজেই নিজের সম্পর্কে অনেক কথা বলিলেও তথ্যনিষ্ঠ আত্মজীবনী লিখেন নাই, নিজেকে লইয়া কৌতুক করিতেও ছাড়েন নাই। যেমন তাঁহার অসুস্থতা ও জরার কথাই বলা যাইতে পারে। চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করিতেই অথবা তাহার দুই-এক বৎসর পূর্ব হইতে নিজেকে বৃদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিতে ভালবাসিতেন। তিনি সাধারণ মানুষের মত চলাফেরা করিতেন ; বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু বার্ধক্যের ও রোগের ভারে যেন জীবনটাকে আর বহন করতে পারিতেছেন না। এমন ভাব করিতেন।

এই সব কারণে তাঁহার তথ্যনিষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করা কঠিন। তবে অসুবিধা সত্ত্বেও মোটামুটিভাবে তাঁহার জীবনের ঘটনার বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে এবং যে অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার অপরূপ সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে কোথাও কোথাও তাহার উৎসের অস্পষ্ট রেখা দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে।

প্রথম পর্ব

দেবানন্দপুর ও ভাগলপুর

১

শরৎচন্দ্রের জীবনী লিখিতে হইলে প্রথমেই বলিতে হইবে তাঁহার মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা। ইনি ছিলেন চব্বিশ পরগনার হালিসহরের অধিবাসী রামধন গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। কেদারনাথের পিতা ভাগলপুরে সরকারের অধীনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সেইখানেই বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পাঁচ ছেলে ছিল—কেদারনাথ, দীননাথ, মহেন্দ্রনাথ, অমরনাথ ও অঘোরনাথ। এক সময়ে ইঁহারা সম্পন্ন একান্নবর্তী যৌথ পরিবারে বাস করিতেন এবং শিক্ষা ও সচ্ছলতার জন্য ভাগলপুর সমাজের অভিজাত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কেদারনাথের দ্বিতীয়া কন্যা ভুবনমোহিনী শরৎচন্দ্রের জননী। শরৎচন্দ্র পত্রাদিতে তাঁহার নিজের মামা অর্থাৎ কেদারনাথের পুত্র ঠাকুরদাস ও বিপ্রদাসের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার চিঠিপত্রে ও ঘনিষ্ঠ লোকদের রচনায় মাতার খুড়তুত ভাই—লালমোহন, উপেন্দ্রনাথ (উভয়েই মহেন্দ্রনাথের পুত্র), দেবেন্দ্রনাথ (অমরনাথের পুত্র), মনীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ (সবাই অঘোরনাথের পুত্র) প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের বাল্যকাল, কৈশোর ও যৌবনের অনেক দিন ভাগলপুরের এই যৌথ পরিবারে কাটিয়াছিল। প্রথমেই এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করার সার্থকতা এই যে, বাঙালী উচ্চ-মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের যৌথ জীবনযাত্রার সংকীর্ণতা ও মহত্ত্ব, জটিলতা ও সরলতা, নিষ্ঠুরতা ও কোমলতা, ট্র্যাজেডি ও কমেডির এমন সরস, প্রত্যক্ষ ও বর্ণবহুল চিত্র অন্য কোন ঔপন্যাসিক এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথও দিতে পারেন নাই। যৌথ পরিবারের প্রতি শরৎচন্দ্রের বোধ হয় একটা আন্তরিক টান ছিল। পরিণত বয়সে তিনি পাকাপাকি ভাবে বসবাস করিবার জন্য বাড়ি করিয়াছিলেন সামতা গ্রামে যাহা তাঁহার দিদির বাড়ি গোবিন্দপুরের খুব নিকটবর্তী এবং তাঁহার এই পল্লীজীবনের প্রধান আকর্ষণ ছিল দিদির বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। গোবিন্দপুরের পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁহার ভগিনীপতি। দিদির দেবর, জা, তাঁহাদের ছেলেদের

সঙ্গে তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মনে হয় এই যৌথ পরিবারের বৈচিত্র্য ও মাধুর্য তাঁহার অন্যতম আকর্ষণ ছিল।

এখন ভাগলপুরের কাহিনীতে ফিরিয়া আসা যাক। কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হইয়াছিল হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামের মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তখন মতিলাল স্কুলের ছাত্র এবং তিনি শ্বশুরগৃহে আসিয়া ভাগলপুর স্কুলেই পড়িতে আরম্ভ করেন। এখানে কেদারনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘোরনাথ তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। ইঁহারা ভাগলপুর হইতে এণ্ট্রান্স পাস করিয়া পাটনায় এফ্-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। মতিলাল কিন্তু এফ্-এ পাঠ শেষ না করিয়াই চলিয়া আসেন।

যে সময় মতিলাল এণ্ট্রান্স পাস করেন সেই সময় এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন খুবই সীমিত ছিল, মুষ্টিমেয় ছেলে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এণ্ট্রান্স পাস করিত। এমন কি, কেহ পাস করিলে চারদিকের গ্রামের লোক তাহাকে দেখিতে আসিত, একথা আমরাও শুনিয়াছি। সুতরাং মতিলালের পক্ষে কোন চাকুরি গ্রহণ করিয়া স্বীয় পরিবারের ভরণপোষণ করা কিছুমাত্র কঠিন হইত না। ভাগলপুরের বাঙালীটোলার গাঙ্গুলিরা তখন খুব সম্পন্ন, নামজাদা পরিবার। তাঁহারা জামাতার কলেজপাঠ অনায়াসে চালাইয়াও যাইতে পারিতেন। কিন্তু মতিলাল ছিলেন অস্থিরচিত্ত, ভবঘুরে ধরনের মানুষ ; তদুপরি তাঁহার ছিল সাহিত্যরচনার নেশা। এই অস্থিরচিত্ততার জন্য কোন চাকুরিতে টিকিয়া থাকিবার অধ্যবসায় তাঁহার ছিল না এবং অনেক কিছু লিখিলেও কোন কিছুই তিনি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। এই উভয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই তদীয় স্বনামধন্য জ্যেষ্ঠ পুত্রে আংশিক ভাবে সংক্রামিত হইয়াছিল। শরৎচন্দ্র নিজেই এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, তিনি শুধু পিতার অস্থিরচিত্ততা এবং প্রবল সাহিত্যানুরাগ ছাড়া উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছু পান নাই। প্রথমটির প্রেরণায় তিনি অল্পবয়সেই ভবঘুরে হইয়া সমগ্র ভারত ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন আর দ্বিতীয় প্রেরণায় তিনি সমস্ত জীবনই স্বপ্নবিভোর হইয়া কাটাইয়াছেন। পিতৃদেব পড়িয়াছিলেন অনেক এবং তিনি গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, মোটকথা সাহিত্যের সকল বিভাগেই হাত দিয়াছিলেন কিন্তু কিছুই শেষ করিতে পারেন নাই। ('From my father I inherited nothing, except, as I believe, his restless spirit and his keen interest in literature. The first made me a tramp and sent me out tramping the whole of India quite

early, and the second made me a dreamer all my life. Father was a great scholar, and he had tried his hand at stories and novels, dramas and poems, in short, every branch of literature, but never could finish anything.)

শ্বশুরবাড়িতে সপরিবারে বাস করা খুব সম্মানজনক ব্যবস্থা নয় এবং গাঙ্গুলি পরিবারে ইহা লইয়া মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ যতটা থাক্ বা না থাক্, মতিলালের ব্যবহার হইতেই মনোমালিন্য ও পুনর্মিলনের আভাস পাওয়া যায়। তিনি কখনও কখনও ভাগলপুর ছাড়িয়া দেবানন্দপুরে আসিতেন আবার ভাগলপুর যাইতেন এবং পরে দেবানন্দপুরের বাড়ি বিক্রি করিয়া ভাগলপুরেই থাকিয়া গেলেন। সেইখানেও কিন্তু শ্বশুরালয়ে পাকাপাকি ভাবে থাকিতে পারেন নাই। মতিলাল ও ভুবনমোহিনীর সাতটি সন্তান হয়—জ্যেষ্ঠা অনিলা, দ্বিতীয় শরৎচন্দ্র, তারপর দুই পুত্র জন্মিবার পর-পরই মারা যায়, ইহার পর পুত্র প্রভাসচন্দ্র ও প্রকাশচন্দ্র এবং কন্যা মনিয়া বা সুশীলা। শরৎচন্দ্রের জন্ম হয় দেবানন্দপুরে—৩১শে ভাদ্র ১২৮৩ সালে (ইংরেজি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর)। পরবর্তীকালে প্রভাসচন্দ্র রামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করিয়া স্বামী বেদানন্দ নামে পরিচিত হয়েন।

শরৎচন্দ্রের জন্মের পর মতিলাল বেশ কিছুকাল দেবানন্দপুরেই থাকিয়া যান। এইখানেই জ্যেষ্ঠপুত্র শরৎচন্দ্র পাঁচ বৎসর বয়সে প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় পাঠারম্ভ করেন। এই পাঠশালায়ই কি বালক শরৎ কোন বালিকার সঙ্গে পরিচিত হয়, যে পরবর্তীকালে রাজলক্ষ্মীরূপে আত্মপ্রকাশ করে? 'রাজলক্ষ্মী' পদের একাধিক প্রার্থী আছে; কাজেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা না করাই ভাল। এই সময়ে এবং এর পরেও শরৎচন্দ্রের ডাকনাম ছিল 'ন্যাড়া'। পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, 'বিলাসী' গল্পের ডায়েরীর মালিকের নাম 'ন্যাড়া'। শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের গল্পের নায়ক কাশীনাথের নাম গৃহীত হইয়াছে পাঠশালার গুরুমহাশয়ের ছেলের নাম হইতে; এই ছেলেটি ছিল ন্যাড়ার সহপাঠী ও বন্ধু। এইখানে পড়ার সময় ন্যাড়া পণ্ডিত মহাশয়ের উপর দৌরাত্ম্য করিয়া স্কুল হইতে পলায়ন করিয়াছিল এবং সেই কাহিনীও 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী'র প্রথম পর্বে ইন্দ্রনাথের মারফতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই ভাবেই সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

কবি তিল তিল করিয়া নানা অভিজ্ঞতা হইতে মালমশলা গ্রহণ করেন।

ইন্দ্রনাথের মধ্যে অনেক উপাদান বক্তা শ্রীকান্তের অভিজ্ঞতা হইতে আহৃত হইয়াছে। কিন্তু কাহিনীর প্রয়োজনে নায়ক শ্রীকান্তকে অনেকটা শান্ত, নিরীহ করিয়া আঁকা হইয়াছে।

প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় একটু অগ্রসর হইলে শরৎচন্দ্রকে সদ্যস্থাপিত একটি বাংলা স্কুলে ভর্তি করা হয়। সেখানে পুত্রের বছর তিনেক পড়া সমাপ্ত হওয়ার পর মতিলাল ডিহ্‌রীতে একটা চাকুরি পান। তখন শরৎচন্দ্রের বয়স দশ (১৮৮৬ খ্রীঃ)। মতিলাল পরিবারবর্গকে ভাগলপুরে শ্বশুরবাড়িতেই রাখিয়া যান। কিছুদিন পরে স্ত্রী ও অন্যান্য সন্তানদের ডিহ্‌রীতে লইয়া গেলেও পড়াশুনার সুবিধার জন্য শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে মামাদের বাড়িতেই থাকিয়া যান। কিন্তু চাকুরির বন্ধন বেশিদিন মতিলালের সহ্য হইল না। ১৮৮৯ খ্রীঃ তিনি চাকুরি ছাড়িয়া স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের লইয়া দেবানন্দপুরে ফিরিয়া আসিলেন। এই তিন বৎসরে মেধাবী শরৎচন্দ্র ছাত্রবৃত্তি পাস করিয়া, ডবল প্রমোশন পাইয়া ইংরেজি স্কুলের ফোর্থ ক্লাস বা ক্লাস সেভেনে উঠিয়াছেন। দেবানন্দপুরে আসিয়া তিনি হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি হইলেন। 'দত্তা'য় এই ব্রাঞ্চ স্কুলের এবং হুগলীর সংলগ্ন গ্রামের বর্ণনা আছে।

শুধু ডিহ্‌রীতে বছর তিনেক চাকুরি করা ছাড়া স্বাধীনচেতা, অস্থিরগতি, কল্পনাপ্রবণ মতিলাল কোথাও কিছু উপার্জন করেন নাই। এমন কি তিনি ব্রাঞ্চ স্কুলে শরৎচন্দ্রের মাহিনাও দিতে পারিতেন না। তাই শরৎচন্দ্রের জীবনের প্রথমাংশ কঠোর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া কাটিয়াছে। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 'My childhood and youth were passed in great poverty. I received almost no education for want of means.' বার্নার্ড শ'য়ের ভাষা গ্রহণ করিয়া বলিতে পারি যে, ইহা সেই দারিদ্র্য নহে যাহার উপর যিশুখ্রীষ্ট স্বর্গীয় মহিমা আরোপ করিয়াছেন। ইহা সেই দারিদ্র্যও নয় যাহার বৈরাগ্য-কঠিন গৌরব, দুর্গম নির্মল মাহাত্ম্যকে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান লক্ষণ বলিয়া শিরোধার্য করিয়াছেন। এই দারিদ্র্য কঠোর, বীভৎস, ভয়ঙ্কর; ইহা মানুষের দেহকে জীর্ণ করে, মনকে শত অপমানে ও গ্লানিতে জর্জরিত করে। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের রচনায় এই দারিদ্র্যের ভয়াবহ করাল মূর্তি জীবন্ত হইয়াছে। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের পটভূমিতে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বিভীষিকা দেখিতে পাই এবং প্রফুল্লর মাতার দারিদ্র্যের চিত্র দিয়াই 'দেবী চৌধুরাণী'র কাহিনী শুরু হইয়াছে, কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে

দারিদ্র্যের পশ্চাৎপট শুধু মূল কাহিনীকে উজ্জলতা দান করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গল্প প্রভৃতিতে দারিদ্র্যের যে চিত্র পাই তাহার সম্পর্কেও অন্যভাবে এই কথাই খাটে। বালিকা রতনের নিঃস্ব অসহায়তা এবং রহমৎ কাবুলিওয়ালার অর্থাভাব কল্পনায় 'কুহেলি-বিলীন' হইয়া গিয়াছে। কিন্তু 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ' 'হরি-লক্ষ্মী' প্রভৃতিতে, 'শ্রীকান্ত'র উপাখ্যান বিশেষে এবং অন্যত্র দারিদ্র্যের যে চিত্র পাই তাহা অবিমিশ্র, প্রত্যক্ষ, ভয়াবহ ; কখনও কখনও ইহা হাস্যরসে কষায়িত হইয়া বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহার বিকটতা ঢাকা পড়ে নাই। শরৎচন্দ্রের জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে তাঁহার সাহিত্যের যে সূত্র পাই তাহার একটির—বাঙালী যৌথ পরিবারের জটিলতার—কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় সূত্র নিদারুণ একটানা দারিদ্র্য যাহা পরবর্তীকালে সাহিত্যিক সফলতার দ্বারাই বিদূরিত হইয়াছিল।

শরৎচন্দ্র যখন হুগলী স্কুলে ফার্স্ট ক্লাসে পড়েন তখন মতিলালের আর্থিক দুরবস্থা এতই গুরুতর হইল যে তাঁহার পক্ষে দেবানন্দপুরে বাস করা আর সম্ভব হইল না। এমন কি স্কুলের বেতন না দিতে পারায় শরৎচন্দ্র স্কুল ছাড়িয়া কিছুদিন বাড়িতেই বসিয়া ছিলেন। এই আর্থিক দুর্গতির ফলে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মতিলাল সপরিবারে ভাগলপুরে শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কোনক্রমে অপরের সাহায্যে শরৎচন্দ্র তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হইলেন। একবৎসর পর ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এণ্ট্রান্স পাস করিয়া তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে এফ্-এ ক্লাসে ভর্তি হয়েন। কলেজে পড়িবার সময় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইহার কিছুদিন পূর্বে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছিল। অল্পদিনের মধ্যেই ভাগলপুরের এই নামজাদা একান্নবর্তী সংসার বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয় এবং সপরিবারে মতিলাল তাঁহার স্ত্রীর সহোদর ভাই ঠাকুরদাস ও বিপ্রদাসের গলগ্রহ হয়েন। অবশ্য তাঁহার পরিবার বলিতে এখন তিন ছেলে ও এক মেয়ে কারণ মাতার মৃত্যুর পূর্বেই জ্যেষ্ঠা কন্যা অনিলার সঙ্গে হুগলীর গোবিন্দপুর নিবাসী পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয় এবং সম্পন্ন গৃহস্থঘরের বধূ অনিলা শ্বশুরবাড়িতেই বসবাস করিতে থাকেন। গাঙ্গুলি বাড়ির যৌথ পরিবার ভাঙিয়া গেলেও পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও মমত্ববোধ নষ্ট হয় নাই। কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘোরনাথের স্ত্রী শরৎচন্দ্রকে তাঁহার ছোট ছেলেদিগকে পড়াইবার ভার দিয়া বিনিময়ে শরৎচন্দ্রের কলেজের বেতন

দিতে লাগিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে শরৎচন্দ্র বই কিনিতে পারেন নাই এবং এফ্-এ পরীক্ষার কুড়ি টাকা ফি' যোগাড় করিতে না পারায় পরীক্ষাও দিতে পারেন নাই। এই অক্ষমতার একটি বড় কারণ প্রতিপালক মাতুলদের আর্থিক অসচ্ছলতা। জ্যেষ্ঠ মাতুল ঠাকুরদাস অল্প কিছু টাকার দায়ে কর্মচ্যুত হয়েন এবং এই আদেশের বিরুদ্ধে মামলা করিয়া সর্বস্বান্ত হইলেও চাকুরি ফিরিয়া পান নাই। কনিষ্ঠ বিপ্রদাস সামান্য চাকরি করিতেন এবং সেই সীমিত আয়ের দ্বারাই জ্যেষ্ঠভ্রাতার, নিজের এবং ভগিনীর পরিবারের ভরণপোষণ করিতেন। এই বোঝা যে কত গুরুভার তাহার পক্ষে একটি নিদর্শনই যথেষ্ট। শরৎচন্দ্র যখন এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেন তখন দেয় কয়েক মাসের বেতন এবং পরীক্ষার ফি'র জন্য বিপ্রদাসকে এক মহাজনের নিকট হইতে হাণ্ডনোট দিয়া টাকা ধার করিতে হইয়াছিল।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর সন্তানবর্গসহ স্বল্পবিত্ত শ্যালকের উপর নির্ভর করা সমীচীন হইবে না বলিয়া মতিলাল স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু যাইবেন কোথায়? দেবানন্দপুরে থাকাকালীন কোন এক সময় মতিলাল কিছু টাকা কর্জ করিয়াছিলেন এবং ঐ টাকা শোধ দিতে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে দেবানন্দপুরের বাড়ি বিক্রি করিতে হয়। তাই তিনি ভাগলপুরেই খঞ্জরপুর পল্লীতে পৃথক্ একটি বাড়ি ভাড়া করিলেন।

আর্থিক দিক দিয়া শরৎচন্দ্র এই সময়ে চরম দুর্গতিতে পতিত হইয়াছিলেন। পিতার চাকুরি নাই, নিজে অর্থভাবে এফ্-এ পরীক্ষা দিতে পারেন নাই এবং তাই তিনি বেকার এবং ভবঘুরে। দুটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ছোট বোন ঘাড়ের উপরে। শরৎচন্দ্র এ সময় এত কষ্টে কালাতিপাত করিয়াছেন যে, তিনি অনেক দিন প্রার্থনা করিতেন যে, তাঁহার যেন জ্বর হয়; তাহা হইলে আহারের ভাবনা থাকিবে না। খঞ্জরপুরে থাকাকালেই শরৎচন্দ্র অল্প কিছু দিনের জন্য বনেলী এস্টেটে ছোট একটি কাজ পাইয়াছিলেন এবং কিছু দিন কাজ করিয়া আবার ভাগলপুরে ফিরিয়া আসেন। হয়ত তাঁহার ইচ্ছা ছিল আবার কলেজে ভর্তি হইয়া পড়াশোনা করিবেন। কিন্তু যিনি অর্থাভাবে পরীক্ষা দিতে পারেন নাই তিনি কলেজে পড়িবেন কি করিয়া? পরে এক সময়ে তিনি সন্ন্যাসীর বেশে গৃহত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হয়েন। এই নিরুদ্দিষ্ট অবস্থায় তিনি মজঃফরপুরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। সেইখানে কিছু দিন তিনি লেখিকা অনুরূপা দেবীদের বাড়িতে ছিলেন। অনুরূপা দেবীর স্বামী শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে

উকিল ছিলেন। সন্ন্যাসীর বেশে—অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া—তিনি কতদিন কোথায় ঘুরিয়াছিলেন তাহার সঠিক বিবরণ জানা যায় নাই। মজঃফরপুরে তিনি মহাদেব সাহু নামে এক জমিদার-পুত্রের সুনজরে পড়েন এবং তাঁহার আশ্রয়ে কিছু দিন ছিলেন। তদপেক্ষাও উল্লেখযোগ্য এইখানে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। প্রমথনাথের কথা পরে উল্লিখিত হইবে।

শরৎচন্দ্রের ভবঘুরে জীবনবৃত্তি আরও কত কাল চলিত তাহা বলা যায় না; তিনি হয়ত মজঃফরপুরেই থাকিয়া যাইতেন। এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে পিতার সঙ্গে কলহ করিয়া তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, কাজেই সেই গৃহে অনাহারের মধ্যে তাঁহার ফিরিবার ইচ্ছা হয়ত হইত না। আবার ইহাও দেখা যায় যে এই নিরুদ্দিষ্ট সন্ন্যাসী ভাগলপুরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন নাই। মহাদেব সাহুর বাড়িতে থাকা কালেই তিনি পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ভাগলপুর আসেন। ভবঘুরে খেয়ালী লোক হইলেও তাঁহার মধ্যে স্নেহপ্রবণতা ও কর্তব্য-বোধও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তাই নিজের জন্য এবং বোন ও ভাইদের জন্য তিনি ভাগ্যান্বেষণে ভাগলপুর ত্যাগ করিয়া একাকী কলিকাতায় মাতুল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লালমোহন বাবু তখন হাইকোর্টের উকিল। সেটা ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ। শরৎচন্দ্রের বয়স তখন ছাব্বিশ এবং এইখানে তাঁহার জীবনের প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি।

বাহিরের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা একটি সাধারণ দরিদ্র বাঙালীর পরাজিত জীবনের কাহিনী। কিন্তু আর এক দিক দিয়া বিচার করিলে এই ভাগলপুর অধ্যায়—বিশেষ করিয়া খঞ্জরপুরে বাস—অপরাজেয় কথাশিল্পীর অভ্যুদয়ের সাক্ষ্য দেয় এবং শুধু অভ্যুদয় নয় সেই অনন্যসাধারণ প্রতিভার বিকাশ ও পরিণতির সাক্ষ্যও এইখানেই পাওয়া যায়।

ছেলেবেলায় শরৎচন্দ্র দুরন্ত ছিলেন। এই দুরন্ত বালক দুঃসাহসী, নির্ভীক, আত্মভোলা, পরোপচিকীর্ষু যুবকে পরিণত হয়েন আর তাঁহার দুঃসাহস শুধু দৈহিক সাহস নয়, অনমনীয় নৈতিক বলও। গ্রামে তিনি নৌকা চালাইয়া মাছ ধরিয়া সময় কাটাইতেন। ভাগলপুরে আসিয়া তিনি নানা খেলাধূলায় অংশ গ্রহণ করিতেন, নদীতে সাঁতার কাটিতেন, সাপ ধরিতে চেষ্টা করিতেন এবং গভীর রাত্রিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার না ছিল সাপের ভয়, না ছিল ভূতের ভয়। এক পোড়ো বাড়িতে আস্তানা স্থাপন করিয়া তিনি অধিকাংশ সময় সেখানে কাটাইতেন। খেলাধূলা, দৈহিক পরিশ্রম ও সাহসিকতার

সঙ্গে তিনি নৈতিক বলেরও পরিচয় দিয়াছিলেন। শুধু একটা বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই বিষয়ের পরিসমাপ্তি করিব। ভাগলপুরের অন্যতম প্রধান বাসিন্দা ছিলেন শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; ভূস্বামী না হইলেও নিজ ক্ষমতায় বহু অর্থ উপার্জন করিয়া তিনি 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। তিনি একবার বিলাত গিয়াছিলেন বলিয়া ভাগলপুরের বাঙালী সমাজে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া খুব তীব্র দলাদলি হয়। যে রক্ষণশীল অংশ তাঁহাকে একঘরে করিতে চাহেন তাহার পুরোভাগে ছিলেন বাঙালীটোলার গাঙ্গুলিরা অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের মাতুলরা। কিন্তু শরৎচন্দ্র নিজে ছিলেন শিবচন্দ্রের দলে এবং শিবচন্দ্রের পুত্র কুমার সতীশচন্দ্র কর্তৃক স্থাপিত আদমপুর ক্লাবের তিনিই ছিলেন প্রাণস্বরূপ। শরৎচন্দ্র অবহেলিত, লাঞ্ছিত নরনারীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং অধিকাংশ পাঠকবর্গের কাছে তিনি 'দরদী' শরৎচন্দ্র বলিয়া পরিচিত। তাহা ছাড়া নানা উপন্যাসে তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক বিদ্রোহের সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার মধ্যে আভিজাত্যের প্রতিও একটা সম্ভ্রমবোধ ছিল। এই সম্ভ্রমবোধ সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পাইয়াছে বিপ্রদাসের চরিত্রে। ভাগলপুরে গাঙ্গুলিরা ছিলেন রক্ষণশীল আর রাজা শিবচন্দ্র ছিলেন বিলাতফেরত অ্যারিস্টক্র্যাট। কে বলিবে বিপ্রদাস ও 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসের আশুবাবুর চরিত্রের অন্তরালে ভাগলপুরে এই দ্বিবিধ সমাজের অভিজ্ঞতা নিহিত ছিল কিনা?

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই সময়েই অর্থাৎ ভাগলপুরেই শরৎচন্দ্রের সৃজনী প্রতিভা বিকশিত হয়। তিনি গানবাজনায় খুব পারদর্শিতা লাভ করেন এবং অভিনয়ে অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। আদমপুর ক্লাব যে সকল নাটক মঞ্চস্থ করিত তাহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শরৎচন্দ্র এবং নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া তিনি যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা নাম করা পেশাদার অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের পক্ষেও লোভনীয়। তাহার বাঁশি ও গান অনেকের মনেই রেখাপাত করিয়াছিল। অবশ্য বাহিরের দিক হইতে বিচার করিলে এই সকল বিদ্যা দোষেরই সামিল। যাহার পিতার কোন নির্দিষ্ট আয় নাই, মাতৃহীন ভাইবোনদের আহারের ব্যবস্থা নাই, সেইরূপ সুস্থ সবল মোটামুটি শিক্ষিত যুবক যদি পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থায় ব্রতী না হইয়া বাঁশি বাজাইয়া, অভিনয় করিয়া, বড়লোকের বাড়ি দাবা খেলিয়া, ধূম পান ও চা পান করিয়া বেপরোয়া জীবন যাপন করে এবং পরে পিতার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া

গৃহত্যাগ করে তবে তাহাকে যে সমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। শরৎচন্দ্র ইহারও এক ধাপ নীচে নামিয়াছিলেন কারণ, তাঁহার নিরুদ্দেশ যাত্রার পরিসমাপ্তি এক জমিদারপুত্রের গানবাজনার আসরে। মনে হয়, এই সময়ে তিনি মদ্যপানও অভ্যাস করিয়াছিলেন। শ্রীকান্ত আর শরৎচন্দ্র এক ব্যক্তি এমন কথা বলিতেছি না; কিন্তু শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনীতে যে শরৎচন্দ্রের জীবনের ছাপ আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সেই শ্রীকান্ত যখন জনৈক সহপাঠী রাজকুমার সম্পর্কে বলিতেছে, 'তখন সবে সাবালক হইয়াছেন। অনেক জমানো টাকা হাতে পড়িয়াছে এবং তারপরে ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজার ছেলের কানে গিয়াছে—অতিরঞ্জিত হইয়াই গিয়াছে—রাইফেল চালাইতে আমার জুড়ি নাই, এবং আরও এত প্রকারের গুণগ্রামে ইতিমধ্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছি যে, একমাত্র সাবালক রাজপুত্রেরই অন্তরঙ্গ বন্ধু হইবার আমি উপযুক্ত। তবে কিনা, আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবেরা আপনার লোকের সুখ্যাতি একটু বাড়াইয়া করে,·······' তখন মনে হয় ইহার মধ্যে শরৎচন্দ্রের নিজের ছন্নছাড়া জীবন ও অতিরঞ্জিত অপযশের আভাস পাই।

এই শ্রীকান্তই অন্যত্র বলিয়াছে 'পৃথিবীতে কেবল মাত্র বাহিরের ঘটনা পাশাপাশি লম্বা করিয়া সাজাইলে হৃদয়ের জল মাপা যায় না।' এই উক্তিকেই একটু ঘুরাইয়া বলা যাইতে পারে যে, বাহিরের সাফল্য ও অসাফল্য, যশ ও নিন্দার মধ্য দিয়া প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। এক দিক্ দিয়া বিচার করিলে এই ভাগলপুর অধ্যায় অর্থাৎ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তেজনারায়ণ জুবিলি স্কুলে ভর্তি হইতে শুরু করিয়া ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুর পরিত্যাগ,—এই নয়-দশ বৎসর তাঁহার জীবনে একটা স্বর্ণপ্রসূ যুগ। শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুরে অল্পস্বল্প সাহিত্যচর্চা শুরু করিয়াছিলেন। ভাগলপুরে মাতুল উপেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথের একটু লেখার ঝোঁক ছিল। তবে বলা বাহুল্য সেকালে—এবং অনেকটা একালেও—স্কুল কলেজের ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত সাহিত্যচর্চা খুব প্রশংসার বস্তু বলিয়া স্বীকৃত হইত না। কাজেই মাতুলরা একটু গোপনেই এই কাজ করিতেন। ইহাও বলা নিষ্প্রয়োজন যে, শরৎচন্দ্রের মত প্রতিভাশালী লোকের সাহচর্যে এই ক্ষুদে লেখকরা একটা সাহিত্যিক-গোষ্ঠীতে পরিণত হইলেন। ইহার পর আর একটি আপাত ছোট্ট ঘটনা ঘটিল যাহা আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

এই সময়ে নফরচন্দ্র ভট্ট নামে জনৈক বৈদিক ব্রাহ্মণ ভাগলপুরে প্রথম

সাবজজরূপে বদলি হইয়া খঞ্জরপুর পল্লীতে বসবাস করেন। শরৎচন্দ্রের পিতাও স্ত্রীর মৃত্যুর পর এই পল্লীতেই উঠিয়া আসিয়াছিলেন। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নফর ভট্ট ও নিঃসম্বল মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান প্রায় অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সাবজজের দ্বিতীয় পুত্র ইন্দুভূষণের সঙ্গে বেকার ডাংপিটে শরৎচন্দ্রের বন্ধুত্ব হয় এবং শরৎচন্দ্র দিনের অধিকাংশ সময় ভট্টদের বাহিরের ঘরে কাটাইতেন। কিন্তু যাঁহারা ঐ বাড়িতে যাইতেন তাঁহারা দেখিতেন অনেক সময়ই তিনি (প্রায় তাঁহার জন্যই নির্দিষ্ট) একখানি চেয়ারে বসিয়া অনর্গল গল্প লিখিতেছেন। তিনি কখনও কখনও গানবাজনাও করিতেন এবং তাঁহার গান অন্তঃপুর হইতেও শোনা যাইত; কোন দিন গভীর রাত্রে ভট্টবাড়ির অনতিদূরস্থ একটা মসজিদের প্রাঙ্গণ-চত্বর হইতে গানের শব্দ, কখনও গঙ্গার তীর হইতে বাঁশির শব্দ ভাসিয়া আসিত। তখন ইন্দুভূষণ তাঁহার স্ত্রীকে বলিতেন, ইহা ন্যাড়াচন্দ্রের কাণ্ড। শরৎচন্দ্রের ডাকনাম ছিল ন্যাড়া। এই সকল তুচ্ছ ঘটনা হইতে বোঝা যায় যে সেই অবরোধপ্রথার দিনে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পূর্বেই, অথবা আলাপ হউক বা না হউক, শরৎচন্দ্র ঐ বাড়ির অন্তঃপুরিকাদের মনে রেখাপাত করিয়াছিলেন।

এই ভট্টবাড়ির লোকেরা শুধু যে নিরভিমান সজ্জন ছিলেন তাহাই নহে, ইঁহাদের সাহিত্যানুরাগেরও পরিচয় পাওয়া যায়;—তাঁহাদের সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র ছিল অন্তঃপুর। নফরচন্দ্রের কন্যা নিরুপমা (বুড়ি) ষোল বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে আসিয়া ভাগলপুরে ছিলেন এবং তিনি প্রচুর কবিতা লিখিতেন। তাঁহার কবিতার প্রধান সমজদার ছিলেন তাঁহার দুই ভাজ, ক্রমে দাদারাও পাঠকসম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন। অনতিকালের মধ্যেই দাদাদের বন্ধুরাও কেমন করিয়া এই দলের সঙ্গে যুক্ত হইলেন। মনে হয় যোগসূত্র ছিলেন নিরুপমার ছোট্দা বিভূতিভূষণ ভট্ট যিনি নিজেও সাহিত্যচর্চা করিতেন। যাঁহারা এই সাহিত্যগোষ্ঠীতে যোগ দিলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন বিভূতিভূষণের সহপাঠী সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় যিনি পরে সাহিত্যিক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন এবং তাঁহার বন্ধু গাঙ্গুলিবাড়ির সুরেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের মাতুলরা, আর 'কুঁড়ি' সাহিত্যিকদের মধ্যমণি হইলেন শরৎচন্দ্র নিজে। এই সাহিত্য-সভার সাপ্তাহিক বৈঠক বসিত। বৈঠকের কোন নিয়মিত স্থান ছিল না—এখানে ওখানে যেখানে জায়গা পাইতেন একত্র হইয়া নিজেদের লেখা পড়িতেন, একে অপরের রচনার সমালোচনা করিতেন এবং শরৎচন্দ্রকে

সবাই গুরু বলিয়া মানিতেন। একমাত্র সদস্যা নিরুপমা দেবী অবশ্য এই পুরুষদের সভায় উপস্থিত হইতে পারিতেন না। বিভূতিভূষণ কনিষ্ঠা ভগিনীর রচনা পড়িতেন এবং শরৎচন্দ্রের অভিমত লেখিকার রচনার উপর লিখিয়া লইতেন অথবা বাড়ি আসিয়া মুখে বলিতেন। শরৎচন্দ্রের অভিমত পাইয়া নবীনা লেখিকা নিরুপমা (বুড়ি) খুব উৎসাহিত ও 'উৎফুল্ল' হইতেন। একে তো শরৎচন্দ্র তাঁহার দাদাদের 'সম্মানিত' বন্ধু; তদুপরি যে সকল গল্প ও উপন্যাস শরৎচন্দ্র তাঁহাদের বাড়িতে বসিয়া লিখিয়াছিলেন তাহা পড়িবার সুযোগও তাঁহার হইয়াছিল এবং তিনিও এই সময় অন্ততঃ একখানা উপন্যাস ('উচ্ছৃঙ্খল') রচনা করেন। এই 'কুঁড়ি' সাহিত্যিকরা তাঁহাদের সাহিত্যসভার প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া 'ছায়া' নামে একটি হস্তলিখিত পত্রিকাও প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সম্পাদক হয়েন যোগেশচন্দ্র মজুমদার এবং ইহার মধ্যে নিরুপমা দেবীর রচনায় লেখিকার নাম দেওয়া হয়—'শ্রীমতী দেবী'। কিছু দিন পর এই সভার অন্যতম সভ্য সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় পড়িতে আসেন এবং কলিকাতার বন্ধুদের সঙ্গে 'তরণী' নামে একটি হস্তলিখিত পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা দুইটি কলিকাতা ও ভাগলপুরের মধ্যে যাতায়াত করিত এবং এক পত্রিকার লেখকরা অপর পত্রিকার লেখকদের রচনার তীব্র সমালোচনা করিতেন।

১৯০২ সালে শরৎচন্দ্রের পিতৃবিয়োগের পর তাঁহাকে ভাগলপুরের আস্তানা গুটাইতে হয় এবং মনে হয় 'ছায়া'ও শূন্যে বিলীন হইয়া যায়। শরৎচন্দ্র ছোট বোন ও দুই ভাইয়ের একটা ব্যবস্থা করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল মাতুল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হয়েন এবং ত্রিশ টাকা বেতনের বিনিময়ে তাঁহার হিন্দী পেপার বুকের ইংরেজি অনুবাদ করার কাজ গ্রহণ করেন। শরৎচন্দ্র এ কাজে খুশি ছিলেন না। একে তো বেতন সামান্য; তাহার দ্বারা নিজের ও তিন ভাইবোনের খরচ কুলাইবার সম্ভাবনা নাই। তারপর, যে সব টুকরা তথ্য পাওয়া যায় তাহা হইতে মনে হয় তিনি লালমোহন বাবুর পরিবারে সুখী বোধ করেন নাই। সুখে দুঃখে সকল অবস্থায়ই শরৎচন্দ্রের আত্মসম্মানবোধ খুব তীক্ষ্ণ ছিল এবং তিনি কাহারও কাছে নতিস্বীকার করিতে চাহিতেন না। মনে রাখিতে হইবে তিনি পিতার সঙ্গে তর্কাতর্কির ফলে ভাগলপুর হইতে নিঃস্ব অবস্থায় নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন, পরে রেঙ্গুনে অফিসের কর্তার জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন চাকুরিতে

ইস্তফা দিয়া এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণ করিলেও একাধিকবার কবির বিরুদ্ধে লেখনী ধরিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

আজকালকার দিনে কলিকাতা হইতে জীবিকাসংস্থানের উদ্দেশ্যে বর্মা যাত্রা খুব দুঃসাহসিক, রোমাণ্টিক অভিযান বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু তখন —এমন কি, সেই সময়কার পঁচিশ-তিরিশ বৎসর পরেও—চাকুরি বা ব্যবসায়ের অন্বেষণে কলকাতা বা চট্টগ্রাম হইতে ব্রহ্মদেশে যাওয়ার খুব প্রচলন ছিল, কারণ ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষেরই অঙ্গ ছিল এবং লোকমুখে শুনিয়াছি যে, রেঙ্গুন তো বাঙালী বা ভারতবাসীদের শহর বলিয়াই মনে হইত। যাহা হউক, ১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন চলিয়া গেলেন। উদ্দেশ্য (লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের ভগিনীপতি) মেসোমহাশয় অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া ওকালতি পরীক্ষায় পাস করিয়া ওখানে ব্যবহারজীব হওয়া।

ইহার পূর্ব্বে তিনি অনেকগুলি গল্প, উপন্যাস এবং কিছু কিছু কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সকল লেখা-সমন্বিত খাতা ভট্টবাড়িতে ছিল এবং পরে মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে আসে। এই লেখাগুলির মধ্যে গল্প ও উপন্যাস হইল—অভিমান, কাকবাসা, ব্রহ্মদৈত্য, কোয়েল, বোঝা, অনুপমার প্রেম, হরিচরণ, সুকুমারের বাল্যকথা, বিচার, আলো ও ছায়া, পাষাণ, বড়দিদি, চন্দ্রনাথ, শুভদা, দেবদাস ও চরিত্রহীনের প্রথমাংশ। ইহাদের মধ্যে 'অভিমান' ও 'পাষাণ' এবং 'কাকবাসা' ও 'ব্রহ্মদৈত্য' পাওয়া যায় নাই। 'অভিমান' উপন্যাসটির অন্তর্ধান খুব দুর্ভাগ্যের কথা, কারণ নিরুপমা দেবীর মত প্রতিভাসম্পন্না পাঠিকার মনে তাহা রেখাপাত করিয়াছিল। রেঙ্গুন রওনা হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি 'মন্দির' নামে একটি গল্প লিখিয়া 'কুন্তলীন' পুরস্কার-প্রতিযোগিতার জন্য উপস্থাপিত করেন, কিন্তু লেখকের নাম দেন মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের। সাহিত্যিক জলধর সেন ছিলেন বিচারক। তিনি ইহাকেই শ্রেষ্ঠ গল্প বলিয়া নির্ব্বাচন করেন। পুরস্কারের টাকা পাইয়া শরৎচন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে সুরেন্দ্রনাথ মোহিত চন্দ্র সেন সম্পাদিত রবীন্দ্র কাব্যগ্রন্থ তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন।

২

শরৎচন্দ্র ও নিরুপমা দেবী

শরৎচন্দ্রের নেতৃত্বে ভাগলপুরে যে সাহিত্য-সভা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার মধ্যে শরৎচন্দ্র ছাড়াও আরও দুই-চারজন সাহিত্যিক উত্তরকালে অল্পবিস্তর পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মাসিক পত্রের সম্পাদক ও ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং বিভূতিভূষণ ভট্টও গল্প উপন্যাসাদি রচনা করেন। তবে ইঁহাদের কাহারও কোন রচনা প্রধান শ্রেণীতে পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু বিভূতিভূষণের কনিষ্ঠা ভগিনী, যৌবনের প্রারম্ভে যিনি স্বামী-হারা হয়েন এবং অন্তঃপুর হইতে যিনি সাহিত্য-সভায় তাঁহার রচনা পাঠাইতেন ও শরৎচন্দ্রের মন্তব্যে উৎসাহিত হইতেন, তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাঁহার 'দিদি' উপন্যাসে। এই উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রচনার সঙ্গে তুলনীয়।

নিরুপমা দেবীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন এই সদ্য-বিধবার বয়স সতের বছর; শরৎচন্দ্র তাঁহার অপেক্ষা বছর সাতেকের বড়। শরৎচন্দ্র আপন জনের মত ডাকনাম 'বুড়ি' বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসে বিধবার ব্যর্থ প্রেমের উল্লেখ আছে। 'পণ্ডিত মশাই', 'দেনা-পাওনা' প্রভৃতি উপন্যাসে নায়িকা বিধবা নহে, কিন্তু তাহারাও স্বামিসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। এই একই রকমের বিষয়ের পুনরুক্তি দেখিয়া অনেকের মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে, শরৎচন্দ্র ও নিরুপমার সঙ্গে হৃদয়ের কোন সম্পর্ক ছিল কি? এই প্রশ্নটা সাহিত্যের সঙ্গে জড়িত বলিয়াই ইহার একটু বিস্তারিত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

দেহ ও মনের সম্মিলনে মানুষের যে সত্তা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার অনন্ত বৈচিত্র্য, প্রতি মুহূর্তে তাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তন। ইহার খুব ছোট অংশই ব্যবহারিক জীবনে দেখা দেয় বা বুদ্ধির বিচার-বিশ্লেষণের অঙ্গীভূত হইতে পারে। সাগরে যেমন সুবিশাল তুষারপর্বত ক্ষিপ্রবেগে প্রধাবিত হয় এবং শুধু তাহার স্বল্পায়তন শীর্ষ বাহিরে দৃষ্টিগোচর হয়, মনের গতিও অনেকটা সেই রকমের। কবি ইহার নিহিত অংশ দেখিতে পান বলিয়াই তিনি প্রত্যক্ষদ্রষ্টা

যোগীর সঙ্গে তুলিত হইয়াছেন। আমাদের মুনি-কথিত রসশাস্ত্রের দৃষ্টান্তের সাহায্যেই বুদ্ধির বিচারের সংকীর্ণতা প্রমাণ করা যাইতে পারে। ভরত মুনির মতে, মানুষের মনের প্রধান ভাব আটটি কি নয়টি, এবং তন্মধ্যে নরনারীর সম্বন্ধই আদি ভাব। তাহার নাম দিয়াছেন তিনি রতি যাহা কাব্যে শৃঙ্গাররসরূপত্বলাভ করে। কিন্তু জননীর স্নেহ, রমণীর প্রেম, কুমারীর (বা বিধবার) নীরব প্রীতি, শিষ্যার গুরুভক্তি—ইহারা সবাই কি রতির অঙ্গ এবং ইহাদের প্রত্যেকটির প্রকাশই কি শৃঙ্গাররসের সঞ্চার করিবে? দুঃখের বিষয় নিঃসম্পর্কিত নরনারীর যে কোন দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় ও ভাববিনিময়কেই আমরা এই একই পর্যায়ে ফেলিতে চেষ্টা করি এবং ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই অর্বাচীন বিচারপ্রবণতা স্ত্রীলোকদের মধ্যে সমধিক পরিলক্ষিত হয়। ইহা লইয়া ডিকেন্স পিকউইক পেপার্স গ্রন্থে যে অতি মুখরোচক ব্যঙ্গচিত্র আঁকিয়াছেন তাহা অতুলনীয় এবং তাহার সারাংশ এখানে তুলিয়া ধরিতে পারি। লণ্ডনে গস্ওয়েল স্ট্রীটে একটি বাড়িতে একজন ভাড়াটে ছিলেন—প্রবীণ এবং সদাশয় মিস্টার পিকউইক। ল্যাণ্ডলেডি—বাড়িওয়ালী শব্দটা ইহার উপযুক্ত প্রতিশব্দ হইবে না—মার্থা বার্ডেল তাঁহার খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতেন। ইংলণ্ডে এই জাতীয় ব্যবস্থা সুপ্রচলিত ও সুবিদিত। মিঃ পিকউইকের মনে হইল যে, তাঁহার একটি পরিচারক থাকিলে সুবিধা হয় এবং তিনি শ্যাম ওয়েলার নামে একটি যুবককে নিযুক্ত করিবেন বলিয়া ঠিক করিলেন। কিন্তু একসঙ্গে দুইজনের দেখাশোনা করিতে ল্যাণ্ডলেডির কোন অসুবিধা হইবে কিনা তাহা জানিবার জন্য তিনি খুব সৌজন্যের সহিত মুখবন্ধ করিলেন। আর দুই একটা কথার পর ইহাকে বিবাহের প্রস্তাব মনে করিয়া ভাবাবেগে বিগলিত হইয়া প্রবীণা মিসেস্ বার্ডেল প্রবীণতর পিকউইককে জড়াইয়া ধরিয়া ফিট্ হইয়া পড়িলেন। ইহার পরের অংশও কম মুখরোচক নয়। মিঃ পিকউইকের বিরুদ্ধে বিবাহের প্রতি-শ্রুতিভঙ্গের মামলা রুজু হইল এবং তাঁহাকে আইনের সুবিচারে দণ্ডনীয় হইতে হইল!

শরৎচন্দ্র ও নিরুপমার সংবন্ধেও এই জাতীয় জল্পনা-কল্পনা হইয়াছে এবং দুইজন লেখিকা বিচারকের আসনে বসিয়া রায়ও দিয়াছেন। প্রথমা হইলেন মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী অনুরূপা দেবী, যিনি তাঁহার উপন্যাসের মধ্য দিয়া প্রধানতঃ হিন্দুসমাজের 'সনাতন বিধিনিষেধ ও মূলীভূত আদর্শের পক্ষ সমর্থনের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।' শরৎচন্দ্র যখন সন্ন্যাসীর বেশে

ইঁহাদের মজঃফরপুরের বাড়িতে উপস্থিত হয়েন, তখন তিনি ভবঘুরে সন্ন্যাসী ভিক্ষুক এবং পরে তিনি উপন্যাস ও গল্প লিখিয়াছেন, প্রীতিহীন হিন্দুধর্ম ও ক্ষমাহীন হিন্দু সমাজ সম্পর্কে। শুধু তাই নয়, একাধিক প্রসঙ্গে তিনি অনুরূপা দেবীর উপন্যাস সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্যও করিয়াছেন।

অনুরূপা ও নিরুপমা সমবয়সী ছিলেন। কথিত আছে ইঁহারা প্রথম বয়সে এক সঙ্গে চুঁচুড়ায় গঙ্গায় স্নান করিয়া 'গঙ্গাজল' পাতাইয়া সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েন। প্রকৃতপক্ষে এই সখ্য হইল দুই অ-সম প্রকৃতির মহিলার মধ্যে এবং ইহার মন্থনে কিঞ্চিৎ বিষ উদ্গীর্ণ হইয়াছে। অনুরূপার সাহিত্যিক দম্ভ ছিল প্রচুর, সৃজনী প্রতিভা ছিল অতি সীমিত। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী, তিনি নিজেকে হিন্দুধর্মের আদর্শের প্রবক্ত্রী বলিয়া মনে করিতেন এবং স্বামিপুত্র-সৌভাগ্যবতী এই মহীয়সী মহিলা বান্ধবী নিরুপমাকে হিন্দুবিধবার কঠোর ব্রহ্মচর্যের ও জপতপাদির প্রতিমূর্তিরূপে দেখিতে চাহিতেন। তিনি শরৎচন্দ্রের মত বাউণ্ডুলে, ভবঘুরে পরপুরুষের সঙ্গে নিরুপমার সহযোগিতা ও সাহচর্যের সংবাদে ক্ষিপ্ত হইয়া কটূক্তি করিয়াছেন। ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই, কারণ শুধু যে শরৎ-সাহিত্যের সৌন্দর্য উপলব্ধি করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না তাহা নহে, নিরুপমার প্রতিভার অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না। বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন:

'শরৎচন্দ্র সুবিধামত অনেকের কাছে নিজের মর্যাদা বাড়াবার জন্যই হোক্, কিংবা শুধু কল্পনাবিলাসের আকাশকুসুম চয়নের জন্যই হোক্, বা আনন্দ-লাভের জন্যই হোক্, অনেক রকম অবান্তর ও অনধিকার রটনা করে বেড়িয়েছেন।...... ভদ্রসমাজের নামজাদা ঘরের সম্মানিত মহিলাদের সম্বন্ধে কতখানি সংযতভাবে কথা বলা উচিত, আজকের দিনের বহু সম্মানিত, সেদিনকার ছন্নছাড়া ভবঘুরে লোকটির সে উচ্চ শিক্ষা ছিল না; সে আমি, আমার স্বামী এবং এখনও দু' একজন নরনারী প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি। তিনি তাঁর বন্ধুর ছোট বোনকে বুড়ি বলে উল্লেখ করতে পারেন, সেটা কিছু বিচিত্র নয়, কিন্তু তাই থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, অর্ধশতাব্দী পূর্বে নিতান্ত নিয়মতান্ত্রিক ঘরের বালবিধবার শরৎচন্দ্রের মত অনাত্মীয় তরুণের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মেলামেশা চলতো।'

শরৎসাহিত্য সম্পর্কে অনুরূপা দেবী শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর মন্তব্য করিয়াছিলেন: 'পাতা খুলিতেই দেখা গেল, সেটা গল্পের খাতা। তাতে মনে হয় যেন চারটা গল্প ছিল। তাদের নাম ছিল—বোঝা, অনুপমার প্রেম.........।

গল্পগুলি ভাল না লাগুক মন্দও লাগিল না।...শরৎবাবুর দ্বিতীয় খাতা পাই ঐ অরুণ কাকারই দৌলতে। সেখানির সব লেখার কথা কেন জানি ভালরূপ মনে পড়ে না।......তারপরে হাতে পড়ে চন্দ্রনাথ এবং বড়দিদি।' অনুরূপা দেবীর এই মন্তব্য পড়িয়া কবি পোপের বিখ্যাত পংক্তিগুলি মনে পড়িল :

'Damn with faint praise, assent with civil leer,

And without sneering, teach the rest to sneer.' ইত্যাদি। এই জাতীয় উদ্ধত, উপলব্ধিহীন উক্তির উদ্ধৃতিই যথেষ্ট, প্রতিবাদের প্রয়োজন হয় না। ১৯২৮ সালে শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষে প্রথম যে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেই সভার জন্য সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন নিরুপমা দেবী। ইহা ছাড়া শরৎচন্দ্রের স্মৃতিচারণা করিয়া নিরুপমা দেবী দুইটি প্রবন্ধ লিখেন ('জয়শ্রী' ও 'ভারতবর্ষ')। এই সঙ্গীত রচনা ও এই বিনম্র, সশ্রদ্ধ, প্রীতিপূর্ণ প্রবন্ধ দুইটি অনুরূপা দেবীর কটূক্তির উপযুক্ত প্রত্যুত্তর। প্রসঙ্গতঃ ইহাও বলা যাইতে পারে অনুরূপার অশালীন মন্তব্য ও নিরুপমার প্রবন্ধ দুইটির তুলনা করিলে প্রতিভাহীন সাহিত্যিক দম্ভ ও প্রকৃত সাহিত্যিক প্রতিভার পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। দুঃখের বিষয়, বিদগ্ধ সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই 'গঙ্গাজল'কে একত্র করিয়া বিচার করিয়াছেন এবং সেই জন্য তিনিও নিরুপমার সৃষ্টির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। সাহিত্যক্ষেত্রে নিরুপমা অনুরূপার বান্ধবী নহেন, শরৎচন্দ্রের শিষ্যা।

অনুরূপা দেবী নিরুপমা দেবীকে তাঁহার সম্পত্তি বলিয়া মনে করিয়া শরৎচন্দ্রের অনধিকার প্রবেশে উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন আর রাধারাণী দেবী শরৎচন্দ্রকে তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পদরূপে গ্রহণ করিয়া নিজেদের মনের ব্যাঙ্কের লকারে গোপনে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ইঁহাদের অভিমত সম্পূর্ণ বিরোধী আর উভয়েই মুখ খুলিয়াছেন আলোচ্য প্রধানদের মৃত্যুর পর। উভয়কেই কালিদাসের ভাষা সামান্য বদলাইয়া বলা যাইতে পারে, 'বিচারমূঢ়া প্রতিভাতি মে ত্বম্।' একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। শরৎচন্দ্র ও নিরুপমা দেবী নিজেরা কিন্তু এই বিষয়ে লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ দেখেন নাই বা গোপনতা রক্ষা করেন নাই। আমার নিজের কথাই বলিতে পারি। 'বেণু' পত্রিকায় শরৎসাহিত্য সম্পর্কে আমার একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শরৎচন্দ্র আমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় 'বেণু' সম্পাদক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় ও ঐ পত্রিকার অন্যতম পরিচালক শ্রীনিকুঞ্জলাল সেনের সঙ্গে আমি সামতা

বেড়ে যাই এবং সেখানে কয়েক ঘণ্টা কাটাই। আমি শরৎচন্দ্রের সাহিত্য লইয়াই আলোচনা শুরু ও শেষ করি। আমার প্রথম প্রশ্নই ছিল তাঁহার রচনার কালানুক্রমিকতা সম্পর্কে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন যে তাঁহার খুব আগেকার একটি গল্প ছিল—'শুভদা'। কিন্তু তাঁহার এক পরম স্নেহভাজন লেখিকা সেই গল্পটি অবলম্বন করিয়া একখানা বই প্রকাশ করিয়াছেন। সেই কারণে তিনি উহা ছাপিবেন না এবং উহা আমাদের আলোচনা হইতে বাদ দিতে হইবে। নাম না করিলেও তাঁহার বর্ণনা হইতে আমি স্পষ্টতঃই বুঝিলাম যে এই লেখিকা নিরুপমা দেবী।

রাধারাণী দেবী (ও অন্য কল্পনাজীবীরা) যাহা পূর্বে শুনিয়াছেন বলিয়া এখন বলেন তাহার মর্মার্থ এই: (১) শরৎচন্দ্রের সঙ্গে নিরুপমা দেবীর খুব অন্তরঙ্গতা জন্মে এবং শরৎচন্দ্র বিবাহের প্রস্তাব করেন। নিজের অবশ হৃদয়কে শান্ত করিবার জন্য ও শরৎচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রেম হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য নিরুপমা শরৎচন্দ্রকে ভাগলপুর হইতে চলিয়া যাইতে বলেন। সেই জন্যই শরৎচন্দ্র প্রথমে গৃহত্যাগ করেন ও পরে কলিকাতায় আসেন।

(২) কলিকাতায় আসিয়াও কিন্তু শরৎচন্দ্র গোপনে নিরুপমাকে পত্রাদি লিখিতেন এবং এক বা একাধিক পত্র ভট্ট পরিবারের লোকের হাতে পড়ায় নিরুপমা বিব্রত ও বিড়ম্বিত বোধ করেন। তাই তিনি শরৎচন্দ্রকে লিখিয়া পাঠান, শরৎচন্দ্র যেন দূরে, বহু দূরে চলিয়া যান, দেশে থাকিয়া যেন তাঁহাকে 'নষ্ট' না করেন। সেই জন্যই অর্থাৎ নিরুপমা দেবীকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্যই তিনি বর্মা চলিয়া যান।

(৩) প্রেমের এই প্রত্যাখ্যানের জন্যই শরৎচন্দ্রের নৈতিক অবনতি ঘটে অর্থাৎ তিনি যে বাউণ্ডুলে হইয়া গেলেন ইহার জন্য নিরুপমাই দায়ী।

(৪) দূরে গেলেও নিরুপমার অদৃশ্য তর্জনীই শরৎচন্দ্রের রচনা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে—'প্রথম জীবনে নিজের শিল্পকে অন্যের মুখ চাওয়া করে রাখার মধ্যে শিল্পীর যে অসামান্য আত্মত্যাগ আছে বাউণ্ডুলে বে-হিসেবী মানুষ বলেই তা সম্ভব হয়েছিল।······নিরুপমা শরৎচন্দ্রকে তাঁর রচনা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন বার্মাতে।'

(৫) শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ নায়িকা—বিশেষ করিয়া অপর্ণা ('মন্দির'), মাধবী ('বড়দিদি'), রমা ('পল্লীসমাজ') এবং হেম ('পথ-নির্দেশ')—নিরুপমার চরিত্রকে

ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, এমন কি ক্রমে ক্রমে ইহারা 'মনে মনে বয়সে বেড়ে উঠেছেন।'

রাধারাণী এই প্রসঙ্গে শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন এবং মনে হয় সাহিত্যালোচনায় তাহার বিশেষ কোন মূল্যও নাই। নিরুপমা দেবী ও ভট্ট পরিবারের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্কই এখানে বিবেচ্য। প্রথমে সৌরীন মুখোপাধ্যায় কি বলেন তাহা উত্থাপন করা যাইতে পারে। যৌবনে যাঁহাদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁহারা তাঁহার উত্তরকালের সাফল্যের কথা কল্পনা করিতে পারেন নাই। ইঁহারা অতীতের কথা যখন লিখিয়াছেন তখন বহুদিনের পুরানো স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই লিখিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ বিবরণে ছোটখাটো ভুল বা অসঙ্গতি থাকিবেই। সেই সব গৌণ ত্রুটি উপেক্ষা করিয়া যাহা নির্ভরযোগ্য বা প্রামাণ্য তাহা গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইলে এই লেখক ও লেখিকার সম্পর্ক আমরা মোটামুটিভাবে অনুধাবন করিতে পারি। সৌরীন্দ্রমোহন 'বড়দিদি'র প্রকাশ সম্পর্কে শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ও রবীন্দ্রনাথের কথোপকথন সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কথা সত্য না হইতে পারে। কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য যে সৌরীন্দ্রমোহনই 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' প্রকাশ করিয়াছিলেন, যদিও ইহাও কম বিস্ময়ের কথা নয় যে, শরৎচন্দ্র নিজে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। এমন কি সাফল্যের উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি যখন সংক্ষেপে আত্মকথা লিখিয়াছেন তখনও তিনি ১৯.৩ সালে 'যমুনা' পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ হইতেই সাহিত্যকীর্তির আখ্যান শুরু করিয়াছেন। সেই বিবরণে 'বড়দিদি'র 'ভারতী'তে প্রকাশের কথা কিছু বলেন নাই।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ই 'ভারতী'র জন্য 'বড়দিদি'র পাণ্ডুলিপি আনিয়া দিয়াছিলেন এবং মূল পাণ্ডুলিপির খাতা তিনি পাইয়াছিলেন ভট্টদের বাড়িতে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ভট্টবাড়িতে শরৎচন্দ্রের ফেলিয়া যাওয়া রচনার খাতা সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে খঞ্জরপুরের সাহিত্য-সভা ও ভট্টবাড়ির সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে সৌরীন্দ্রমোহনের কয়েকটি মন্তব্য অনুধাবন-যোগ্য। সৌরীন্দ্রমোহন লিখিয়াছেন, '১৯০০ সালে ভাগলপুরে আমি যখন এফ্-এ পড়ি তখন শরৎচন্দ্র বেশ কায়েমিভাবে বিভূতি ভট্টদের গৃহে নিজেকে জমিয়ে তুলেছেন।' আর একটি মন্তব্য আরও ব্যঞ্জনাময়: 'এ সময়টায় শরৎচন্দ্র থাকতেন পুঁটুদের (বিভূতি ভট্টদের) বাড়িতে।......গল্প লিখতেন অনর্গল।

এ যাবৎ পুঁটু আর তার ভগ্নী নিরুপমা এঁরাই ছিলেন তাঁর পাঠক-পাঠিকা। সে দলে আমিও ইনিসিয়েটড হলুম।' এরও এক যুগ পরে শরৎচন্দ্র যখন সাহিত্যের আসরে পুনঃপ্রবেশ করিয়াছেন, তখন তিনি 'যমুনা'য় আমোদিনী ঘোষজায়া, অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবীর সমালোচনা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখেন। ইহাতে নিরুপমার রচনার দুই একটি দোষ দেখাইলেও তিনি তাঁহার সম্পর্কে সস্নেহ ও সপ্রশংস। ছদ্মনামে লিখিত হইলেও বিভূতিভূষণ ভট্ট বুঝিতে পারেন যে, ইহা শরৎচন্দ্রের রচনা এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে জানান, '····· আমি বুড়িকে এই স্ত্রী-নামধারী উদ্ধত মহাপুরুষের অথবা স্ত্রীলোকের স্বত্ব-রক্ষাকারী ডন্ কুইক্সোটের কথার প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছি।' শরৎচন্দ্র বুড়িকে প্রতিবাদ করিতে নিষেধ করিয়া সৌরীন্দ্রমোহনকে চিঠি দিয়াছেন, বুড়ি ইহা লিখিবে বলিয়া নহে, তিনি নিজে লিখিত প্রতিবাদ পছন্দ করেন না বলিয়া। এই সব ঘটনায় কয়েকটি অনুমান আভাসিত হয়। ভাগলপুরের সাহিত্য-সভার একটি ক্ষুদ্র অন্তরঙ্গ সভা বা ইনার ক্যাবিনেট ছিল যাহার প্রধান শরৎচন্দ্র এবং অনুগামী পুঁটু ও বুড়ি। সেই দলে সৌরীন্দ্রমোহনও প্রবেশ করিাছিলেন বলিয়া শরৎচন্দ্রও মনে করেন। দ্বিতীয়তঃ ইহার মধ্যে গোপনীয়তা বা আপত্তিকর কিছু ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলে অগ্রজ বিভূতিভূষণ কনিষ্ঠা ভগিনীকে প্রতিবাদ করিতে বলিতেন না, এবং শরৎচন্দ্রের চিঠিতেও পূর্ব সম্পর্কচ্ছেদের প্রতিধ্বনি থাকিত। ইহা হইতে মনে হয় যে, অনুরূপা দেবী শরৎচন্দ্রের 'রচনা'র মধ্যে যে কুরুচি দেখিতে পাইয়াছেন এবং রাধারাণী দেবী যে রোমান্স রচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত।

এই অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর অন্যতর সভ্য, নিরুপমা দেবীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিভূতিভূষণ ভট্ট (পুঁটু) শরৎচন্দ্রের স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেও অনুরূপা দেবীর জুগুপ্সার কোন সমর্থন পাওয়া যায় না এবং রাধারাণী দেবী যে রোমান্স রচনা করিয়াছেন তাহাও অতিরঞ্জিত এবং অনেকটা স্বরচিত বলিয়া মনে হয়। বিভূতিভূষণ শরৎচন্দ্রের অপরিসীম ভালবাসার ক্ষমতার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এই ভালবাসা কোথাও সীমা অতিক্রম করিয়াছে এমন কথা বলেন নাই। শরৎচন্দ্র শরীরের উপর অত্যাচার করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এই কথা বলিয়া তাঁহার যৌবনের পানদোষের ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু কোনরূপ অশোভন আচরণের আভাস দেন

নাই। বরং তাঁহার বিধবা ভগিনী নিরুপমার ও শরৎচন্দ্রের সম্পর্ককে সাহিত্যিক গুরু ও শিষ্যার স্বাভাবিক সম্পর্ক হিসাবেই বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহারাই যে এই 'সাহিত্য-সম্রাট'কে প্রথম পূজা করিয়াছেন ইহা চিন্তা করিয়া আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন। বিভূতিভূষণের অনুমান তাঁহাদের রচনা, 'বিশেষতঃ নিরুপমার খাতাখানা', তাঁহাদের দাদাদের মারফতেই শরৎচন্দ্রের হাতে পড়িয়াছিল। শরৎচন্দ্র বর্মা দেশে গেলে ইঁহাদের বাহিরের ঘনিষ্ঠতা খানিকটা কমিয়া যায় বটে কিন্তু অন্তরের অন্তরঙ্গতা ম্লান হয় নাই। শরৎচন্দ্র এই শিষ্য ও শিষ্যাকে বর্মা হইতে ভাল কলম উপহার দিয়াছিলেন। নিরুপমাকে প্রকাশ্যভাবে ডাকযোগে কলম উপহার দেওয়ায় কোন অশোভনতা ছিল বিভূতিভূষণের রচনায় তাহার কোন ইঙ্গিত নাই এবং নিরুপমা সেই উপহার সহজ ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই উপহারে বা পূর্বস্মৃতির আলোড়নে অন্তঃপুরচারিণীর বিশুদ্ধ ধর্মচর্চায় কোন ব্যাঘাত হইয়াছিল অথবা তাঁহার পবিত্র চরিত্রে কোন কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছিল এমন মনে হয় না। ইহা অনুরূপা দেবীর 'রটনা'।

শরৎচন্দ্র নিজে বহু জায়গায় নিরুপমার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কিছু লুকাইবার আছে এমন আভাস কোথাও নাই। শুধু 'শুভদা' ছাপিলে নিরুপমার 'অন্নপূর্ণার মন্দির' উপন্যাসের মৌলিকতা লইয়া প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই সম্ভাবনায় তিনি উহা ছাপেন নাই, কিন্তু ইহার পাণ্ডুলিপি যে পোড়ানো হয় নাই, ইহাও তিনি জানিতেন। তাঁহার বহু চিঠি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম চিঠি বিভূতিভূষণকেই লেখা—বর্মা যাওয়ার পাঁচ বৎসর পরে ১৯০৮ সালে। ইহার মধ্যে আত্মগ্লানি আছে, বন্ধুবান্ধবদের সম্পর্কে অভিমান আছে, নিজের দোষক্ষালনের কিঞ্চিৎ চেষ্টা আছে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় নিরুপমা বা বুড়ি সম্পর্কে কোন গোপনীয়তা নাই, কোন সঙ্কোচ নাই ; বরং ছাত্র ও ছাত্রীকে একত্র করিয়া গুরু অসঙ্কোচে তাঁহার দাবী পেশ করিয়াছেন : 'চিরদিনই মনে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি, তুমি আর বুড়ি আমার প্রতি বিমুখ হইবে না......।' শুধু তাই নয় বুড়ির সংবাদ যে তিনি পান এবং তাঁহার লেখা পাইলে যে তিনি কত যত্ন করিয়া পড়েন তাহা জানাইয়াছেন এবং বুড়ির কাছে তাঁহার নাম না করিয়া বুড়ির লেখার খাতা তাঁহাকে পাঠাইতে লিখিয়াছেন।

'নাম না করার' একমাত্র কারণ মনে হয় যে নাম করিলে তখনও সাহিত্যজগতে অপরিচিতা বা স্বল্পপরিচিতা লেখিকা ইহাতে সঙ্কোচ বোধ

করিবেন। এই পত্র হইতে আরও বোঝা যায় যে, শরৎচন্দ্র ভট্ট পরিবারের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন, ইন্দুভূষণ ভট্টর প্রথমা স্ত্রীর, তাঁহাদের বোন খুকুমণি ও সুরেশ্বরীর এবং তাঁহাদের মার সংবাদাদি লইয়াছেন। এমন কি ইহাদের মা যে তাঁহাকে তখনও ভালবাসিতেন এখন তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন তাহাও লিখিয়াছেন। ইহা হইতে ভট্ট পরিবারের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা প্রমাণিত হয় এবং নিরুপমার রচনার প্রতি তাঁহার অনুরাগও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যিনি নিজে শ্রেষ্ঠ প্রতিভার অধিকারী তিনি অপরের মধ্যেও প্রতিভার অঙ্কুর চিনিতে পারিবেন—ইহাই তো স্বাভাবিক। অপরদিকে নিরুপমাও শরৎচন্দ্রের জীবিতকালেই অকুণ্ঠ চিত্তে এবং স্পষ্ট ভাষায় নিজেকে শরৎচন্দ্রের শিষ্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া শ্লাঘা অনুভব করিয়াছেন। (জয়শ্রী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০)।

শরৎচন্দ্র যখন 'যমুনা' কাগজের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখনই তিনি তাঁহার 'শিষ্য'মণ্ডলীর উপর 'পরওয়ানা' জারি করিবার কথা ভাবিতে লাগিলেন এবং বিশেষ করিয়া মনে করিলেন বুড়ির কথা। এই বিষয়ে তিনি বন্ধু প্রমথ ভট্টাচার্যকে লিখিয়াছেন এবং 'যমুনা' সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালকে একাধিক চিঠিতে নিরুপমা দেবীকে ধরিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। দুই একটি উদ্ধৃতি হইতেই তাঁহার মনোভাব সুস্পষ্ট হইবে: 'নিরুপমাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া যদি তাহার লেখা বেশি পাইতে পারেন চেষ্টা করিবেন। সে বাস্তবিকই ভাল লেখে। সে আমার ছোট বোনও বটে ছাত্রীও বটে।' অন্যত্র, 'নিরুপমাকে নিজের দলে টানিবার চেষ্টা করিবেন।......অনেক সময় এবং বেশীর ভাগ সময়ই আমার চেয়েও তাঁর লেখা ভাল বলেই আমার মনে হয়।'

শরৎচন্দ্র যখন নিরুপমা দেবী সম্পর্কে এত সপ্রশংস মন্তব্য করিয়া ব্রহ্মদেশ হইতে বিভূতি ভট্ট, প্রমথ ভট্টাচার্য ও ফণীন্দ্র পালকে চিঠি দেন তখন কিন্তু তিনি নিরুপমা দেবীর উপন্যাসের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। তিনি ভাগলপুরে থাকিতে নিরুপমার প্রথম গল্প 'উচ্ছৃঙ্খল' পড়িয়াছিলেন ও সেই সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছিলেন। তখন নিরুপমা কবিতাই লিখিতেন বেশি। যখন ব্রহ্মদেশ হইতে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে আবার সাহিত্য রচনা শুরু করিলেন, তখন দেখা যায় শরৎচন্দ্র 'অন্নপূর্ণার মন্দির' পড়িয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি নিরুপমা দেবীর শ্রেষ্ঠ রচনা, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, 'দিদি'র কোন সংবাদ রাখিতেন না। এমন কি, মনে হয় না পড়িয়াই বোধহয় 'দিদি'কে

অনুরূপা দেবীর রচনা মনে করিয়া সম্পূর্ণ ভুল মন্তব্য করিয়া প্রমথ ভট্টাচার্যকে লিখিয়াছেন (২৫.৭.১৩), '..... দেখছি তো ভাই, এই সব খবরের কাগজে ফেকাসে, রক্তহীন উপন্যাস বেরিয়েই যাচ্ছে—কেউ পড়ে না। ঐ 'ভারতী'র বাগ্‌দত্তা, পোষ্যপুত্র, দিদি—অরণ্যবাস কেউ পড়ে না—বারো আনা লোকেই পড়ে না, যদিও পড়ে নেহাৎ ব্যাগার খাটা গেছে।' এই সময়ে 'দিদি' (এবং অবিনাশচন্দ্র দাসের 'অরণ্যবাস') প্রকাশিত হইয়াছিল 'প্রবাসী'তে, 'ভারতী'তে নয়। 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল 'অন্নপূর্ণার মন্দির' যাহা শরৎচন্দ্র পড়িয়াছিলেন এবং তাহার সম্পর্কে 'যমুনা'য় মোটামুটি সপ্রশংস সমালোচনা করিয়াছিলেন।

মনে হয় শরৎচন্দ্র বর্মায় যে তের বছর ছিলেন সেই সময় নিরুপমা দেবীর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সংযোগ ছিল না। অবশ্য কলিকাতা বা ভাগলপুরের কাহারও সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল না। তবু কলিকাতায় ছুটি লইয়া আসিলে অপর সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হইত, কিন্তু বুড়ি ও পুঁটুর সঙ্গে কোন যোগাযোগ হয় নাই। এই ব্যবধানে কিন্তু কোন মানসিক দূরত্বের সৃষ্টি হয় নাই, কারণ ১৯১৩ সালেই তিনি ইঁহাদের কাছে কলম উপহার পাঠাইয়াছেন এবং ১৯১৬ সালে পাকাপাকিভাবে দেশে ফিরিয়া অনায়াসে পূর্বের সহজ, নিবিড় সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন করিয়াছেন। নিরুপমা দেবীকে লিখিত তাঁহার একখানা মাত্র চিঠি ছাপা হইয়াছে—ইহা স্নেহে, কৌতুকে, প্রত্যাশায় সমুজ্জ্বল। তখন ভট্টরা বহরমপুরে বসবাস করিতেছেন। শরৎচন্দ্র নিরুপমা দেবীর সঙ্গে সোজা-সুজি পত্রালাপ করিয়াছেন। ইহাতে জড়তা, আড়ষ্টতা, সঙ্কোচ বা গোপনতা নাই। চিঠিখানি নিরুপমা দেবীর চিঠির উত্তর। নিরুপমা দেবী নিজের লেখা দুই-খানা খাতা পাঠাইয়াছেন এবং মনে হয় নিরুপমা শরৎচন্দ্রকে তাঁহাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র সেই আমন্ত্রণ অতি সহজভাবে, নিতান্ত আত্মীয়ের মত গ্রহণ করিয়াছেন। নিরুপমাকে সাহিত্য রচনায় তিনি 'মানুষ' করিয়াছেন বলিয়া শরৎচন্দ্র পুনরায় গর্ব প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই দাবীর মধ্যে খানিকটা আতিশয্য আছে ইহা মানিয়া লইয়াও ইহাতে আত্মশ্লাঘা অনুভব করিয়াছেন। ইহার মধ্যে না আছে গোপনতা না আছে বাহাদুরি বা রটনা।

শরৎচন্দ্র ও নিরুপমার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিবার সময় একটি কথা স্মরণ করিতে হইবে—সাহিত্যে ও জীবনে শরৎচন্দ্র অতিসংযমের বিরোধী, তিনি ইহাকে অসংযমের মতই অপরাধ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি নিজে নাকি

সন্ন্যাসী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন তাহা বোধ হয় সন্ন্যাসজীবনের 'রস" আস্বাদন করিতে, কিন্তু তাঁহার পরম স্নেহভাজন দিলীপ রায় অরবিন্দ-আশ্রমে যোগ দেওয়ায় তিনি মর্মবেদনা অনুভব করিয়াছেন এবং অনিল রায়ের সন্ন্যাস-চর্চা লইয়া তীব্র ব্যঙ্গ করিয়াছেন। সেই কারণেই নিরুপমার ধর্মকর্মের বিরুদ্ধে তাঁহার আপত্তি ও অভিযোগ আছে। নিরুপমার প্রতিভা আছে এবং সেই প্রতিভার বিকাশেই তাঁহার সার্থকতা, ধর্মকর্মের চাপে সেই প্রতিভার কণ্ঠরোধ হইতেছে দেখিয়াই তিনি তাঁহাকে পুনরায় সাহিত্যক্ষেত্রে টানিয়া আনিতে চাহিয়াছেন। তাই তিনি নিরুপমাকে লিখিয়াছেন, 'সত্যি, এমন করে না লিখলে তোমার লেখা আর হবেই না। ধর্মকর্মের চাপে সাহিত্যচর্চার টিকিটুকুও তোমাতে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

নিরুপমাকে দেখিয়া ও নিরুপমার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া শরৎচন্দ্রের মনে একটা প্রশ্ন খুব বেশি করিয়া জাগিয়াছিল যাহা তাঁহার নিজের মননশক্তিকে ও কল্পনাশক্তিকে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়াছিল, ইহাই শরৎচন্দ্রের জীবনে নিরুপমার সব চেয়ে বড় দান। খুব অল্প-পরিচিতা জনৈকা মহিলাকে তিনি লিখিয়াছেন, 'তোমাকে আর একটা প্রশ্ন করিব। যে বিধবা স্বামীকে জানে নাই চিনে নাই……কিন্তু যে একবার জানিয়াছে চিনিয়াছে—অর্থাৎ যে ষোল সতর বছর বয়সে বিধবা হইয়াছে তাহার সুদীর্ঘ জীবনে আর কাহাকেও ভালবাসিবার বা বিবাহ করিবার অধিকার নাই? নাই কিসের জন্য?' পরের চিঠিতে লিখিয়া-ছেন, 'আমার সত্যকারের শিষ্যা এবং সহোদরার অধিক একজন আছে, তাহার নাম নিরুপমা। … এই মেয়েটিই একদিন যখন তাহার ষোল বৎসর বয়সে অকস্মাৎ বিধবা হইয়া একেবারে কাঠ হইয়া গেল, তখন তাহাকে বারবার করিয়া এই কথাটাই বুঝাইয়াছিলাম, "বুড়ি, বিধবা হওয়াটাই যে নারীজন্মের চরম দুর্গতি এবং সধবা থাকাটাই সর্বোত্তম সার্থকতা ইহার কোনটাই সত্য নয়।" তখন হইতে সমস্ত চিত্ত তাহার সাহিত্যে নিযুক্ত করিয়া দিই, তাহার সমস্ত রচনা সংশোধন করি এবং হাতে ধরিয়া লিখিতে শিখাই—'তাই আজ সে মানুষ হইয়াছে, শুধু মেয়েমানুষ হইয়াই নাই।' এই সকল শরৎচন্দ্র লিখিয়াছিলেন বর্মা হইতে কলিকাতায় ফিরিবার তিন বৎসর পরে ১৯১৯ সালে। মনে হয় তিনি এখানে আসিয়া অন্ততঃ নিরুপমার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'দিদি' পড়িয়াছেন এবং তাঁহার সাহিত্যকীর্তির সঙ্গে পরিচিতি হইয়াছেন। কিন্তু নিরুপমা দেবীর সমস্ত চিত্ত যে সাহিত্যে নিযুক্ত হয় নাই, শরৎচন্দ্রের চিঠিতে,

নিরুপমার আত্মীয়দের বর্ণনায়, নিরুপমার পরবর্তী জীবনে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। তবু নিরুপমার মধ্যে অনন্যসাধারণ প্রতিভা এবং গল্প-উপন্যাস লিখিবার সুপ্ত শক্তিকে যে তিনি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন ইহা তাঁহার কৃতিত্ব। কিন্তু সংশোধন করা দূরে থাকুক, তিনি মাসিকপত্রে বা গল্পাকারে প্রকাশের পূর্বে 'উচ্ছৃঙ্খল' ছাড়া নিরুপমার অন্য কোন উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি দেখেন নাই। বৈধব্যের ব্যর্থতা এবং নারীজীবনের সার্থকতা লইয়া ইহাদের কোন তর্ক হইয়াছিল ইহাও সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

শরৎচন্দ্র যে রাধারাণী দেবীকে লিখিয়াছিলেন, 'আমার একজন "গারজেন" ছিলেন। এঁর পরিচয় জানতে চেয়ো না। শুধু এইটুকু জেনে রাখ...তিনিই ছিলেন আমার লেখার সবচেয়ে কঠোর সমালোচক।...এলো-মেলো একটা ছত্রও তাঁর কখনো দৃষ্টি এড়াত না। কিন্তু, এখন তিনি সব ছেড়ে ধর্ম কর্ম নিয়ে ব্যস্ত ..' তাহাও ঔপন্যাসিকের কল্পনামাত্র। নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্কের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় তিনি শরৎচন্দ্রের প্রথম পর্বের লেখা অন্তঃপুরে বসিয়া পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করার মত কোন আগ্রহ, অবকাশ বা সাহস তাঁহার ছিল না। শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশে যাওয়ার পর প্রথম দশ বছর প্রায় কিছুই লেখেন নাই। বোধ হয় 'চরিত্রহীন' শেষ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে পাণ্ডুলিপি আবার পুড়িয়া গিয়াছিল। যেহেতু 'চরিত্রহীন' বইটির প্রথমাংশ ভাগলপুর-পর্বেই রচিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহার কথা সাধারণ ভাবে নিরুপমার মনে ছিল। তবে ভাগলপুরে লেখা শরৎচন্দ্রের রচনা তিনি ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন এবং প্রতিভাবলেই শরৎচন্দ্রের রচনারীতির সঙ্গে তাঁহার অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। তাই সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে প্রকাশিত 'মন্দির' গল্পের লেখক যে শরৎচন্দ্র তাহা বুঝিতে তাঁহার অসুবিধা হয় নাই। কলিকাতায় আসার পর ইঁহাদের পূর্ব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় বটে এবং শরৎচন্দ্র তাঁহাদের বাড়িতে কয়েক দিনের জন্য অতিথিও হইয়াছেন, কিন্তু সাহিত্যিক সম্পর্ক আর গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে যে সকল রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তাঁহার মৃত্যুর পরে লিখিত (১৩৪৪) নিরুপমা দেবীর 'আমাদের শরৎদাদা' অনেক দিক দিয়া অনন্য। ইহা সংক্ষিপ্ত, বাক-সংযত অথচ ভাবগম্ভীর এবং মর্মস্পর্শী। শিরোনামা হইতেই বোঝা যায় যে তিনি শরৎচন্দ্রকে তাঁহার একার নয়, সমগ্র গোষ্ঠীর

অগ্রজোপম, 'সম্মানিত' বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন এবং অন্তরালবর্তিনী হইলেও তিনি শরৎচন্দ্রের প্রতিভার স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি হারানো 'অভিমান' ও 'পাষাণ' গল্প দুইটি সম্পর্কে বলিয়াছেন, '...ঐ দুইটি গল্পে যে তরুণ শরৎচন্দ্রের কতখানি প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছিল সে দুইটি নষ্ট না হইলে আজ তাহার বিচার হইত।' যে কেহ 'শুভদা' পড়িয়াছেন, তিনিই লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে ইহা শরৎচন্দ্রের অপরিণত রচনা। একটা বিষয়ে আরও বেশি খট্‌কা লাগে। ইহার উপসংহার অস্পষ্ট এবং শরৎচন্দ্রের প্রথম দিকের অন্যান্য রচনার সঙ্গেও অনেকটা সঙ্গতিহীন। ললনার মধ্যে বিরাজ বৌ বা সাবিত্রীর পূর্বাভাস নাই। নিরুপমা দেবী স্বীকার করিয়াছেন যে, 'অন্নপূর্ণার মন্দির' লিখিতে গিয়া অলক্ষ্যে গল্পের মধ্যে 'শুভদা'র আভাস আসিয়াছে। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে নিরুপমা সতীর যে পরিণতি দেখাইয়াছেন তাহা ললনার পরিণতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই প্রসঙ্গে নিরুপমা দেবীর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : '"শুভদা" নামে একখানা খাতার অনেকখানি হইলেও সেটি আর শেষ হয় না—'। আমার বেশ মনে আছে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'শুভদা' যখন মুদ্রিত হয়, তখন প্রকাশক প্রমাণ হিসাবে পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠার ফটো ছাপিয়াছিলেন, শেষ পৃষ্ঠার নয়। সংযতবাক্‌ নিরুপমা দেবীর বক্তব্য হইতে সন্দেহ জাগে যে শেষাংশ শরৎচন্দ্রের পাণ্ডুলিপির অংশ কিনা; ইহাও লক্ষণীয় যে, মুদ্রিত 'শুভদা'র উপসংহারের সঙ্গে 'অন্নপূর্ণার মন্দিরে'র উপসংহারের কোন সাদৃশ্য নাই।

নিরুপমা দেবী তাঁহাদের 'শরৎদাদা'র সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার মধ্যে দূরত্বের সঙ্গে নৈকট্যের অপরূপ ব্যঞ্জনা আছে। অন্ততঃ অনুরূপা দেবী যে 'ধৃষ্টতা'র অভিযোগ 'রটনা' করিয়াছেন তাহার আভাস মাত্র নাই। নিরুপমা তাঁহার স্বামীর সপিণ্ডকরণের যে 'করুণ-মধুর' বর্ণনা দিয়া তাঁহার স্মৃতিকথা শেষ করিয়াছেন, তাহার মধ্যেই ইঁহাদের সম্পর্ক দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। এই অনুচ্ছেদের প্রারম্ভেই তিনি বলিয়াছেন, 'আজ তাঁহার শ্রাদ্ধতিথিতে একটা শ্রাদ্ধতিথির কথা মনে পড়িতেছে, যাহাতে তিনি আমাদের পূর্ণমাত্রায় অবরোধপ্রথাবিশিষ্ট গৃহান্তঃপুরের মধ্যে আত্মজনের মত প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।' সেই দিন এই বেদনাবহ অনুষ্ঠানে অন্য দুইটি লোকের সঙ্গে যে তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তিনি শরৎচন্দ্র এবং অনুষ্ঠান সমাপনান্তে নিরুপমা দেবী পাড়ওয়ালা কাপড় ও হাতের গহনা পরিতে অনিচ্ছা প্রকাশ

করিয়া চাহিয়া দেখেন, 'একজন বাহিরের লোক—তিনিও তাঁহাদের [বিধবা ভ্রাতৃজায়া ও বিভূতিভূষণ ভট্টের] সঙ্গে কাঁদিতেছেন—এ দৃশ্য সে দিন শোকে মূঢ় ব্যক্তিকেও নিজ কার্যে লজ্জা আনিয়া দিয়াছিল। শরৎদাদার বন্ধুবর্গ যে তাঁহার মনকে খুব কোমল পরদুঃখকাতর বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন সেদিনে আমাদের নিকটেও তাহা এইরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল।'

এই প্রসঙ্গে একাধিকবার 'পথ-নির্দেশ' গল্পের নায়িকা হেমনলিনীর কথা উত্থাপিত হইয়াছে। গুণী ও হেমনলিনীর কাহিনীর সঙ্গে শরৎচন্দ্র ও নিরুপমার জীবনের কাহিনীর কোনই মিল নাই এবং তার্কিক, প্রগল্‌ভবাক্‌, হিন্দু আচারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হেমনলিনীর মধ্যে ধর্মনিষ্ঠ, আচারপরায়ণ, সংযতবাক্‌, লোকচক্ষুর অন্তরালবর্তী নিরুপমাকে খুঁজিতে গেলে সাহিত্য ও বাস্তব উভয়ের প্রতি অবিচার করা হইবে। ইহা মানিতে হইবে শরৎচন্দ্র নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, 'পথ-নির্দেশ' গল্পের অন্তরালে স্বীয় বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা নিহিত রহিয়াছে। তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রমথ ভট্টাচার্যকে লিখিয়াছিলেন, ' "পথ-নির্দেশ" পড়েছ? কেমন লাগল? কিছু মনে পড়ে ভাই—বহুদিনের একটা গোপন কথা?' তিনি এখানেই থামিয়া গিয়াছেন। প্রমথ ভট্টাচার্যও ঐই সময় বুড়ি বা নিরুপমার নিকট হইতে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার জন্য একটা 'চমৎকার' কবিতা পাইয়াছেন, ইহা শরৎচন্দ্রকে জানাইয়াছেন, আর কিছু বলেন নাই। নিরুপমার সঙ্গে ইঁহাদের সম্পর্ক সম্পূর্ণ ভাবে সাহিত্যঘটিত। যে মহিলার কথা হেমনলিনীর মধ্যে আভাসিত হইয়াছে তিনি শরৎচন্দ্রের জীবনে গোপনে আসিয়াছিলেন এবং উভয় বন্ধুই তাঁহাকে গোপনেই বিস্মৃতির অন্তরালে যাইতে দিয়াছেন। তাঁহাকে লইয়া টানাটানি করিয়া লাভ নাই।

সাহিত্যসাধক চরিতমালার জন্য বিভূতিভূষণ ভট্ট নিরুপমার সাহিত্যসাধনার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, নিরুপমা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্য দুই নারীর প্রভাবেও পড়িয়াছিলেন এবং শেষ জীবনে সংসার হইতে একেবারেই বিদায় লইয়া ধর্মচর্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। নিরুপমাও দুঃখের সহিত স্বীকার করিয়াছেন যে, তৎপূর্বে শরৎচন্দ্রের নিকটবর্তী হইয়াও তাঁহারা জীবিতকালে তাঁহাকে যথেষ্ট মর্যাদা দেন নাই। ইহা সংযত ও সংক্ষিপ্ত স্বীকৃতি, ইহার মধ্যে ব্যর্থ প্রণয়ের নামগন্ধও নাই। বহুকাল পরে বৃন্দাবনে সন্ন্যাসিনী বজ্রাওনের নবাবনন্দিনীর মত তিনি রাধারাণী দেবীকে দেখিয়া গদগদ করিয়া তাঁহার পূর্বপ্রেমের কাহিনী বলিবেন এবং শরৎচন্দ্র তাঁহারই জন্য 'বাউণ্ডুলে'

হইয়াছিলেন এই রহস্য উদ্ঘাটিত করিবেন—মানুষের আটপৌরে বুদ্ধিতে ইহা বিশ্বাস করা শক্ত। শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী হইতে দুইটি উদ্ধৃতি দিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'পৃথিবীতে কৌতূহল বস্তুটার মূল্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া, যত বড়ই হোক্ তাহাকে দমন করার পুণ্যও সংসারে অল্প নয়।' আর রাধারাণীর 'লীলাকমল' পড়িয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, 'আর যাই হোক এ তোমার জীবনের বাস্তব উপলব্ধি থেকে লেখা নয়।' রাধারাণী শরৎচন্দ্র সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পড়িয়া এই দুইটি কথাই বারংবার মনে হয়। নিরুপমা দেবী রাধারাণী দেবীকে কি বলিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু 'জয়শ্রী' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০) পত্রিকায় এই জাতীয় জীবনচরিত সন্ধানীদিগকে তিনি 'কল্পনাজীবী' বলিয়া তীক্ষ্ণ উপহাস করিয়াছেন এবং তাঁহার অগ্রজ ও সহযোগী বিভূতিভূষণ ইঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র ও নিরুপমার মধ্যে যে গভীর আন্তরিক সংযোগ ছিল তাহা লৌকিক জীবনের প্রণয়ের অতীত, তাহা প্রতিভার সঙ্গে প্রতিভার মিলন, এক প্রতিভার সংস্পর্শে আর এক প্রতিভার উন্মেষ ও পরিণতির সম্পর্ক। ইহা লৌকিক জীবনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যকে অতিক্রম করিয়া অ-লৌকিক সাহিত্যজগতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যাইতে পারে :

'নির্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি।'

প্রথম 'অন্নপূর্ণার মন্দির' ও 'শুভদা'র কথাই ধরা যাইতে পারে। যে 'শুভদা' আমরা পাইয়াছি, তাহার শেষের অংশ নিরুপমা দেখেন নাই এবং এই দুইটি উপন্যাসের উপসংহারে পার্থক্য আছে। মূল কাহিনী নিরুপমা দেবী দুইটি গ্রাম্য বালিকার দারিদ্র্যপীড়িত জীবন হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিয়াছেন যে, অলক্ষ্যে শরৎচন্দ্রের 'শুভদা'র ছায়া ইহার উপর পড়িয়াছে। কিন্তু দুই উপন্যাসে বৈসাদৃশ্যও খুব লক্ষণীয়। 'শুভদা' খুব অপরিণত রচনা হইলেও শরৎচন্দ্রের প্রতিভার ঝোঁক কোন্ দিকে তাহা বোঝা যায়। ললনা ও ছলনার বাবা হারাণ দুশ্চরিত্র; তাহার বেশ্যাসক্তি ও তহবিল ভাঙার জন্যই পরিবারের দুর্দশা এবং দুর্দশার চরম সীমায় পঁহুছিয়াও সে জুয়াখেলার নেশা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। কিন্তু শরৎচন্দ্রের তাহার

প্রতিও খানিকটা মমতা আছে; তিনি তাহাকে উপন্যাসের villain বা দুষ্কৃতকারী বলিয়া চিত্রিত করেন নাই। সতী ও সাবিত্রীর পিতা রামশঙ্কর দরিদ্র কিন্তু সচ্চরিত্র। হারাণ মুখোপাধ্যায়কে যিনি আঁকিয়াছেন তিনিই পরবর্তীকালে 'চরিত্রহীন' সতীশকে নায়ক করিয়াছিলেন। বিপাকে পড়িয়া বিধবা ললনা পূর্বপ্রণয়ী শারদাকে প্রেম নিবেদন করিয়াছিল, এমন কি উপযাচিকা হইয়া বিবাহের প্রস্তাব পর্যন্ত করিয়াছিল। শুদ্ধান্তঃপুরচারিণী নিরুপমা দেবীর উপন্যাসের নায়িকা সতী তাহা পারে নাই, কিন্তু যে বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে তাহার একদিন বিবাহের কথা হইয়াছিল বৈধব্যের মধ্যেও ধর্মবুদ্ধি অতিক্রম করিয়া সেই বিশ্বেশ্বরের দয়ার মূর্তি দারিদ্র্যের পাষাণ-ফলকে ফুটিয়া উঠিত এবং সেই অভিমানেই যে সে বিশ্বেশ্বরের দান গ্রহণ করিতে পারে নাই ইহা সে মৃত্যুর পূর্বে বলিয়া গিয়াছে। এইভাবে বিশ্বেশ্বরের প্রতি সুপ্ত অনুরাগ মুহূর্তের জন্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বালবিধবার হৃদয়ে প্রণয়ের এই ফল্গুধারার মধ্যে শরৎপ্রতিভার আংশিক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

'অন্নপূর্ণার মন্দির' সুলিখিত গল্প, কিন্তু ইহার বছর খানেক আগে লেখা 'দিদি' একখানা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রচনার বাহিরে এইরূপ উঁচুদরের উপন্যাস বেশি আছে কিনা সন্দেহ। অনুরূপা দেবীর সঙ্গে নিরুপমাকে যুক্ত করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'বঙ্গ-উপন্যাসে Jane Austen বা George Eliot-এর আবির্ভাব এখনও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত।' এই মন্তব্য 'দিদি' সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে, কারণ বিশ্লেষণের নিবিড়তা ও জটিলতায় জেন অস্টেন বা জর্জ এলিয়টের কোন উপন্যাসই 'দিদি'র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে না।

অবশ্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করিয়াছেন যে, সুরমার মত এমন সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে পরিকল্পিত এবং প্রতি অঙ্গভঙ্গীতে জীবন্ত কোন চরিত্র শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের বাহিরে পাওয়া যায় না এবং নিরুপমা দেবী যে একটু ক্ষোভের সহিত বলিয়াছেন যে, শরৎচন্দ্রের উদয়ের পরে বহু যুবক শরৎসাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার রচনার সাদৃশ্য লইয়া তাঁহাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করিয়াছে তাহারও কারণ রচনাভঙ্গির সাদৃশ্য। শরৎচন্দ্র এই ভঙ্গিকে বলিয়াছেন 'সাইকোলজিকেল ও অ্যানালিটিকেল'। কিন্তু রচনাভঙ্গির কথা ছাড়িয়া দিলেও ইঁহাদের রচনায় —নিরুপমার রচনা বলিতে এখানে 'দিদি'র কথাই ধরিতে হইবে—পার্থক্যের মধ্যে

পরমাশ্চর্য ঐক্য রহিয়াছে। নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রের প্রথম দিকের রচনা খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়িয়াছেন। 'বড়দিদি'র আগের নাম যে 'শিশু' ছিল ইহা তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন এবং উমার মধ্য দিয়া শিশুর মধ্যে যৌবনোদ্গমের করুণ ছবি আঁকিয়াছেন। তিনি 'দিদি' লিখিতে আরম্ভ করেন ভাগলপুর ছাড়ার পর ১৩১১ বঙ্গাব্দে। কিছুদিন আগেই সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে 'মন্দির' গল্পটি যখন প্রকাশিত হয় তখন গল্পটি পড়িয়াই তিনি বুঝিতে পারেন ইহা কাহার রচনা। 'মন্দির' গল্পের অর্পণা ও অমরের বিবাহের পর লেখক মন্তব্য করিয়াছেন, 'প্রথম হইতেই স্বামী ও স্ত্রী দুইজনেই পরস্পরের কাছে কোন দুর্বোধ্য অপরাধে অপরাধী হইয়া রহিল, এবং তাহারই ক্ষুব্ধ বেদনা কূলপ্লাবিনী উচ্ছ্বসিত তটিনীর ন্যায় একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নির্মাণ করিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল।' ইহাই শরৎ-সাহিত্যের প্রধান সূত্র এবং 'দিদি'র একমাত্র সূত্র; ইহার জটিলতা ও বৈচিত্র্যই নিরুপমা দেবীর সীমিত কাহিনীর প্রতি অধ্যায়কে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করিয়াছে। নিরুপমা দেবীর একটি উপন্যাস এবং বহু কবিতা পড়িয়া শরৎচন্দ্র মুগ্ধ হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার প্রতিভার সংকীর্ণতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ঐ একটি ভাব আর একটি কথা ছাড়া বুড়ি যদি আর পাঁচ রকম ভেবে লেখে তো লেখার আরও উন্নতি হইবে।' বর্তমান প্রসঙ্গে নিরুপমা দেবীর রচনার দীর্ঘতর আলোচনা সুসমঞ্জস হইবে না। শুধু একটি কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। নিরুপমা তাঁহার বিশ্লেষণে প্রচলিত ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার রচনায় সেই ব্যাপ্তি বা বৈচিত্র্য নাই যাহা শরৎচন্দ্রের পরিকল্পনা ও ভাষাকে ঐশ্বর্য দান করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার পরিচ্ছিন্ন গণ্ডির মধ্যে তাঁহার কলাকুশলতা অনতিক্রম্য।

একটু অনুধাবন করিলেই ইহাও দেখা যাইবে, তাঁহার আর্ট সীমিত গণ্ডিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রধাবিত হইতে চাহিয়াছে এবং এই বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন না এমনও মনে হয় না। সুরমা সধবা, অপর পুরুষের কথা কখনও মনে স্থান দেয় নাই, কিন্তু তবু নিজের জীবনকে 'বিচিত্র বৈধব্যের বিড়ম্বনা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। সে তো বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট জয়ন্তী-শিষ্যা শ্রীর মত সন্ন্যাসিনী নহে; আত্মাভিমান, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর স্নেহ, সাংসারিক কর্তৃত্ব ও কর্তব্য প্রভৃতির দ্বারা সে তাহার বঞ্চিত জীবনের শূন্যতাকে ভরিয়া তুলিতে পারে নাই। কালিদাসের ধারিণী ঔশীনরী, বসুমতী, হংসপাদিকা প্রভৃতির মধ্যে যে বিক্ষোভ ক্ষণেকের জন্য উচ্ছ্বসিত হইয়াছে তাহা তাহার মধ্যে

অতুলনীয় অভিব্যক্তি পাইয়াছে। শরৎচন্দ্রের ভাষা একটু বদলাইয়া বলিতে পারি, দুর্বশ হৃদয়াবেগ এবং প্রবুদ্ধ কর্তব্যবোধের মধ্যে নিরুপমা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়া পুনর্মিলনের মধ্য দিয়া উপন্যাসের যে পরিসমাপ্তি করিয়াছেন তাহার মধ্যে অন্তর্বিরোধ না থাকিলেও তাহা গ্রন্থের মৌলিক ট্র্যাজেডিকে কিছুমাত্র লঘু করিতে পারে নাই। ইহা প্রচলিত ধর্মের সঙ্গে আপোসের ব্যর্থ চেষ্টা বলিয়া মনে হয়, অন্ততঃ উপন্যাসের মধ্যে যাহা স্মরণীয় তাহা স্বামী-স্ত্রীর ব্যবধানের করুণ ট্র্যাজেডি যাহা পুনর্মিলনের গোঁজামিলের মধ্য দিয়াও প্রাণশক্তির অপচয়েরই আভাস দেয়। শুধু তাই নয়, ধর্মের প্রতি অবিচল আনুগত্যের ফলে সুরমা আরও দুইটি বিচিত্র বৈধব্যের সৃষ্টি করিয়াছে—একটি বিধবা উমার আর একটি সধবা মন্দার। সে জোর করিয়া মন্দার সঙ্গে প্রকাশের বিবাহ দিয়াছে, কিন্তু নিজে সে বিবাহ হইতে পলায়ন করিয়াছে। 'জজে ফাঁসির হুকুম দেয় সত্য, দেখিতে পারে কয় জনে?' সে উমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছে এবং উমা কাশীতে পাকাপাকি ভাবে বসবাস করিতে চাহিলেও সে ইহাতে রাজি হয় নাই, কারণ সে জানে এই সহজ সমাধান উমার সমস্যা স্পর্শ করিতেও পারিবে না। 'যে বিহঙ্গ লোকালয় দেখে নাই, তাহাকে পিঞ্জরে পুষিলে তাহার যে অবস্থা হয় তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন।' সুরমা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে, বালবিধবা উমার সেই অবস্থা হইয়াছে। প্রকাশের সংস্পর্শে আসিয়া উমা সহসামুক্ত পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের দশা প্রাপ্ত হইয়া স্তম্ভিত হইয়াছে এবং সুরমা পলায়নের পথে নিষ্কৃতির সন্ধান খুঁজিয়াছে।

আর একটি সাদৃশ্য ও বৈষম্যও অনুধাবনযোগ্য। 'কাশীনাথ' গ্রন্থে যে সকল গল্প মুদ্রিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই ভাগলপুর ত্যাগ করার আগে রচিত হইয়াছিল এবং নিরুপমা দেবী তাহাদের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। এই সকল গল্পের মধ্যে একটি 'আলো ও ছায়া'। এই গল্পের নায়িকার নামও সুরমা। সে বিধবা হইলেও যজ্ঞদত্তের প্রতি অনুরাগিণী এবং সংসারের কর্ত্রী। তাহাদের অনুরাগ পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিবে না বলিয়া সে প্রতুলকুমারীর সঙ্গে যজ্ঞদত্তের বিবাহ দিল। কিন্তু সেই বিবাহও ব্যর্থ হইল। এই কাহিনী অপরিণত রচনা; প্রতুলকুমারীর জরবিকার এবং মৃত্যুর দ্বারা চমৎকার উৎপাদন করিয়া গ্রন্থকার ছোট গল্পের উপসংহার করিয়াছেন। দীর্ঘ উপন্যাসে ভিন্ন পরিবেশে প্রকাশ, উমা ও মন্দার অনুপ্রবেশ ঘটাইয়া নিরুপমা দেবী যে জটিলতা ও সূক্ষ্ম শিল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন মনে হয় তাহার প্রেরণা আসিয়াছে এই ছোট গল্প হইতেই।

এই সকল পরস্পরসম্পৃক্ত কাহিনী ও উপকাহিনী পড়িলেই সেই সব আপাত-নিস্তরঙ্গ স্রোতস্বিনীর কথা মনে হয় যাহাদের তলদেশ ভয়াবহ আবর্তে বিক্ষুব্ধ। ইহাদের মধ্য দিয়া প্রীতিহীন সমাজ, ক্ষমাহীন ধর্ম ও বিচারহীন বিশ্ববিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ধ্বনিত হইয়াছে। এইখানেই শরৎপ্রতিভার প্রভাব দেদীপ্যমান; এমন কি শরৎচন্দ্র পরবর্তীকালে যে উপন্যাস লিখিয়াছেন, জানিয়া বা না জানিয়া তিনি নিরুপমার রচনার পরিস্থিতি ও ভাবকে অপরূপ ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন অতুলের প্রতি স্নেহে সুরমার মন ভরে নাই, তেমনি বঙ্কুর মা হইয়াই রাজলক্ষ্মী তৃপ্ত হইতে পারে নাই। শ্রীকান্ত ইহা অনুভব করিয়া নিজের কাছেই প্রশ্ন তুলিয়াছে, 'তাহার পরিণত যৌবনের সুগভীর তলদেশ হইতে যে মাতৃত্ব সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে, সদ্যনিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণের মত তাহার বিরাট ক্ষুধার আহার মিলিবে কোথায়?' সুরমা কাশীতে বিশ্বনাথকে পূজা করিতে যাইয়া ঠিক সেই সময় অমরকে দেখিতে পাইল; অমনি তাহার 'আত্মসমর্পণকারী ভক্তিব্যাকুল হৃদয় সহসা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। যেন তাহা যথাস্থানে নিবেদিত হইতেছিল না, তাই বিশ্বনাথ তাহার উদ্যত অর্ঘ্য ফিরাইয়া দিলেন।' তেমনি রাজলক্ষ্মীও শ্রীকান্তকে বলিয়াছে, 'তীর্থযাত্রা করেছিলাম, কিন্তু ঠাকুর দেখতে পাইনি। তার বদলে তোমার লক্ষ্যহারা বিরস মূর্তিই দিনরাত্রি চোখে পড়েচে।' কবি ভবভূতি 'সমানধর্মা' সাহিত্যিকের জন্য বিপুলা পৃথ্বী ও নিরবধি কালের উপর আস্থা রাখিয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে শরৎচন্দ্র এই জাতীয় সাহিত্যিককে হাতের কাছেই শিষ্যারূপে পাইয়াছিলেন। অথবা শেক্সপীয়রের ভাষায় বলা যাইতে পারে এই জাতীয় মিলন 'marriage of true minds.'

দ্বিতীয় পর্ব

ব্রহ্মদেশ

১

১৯০২ সালে পিতার মৃত্যুর পর ছোট বোন ও ভাইদের কোনরকম ব্যবস্থা করিয়া শরৎচন্দ্র কলিকাতায় আসেন এবং সেখানে তাঁহার মাতুল, হাইকোর্টের উকিল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে মাস কয়েক থাকিয়া সামান্য ত্রিশ টাকা বেতনে হিন্দি পেপারবুকের ইংরেজি অনুবাদের কাজ করিয়াছিলেন। তারপর ১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসে ব্রহ্মদেশে যাত্রা করিলেন। এইখান হইতে তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ। কলিকাতা ত্যাগের কথা পূর্বেই বলা হইলেও ইহার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন। শরৎচন্দ্র ভবঘুরে প্রবৃত্তির লোক হইলেও তাঁহার পারিবারিক বন্ধনও ছিল খুব দৃঢ়, কিন্তু তখন কর্তব্যবোধের বোঝা প্রায় আয়ত্তের অতীত। কলিকাতায় রোজগারের সম্ভাবনা কম এবং এই সময় লালমোহন গাঙ্গুলির ভগিনীপতি রেঙ্গুনের উকিল অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় আসিয়া সহজে সচ্ছলতা লাভের সন্ধান দিলেন এবং আশ্রয়ের ভরসা দিলেন। তিনি এই প্রস্তাব সহজেই গ্রহণ করিবেন ইহা স্বাভাবিক। ইহা ছাড়া আর একটি কারণও ছিল বলিয়া মনে হয়। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন—এবং তাঁহার কথা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় না—লালমোহনের বাড়িতে শরৎচন্দ্র সুখে বা স্বস্তিতে ছিলেন না। লালমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের অন্যতম সুহৃদ ও সাহিত্যিক শিষ্য ছিলেন। মনে হয় এই সময়টায় ইঁহাদের ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে খানিকটা ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। শরৎচন্দ্র তখনও কলিকাতায় আসেন নাই; উপেন্দ্রনাথ আসিয়াছেন। সৌরীনবাবু শরৎচন্দ্রের লেখার কথা উত্থাপন করিলে উপেনবাবু নাকি বলেন, 'আমি লেখা পড়িনি। তাছাড়া শরৎ বয়ে গিয়েছে—আমাদের বাড়ির সঙ্গে তেমন যোগাযোগ আর নেই তার।' ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যদিও উপেনবাবু বলিয়াছেন যে, তিনিই শরৎচন্দ্রকে চল্লিশ টাকা ধার দিয়া জাহাজে তুলিয়া দিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্রের অন্যতম মাতুল সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই উভয় দাবী অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, শরৎচন্দ্র অন্যতম খুল্ল মাতামহ অমরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে লইয়া জাহাজঘাটে গিয়াছিলেন। একথা তিনি বর্মা হইতে তাঁহাদিগকে পরে জানাইয়াছিলেন।

ইহাও স্মরণ করা যাইতে পারে যে বর্মা যাওয়ার পূর্বে কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য তিনি গল্প লিখিয়াছিলেন সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে এবং সুরেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের অনুজ গিরীন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া তিনি গল্পটি যথাস্থানে জমা দেন। তাঁহার রচনার খাতাগুলিও তিনি সুরেন্দ্রনাথের কাছেই রাখিয়া যান। অথচ তিনি তখন নিজে থাকিতেন উপেন্দ্রনাথদের বাড়িতে উপেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর লালমোহনের আশ্রয়ে। এই সকল ছোটখাটো তথ্য একত্র করিলে মনে হয় এই সময় উপেন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের খানিকটা মানসিক দূরত্ব আসিয়া গিয়াছিল এবং এই সময় উপেন্দ্রনাথ যদি শরৎচন্দ্রের 'বয়ে' যাওয়ার অভিযোগ করিয়া থাকেন, তবে শরৎচন্দ্রের ভাষা উদ্ধার করিয়াই বলিতে পারি ইহা আত্মীয়স্বজনের অতিরঞ্জন ছাড়া আর কিছু নয়।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে পহুঁছিয়া কিছু দিন অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে থাকেন এবং বর্মি ভাষা শিখিয়া উকিল হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। অঘোরনাথ তাঁহার জন্য রেলওয়ে অডিট অফিসে একটি চাকুরিও ঠিক করিয়া দেন। মনে হইল এতদিনে তিনি একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাইলেন এবং সাংসারিক দিক দিয়া উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবেন। কিন্তু ঠিক দুই বছর পরে অঘোরনাথের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। এই সময়ই তাঁহার রেল অফিসের অস্থায়ী চাকুরিরও অবসান হওয়ায় তিনি আবার বেকার ও ভবঘুরে হইয়া পড়িলেন। কিছুকাল তাঁহার কোন নির্দিষ্ট আস্তানা ছিল না, কোন নিয়মিত আয়ও ছিল না। এই সময় তিনি পেগুতেও কিছুদিন ছিলেন। পরে বছর খানেকের বেশি বেকার থাকিয়া ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে উচ্চপদস্থ কর্মচারী মণীন্দ্রকুমার মিত্রের আনুকূল্যে একজামিনার অব পাব্লিক একাউণ্টস্ অফিসে কেরাণীর চাকুরি পান। কিছুকাল পরে এই অফিস একাউণ্টেণ্ট জেনারেল অফিসের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯১৬ সালে পাকাপাকিভাবে রেঙ্গুন ত্যাগ করা পর্যন্ত তিনি ওখানেই চাকুরি করিতেন। চাকুরি ছাড়ার সময় তাঁহার বেতনাদি সর্বসাকুল্যে একশত টাকা ছিল। এখন একশত টাকার ক্রয়মূল্য সামান্যই, তখনও ঐ টাকায় প্রাচুর্যের আস্বাদ মিলিত না। শরৎচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন, কোনক্রমে কুলাইয়া যাইত। তবু বেপরোয়া বনের বিহঙ্গ এবার পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছিলেন। যখন তিনি বর্মা ত্যাগ করেন, তখন ওখানে তাঁহার শরীর ভাল যাইতেছিল না। এদিকে বঙ্গদেশে তাঁহার রচনা প্রকাশিত হওয়ায়

পর তাঁহার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং আয়ের পথও খুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু একশত টাকার নিশ্চিন্ত আয় ছাড়িয়া আসিতে তিনি খুব ইতস্তত করিয়াছিলেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কোম্পানী তাঁহাকে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার লেখক ও গ্রন্থকার হিসাবে মাসিক একশত টাকার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তিনি চাকুরি ছাড়ার ঝুঁকি লইলেন। এই সময় উপরওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া (হাতাহাতি ?) না হইলে তিনি হয়ত আরও একটু ইতস্ততঃ করিতেন।

শরৎচন্দ্রের বর্মা প্রবাসের প্রথম দশ বৎসর সাহিত্যসৃষ্টি প্রায় বন্ধ ছিল। ইহা খুব বিস্ময়ের বিষয় মনে হয়। বার্নার্ড শ'য়ের কথা উদ্ধার করিয়া বলা যাইতে পারে, হাঁস যেন সাঁতার দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এখানে তাঁহার সৃজনী প্রতিভা অন্য একটা পথে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। তিনি পূর্বে সঙ্গীতে, অভিনয়ে, দুঃসাহসিক অভিযানে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বর্মায় তিনি চিত্রাঙ্কনেও নৈপুণ্য লাভ করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এক রাত্রিতে প্রচণ্ড গৃহদাহে তাঁহার সব ছবিই পুড়িয়া যায়। তবে অলক্ষিতে এই সব বিদ্যায় পারদর্শিতা পরবর্তী কালের রচনায় প্রতিফলিত হয়। পিয়ারী বাইজী শ্রীকান্তকে প্রথমে মুগ্ধ করিয়াছিল তাহার অসামান্য সঙ্গীত-নৈপুণ্যের দ্বারা এবং তাহার যে বর্ণনা প্রথম পর্বে পাই তাহা সঙ্গীতরসিক গ্রন্থকারেরই উপযুক্ত। চিত্রবিদ্যার একটা লক্ষণ এই যে, তাহা বিষয়বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়া দেয়। শরৎচন্দ্রের রচনার ইহাই প্রধান গুণ; তিনি নিজেই দিলীপকুমার রায়কে লিখিয়াছিলেন, 'দেখোনি বাঙ্‌লা দেশে আমার সব বইগুলোর নায়ক-নায়িকাকেই ভাবে এই বুঝি গ্রন্থকারের নিজের জীবন; নিজের কথা।' তিনি এখানে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিভূমির কথাই বলিতেছেন, কিন্তু তাঁহার লেখা যে এত প্রত্যক্ষতা লাভ করিয়াছে ইহার একটা বড় কারণ তাঁহার বর্ণনার সজীবতা এবং সংযত পুঙ্খানুপুঙ্খতা। হয়ত অংশতঃ ইহা অঙ্কনবিদ্যার সঙ্গে পরিচয়ের ফল

বর্মায় তিনি থাকিতেন গরীব মিস্ত্রীপল্লীতে এবং সেই সমাজে নরনারীর মেলামেশা অনেকটা স্বাধীন অর্থাৎ সামাজিক বিধিনিষেধের বন্ধন সেইখানে অনেকটা শিথিল। শরৎচন্দ্রের রচনায় বিশেষ করিয়া 'চরিত্রহীন' ও 'শ্রীকান্ত'র মধ্যে এই তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর নরনারীর অপেক্ষাকৃত বন্ধনহীন সম্পর্কের খুব সরস বর্ণনা আছে। 'পথের দাবী'তেও নরনারীর মিলন অনেকটা বাধাহীন ও স্বচ্ছন্দ। নায়ক সব্যসাচী নিজেই বলিয়াছেন যে, তিনি ব্রহ্মদেশেই যে বিপ্লবের

ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছেন তাহার অন্যতম কারণ যে এখানে স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন। রাস্কিন শেক্সপীয়রের নাটক সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, সেখানে নায়িকা (heroines) আছে কিন্তু নায়ক (heroes) নাই। বলা বাহুল্য, এই মন্তব্য শেক্সপীয়রের নাটক সম্পর্কে অতিশয়োক্তি। কিন্তু ইহা শরৎচন্দ্রের উপন্যাস সম্পর্কে প্রযোজ্য, কারণ তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসে নায়িকারাই মুখ্য এবং এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই পক্ষপাতিত্ব অংশতঃ স্বাভাবিক এবং অংশতঃ ব্রহ্মদেশের অপেক্ষাকৃত অবাধ জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয়।

ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র প্রথম দশ বৎসর অবসর সময় কাটাইয়াছেন নিবিষ্ট মনে অধ্যয়ন করিয়া। ওখানকার বার্নার্ড ফ্রি লাইব্রেরীতে তিনি বহু বিষয়ে বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন; যে সমস্ত গ্রন্থ তিনি খুব অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন তাহার তালিকা বোধ হয় এখনও রক্ষিত আছে এবং তাহা হইতে দেখা যায় যে, তিনি বিজ্ঞান, দর্শন বিশেষ করিয়া মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন। ভাগলপুর শহরে ভট্টদের বাড়িতে বাহিরের ঘরে একখানা চেয়ার প্রায় রিজার্ভ করা থাকিত—সেখানে তিনি অনর্গল লিখিতেন বা পড়িতেন। বর্মাতে প্রথম দশ বৎসর লিখিয়াছেন কম, পড়িয়াছেন বেশি। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, তিনি ভুলিয়াই গিয়াছিলেন যে একসময়ে তিনি একজন লেখক ছিলেন। কিন্তু ইহাও একেবারে ঠিক নয়। ব্রহ্মদেশে ১৯১৩ সালে 'যমুনা'র প্রয়োজনে লেখক-জীবন পুনরারম্ভের পূর্বে তিনি দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন—(১) 'নারীর ইতিহাস' ও (২) 'চরিত্রহীন' উপন্যাস। তিনি বিহারে থাকিতেই 'চরিত্রহীন' আরম্ভ করিয়াছিলেন; যখন তিনি সন্ন্যাসীর বেশে মজঃফরপুর যান, তখন তাঁহার ঝোলার মধ্যে এই উপন্যাসের প্রথমাংশ ছিল। পরে তিনি ব্রহ্মদেশে এই সময়ে (১৯০৩-১৯১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) তাহা বোধ হয় শেষ করেন। কিন্তু ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কাঠের বাড়ি পুড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার আঁকা সমস্ত ছবি এবং এই দুইখানি বইয়ের পাণ্ডুলিপি নষ্ট হইয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের জীবনের একটা দিক সম্পর্কে বলার কিছু প্রয়োজন আছে। তিনি শুধু 'চরিত্রহীন' সতীশ বা দেবদাসকে কেন্দ্র বা নায়ক করিয়া উপন্যাসই রচনা করেন নাই, নিজেও চরিত্রহীন ছিলেন এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত ছিল। এই ব্রহ্মদেশে থাকার সময় তিনি 'উচ্ছৃঙ্খল' জীবন যাপন করিতেন এই কথাই বিশেষ করিয়া বলা হইত। তিনি নিজেও এই অপপ্রচারের প্রতিবাদ

করেন নাই, বরং অনেক সময় প্রশ্রয় দিয়াছেন। একবার প্রতিবাদের কথা উত্থাপিত হইলে, তিনি কৌতুক ও উষ্মামিশ্রিত স্বরে বলিয়াছিলেন, কুৎসা যাহারা রটনা করে, প্রতিবাদ করার দায়ও তাহাদের। তিনি নিজে কেন উহার মধ্যে জড়াইবেন; তারপর ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি উপন্যাসে যাহাই লিখুন, নিজের সম্বন্ধে বাড়াইয়া বলিতে ভালবাসিতেন। যেমন দিলীপকুমার রায়কে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি চার চারবার সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। কিন্তু দেখা যায় যে তিনি ১৯০০-১৯০১ সালে একবার সন্ন্যাসীর বেশে গৃহত্যাগ করেন এবং বছরখানেকের মধ্যেই তিনি পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ভাগলপুরেই ফিরিয়া আসেন এবং তাহার কয়েক মাস পরেই কলিকাতা হইতে ব্রহ্মদেশে যান এবং তথায় চাকুরির উমেদার ও সাধারণ গৃহস্থের মতই জীবন যাপন করেন। অন্ততঃ সন্ন্যাসী হওয়ার কোন অবকাশ ছিল বা সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন এমন মনে হয় না।

নিজের চরিত্র সম্পর্কেও তিনি নিজেই কুৎসা রটনা করিতে আনন্দ পাইতেন। তিনি ব্রহ্মদেশে যাওয়ার পূর্বেই মদ্যপান করিতেন এইরূপ মনে করার কারণ আছে। কারণ ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি বিভূতিভূষণ ভট্টকে লিখিয়াছিলেন, মাস ছয়েক মদ ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং সুস্থ বোধ করিতেছেন। মনে হয় বহু দিন পর তিনি এই চিঠি লিখিতেছেন এবং ইহাই ব্রহ্মদেশ হইতে বিভূতিবাবুকে লেখা প্রথম চিঠি। সুতরাং মনে করিতে হইবে যে, তাঁহার পানাসক্তি বিভূতিভূষণের অজ্ঞাত ছিল না। বিভূতিভূষণ শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলেন, সেই প্রবন্ধে তিনি একাধিকবার বলিয়াছেন যে, শরীরের উপর অত্যাচার না করিলে তিনি আরও দীর্ঘায়ু হইতেন। ইহার লক্ষ্য মদ্যপানই বলিয়া মনে হয় আর 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে শিবনাথের জবানীতে শরৎচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন, 'যে মদ খায় সেই কখনো না কখনো মাতাল হয়। যে হয় না সে হয় মিছে কথা বলে, না হয় সে মদের বদলে জল খায়।' ইহার মধ্যে গ্রন্থকারের নিজের অভিজ্ঞতার প্রতিধ্বনি আছে বলিয়া মনে হয়। কনিষ্ঠ বিভূতিভূষণ সম্মানিত সাহিত্যগুরুকে প্রমত্ত অবস্থায় দেখিয়া থাকিবেন; তাই তিনি দুঃখের সহিত শরীরের উপর অত্যাচারের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এই বিষয়েও শরৎচন্দ্র অতিরঞ্জনপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দিয়াছেন। বন্ধুবর প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে তিনি একাধিকবার তাঁহার 'দেবদাস' উপন্যাসের বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন যে উহা 'বোতল বোতল' মদ খাইয়া লেখা। উহা ভাল

নয়, প্রকাশের অযোগ্য। কিন্তু যে সময় তিনি এই সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন তখন তিনি দারিদ্র্যের শেষ স্তরে নামিয়া গিয়াছেন, টাকার অভাবে পরীক্ষা দিতে পারেন নাই, টাকার জন্য কলেজে পুনরায় ভর্তি হইতে পারেন নাই এবং ভগবানের কাছে জ্বরের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন যে তাহা হইলে অনাহারের চিন্তা হইতে মুক্তি পাইবেন। এ হেন লোক বোতল বোতল মদ কিনিবার পয়সা পাইবেন কোথায়? তাঁহার এই সময়কার গ্রন্থগুলির বেশির ভাগ লিখিত হইয়াছিল নিঃসম্পর্কিত, 'কালচার্ড', অভিজাত ভট্টদের বাড়িতে যেখানে তাঁহার জন্য একখানা চেয়ার 'রিজার্ভ' করা থাকিত এবং সেই চেয়ারে বসিয়াই তিনি 'বোতল বোতল' মদ খাইয়া বই লিখিতেন ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য?

তাঁহার অন্য যে অপবাদ প্রচার করা হইয়াছিল তাহার কোন ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ প্রমাণাভাবাৎ। তাঁহার স্নেহভাজন হরিদাস শাস্ত্রীকে তিনি বলিয়াছিলেন শ্রীরামপুর হইতে একটি মেয়ে আসিয়া শরৎচন্দ্রকে বলিয়াছিল, আত্মীয় বন্ধুরা তাহাকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছিল, "তুমি যাবে শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা করতে—তোমার সাহস তো কম নয়,' তা আপনি কি এমন যে কোন যুবতী মেয়ে আপনার কাছে আসতে পারে না?' শুনিয়া শরৎবাবু খুব হাসিয়াছিলেন। এই সব অপবাদের একটি ভিত্তি শরৎচন্দ্রের নিজের জীবনযাত্রার প্রণালী। তিনি যৌবনে ছিলেন বেপরোয়া, ভবঘুরে শ্রেণীর লোক যাহারা প্রচলিত বাঁধাধরা সোজা পথে চলে না এবং সর্বপ্রকার গোঁড়ামির বিরোধী। পরবর্তী কালে, যখন তিনি সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ, সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত তখনও দেখি তিনি সবচেয়ে বেশী উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন সর্বজন-পূজ্য, নিয়মতান্ত্রিক সমাজের শিরোমণি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। প্রতিভার স্বাভাবিক প্রেরণায়ই তিনি কুলত্যাগিনী, কলঙ্কভাগিনী মহিলাদের সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হয়েন। যে কোন যুবকের পক্ষে এই জাতীয় কৌতূহল খাপছাড়া এবং নানা দিক দিয়া আশঙ্কাজনক। সকল খাপছাড়া লোকই প্রতিভাবান হয় না, কিন্তু অনেক প্রতিভাবান লোকই খাপছাড়া। শরৎচন্দ্র তো বটেই। তিনি অল্প বয়সেই কুলত্যাগিনীদের কাহিনী লইয়া গবেষণা করিতে আরম্ভ করেন এবং ইহাদের ইতিহাস সংগ্রহ করেন। তিনি বলিয়াছেন ৬০০-৭০০ কুলত্যাগিনীদের ইতিবৃত্ত তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়া 'নারীর ইতিহাস' বলিয়া একখানা বইও লিখিয়াছিলেন। তিনি

ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, ইহাদের মধ্যে অনেকেই সধবা, এই কারণেই তাঁহার উপন্যাসে সধবা কুলত্যাগিনী বা প্রেমময়ী বারবনিতার সাক্ষাৎ পাই। নিছক সাহিত্যবিচার বর্তমান অধ্যায়ের বিষয় নয়। তবে ইহা বলিতে পারি, অনেকের মতে, বোধ হয় শরৎচন্দ্রের নিজের মতেও, শিল্পকলার দিক দিয়া বিচার করিলে, 'গৃহদাহ' শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়িকা সধবা, কিন্তু সে সতীত্ব বিসর্জন দিয়াছিল। কুলত্যাগিনীদের ইতিহাস জানিতে হইলে বন্ধুভাবে ইহাদের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া তথ্য জানিতে হইবে এবং শরৎচন্দ্রও তাহাই করিয়াছিলেন। তারপর বর্মায় তিনি থাকিতেন মিস্ত্রীপল্লীতে যেখানে অধিকাংশ গৃহী ও গৃহিণী বিবাহিত না হইয়াই নন্দ মিস্ত্রী ও টগর বোষ্টমের মত একসঙ্গে ঘর করে। সুতরাং তাঁহার সম্পর্কে যে কুৎসা রটিবে ইহা স্বাভাবিক। তিনি দুঃসাহসী বেপরোয়া, আত্মসম্ভ্রমে বিশ্বাসী লোক ছিলেন বলিয়াই এইরূপ গবেষণা করিতে পারিয়াছিলেন এবং দেশবাসীকে পিয়ারী বাইজী, চন্দ্রমুখী, বিজলী, বিরাজ বৌ, সৌদামিনী, অচলা, সবিতা প্রভৃতি অসংখ্য চরিত্র উপহার দিয়া তাহাদের মনের আকাশকে প্রশস্ততা দান করিয়া গিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র নিষ্পাপ ছিলেন বলিয়াই ইহা পারিয়াছিলেন এবং মিথ্যা কুৎসাকে অগ্রাহ্য করিবার শক্তি ও সাহসও তাঁহার ছিল। আত্মীয়স্বজনরাই এই জাতীয় কুৎসা রটনা করেন এবং সেইজন্য তিনি তাঁহাদের মনোযোগ এড়াইতে চাহিতেন। তিনি শুধু তাঁহাদেরই সম্মতি, প্রীতি ও আস্থা চাহিয়াছেন যাঁহা-দিগকে তিনি আপনার জন মনে করিতেন—যেমন প্রমথনাথ ভট্টাচার্য, বিভূতি-ভূষণ ভট্ট ও নিরুপমা দেবী। প্রমথনাথ অবিশ্বাসের দিনেও তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন এবং তিনি মনে করেন পুঁটু ও বুড়ি তাঁহার প্রতি বিমুখ হইবেন না। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, নিজের মৃত্যুর প্রাক্কালে শরৎচন্দ্রের মহানুভবতা দেখিয়া প্রমথনাথ তাঁহাকে দেবতার সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন। বিভূতিভূষণ একবার সামান্য কারণে শরৎচন্দ্রের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি শরীরের উপর অত্যাচার না করিলে আরও দীর্ঘায়ু হইতেন এমন কথাও বলিয়াছেন, কিন্তু মোটের উপর তিনিও তাঁহার উপর খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। নিরুপমার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশায় তাঁহারা তৎপ্রতি যথোচিত কর্তব্য পালন করেন নাই এইজন্য নিরুপমা দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং শরৎচন্দ্র উপযাচক হইয়া তাঁহার ভাইকে নিজের বাড়িতে রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন ও তাঁহারা তাঁহার সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে

পারেন নাই বলিয়া লজ্জা বোধ করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে শরৎচন্দ্রের চরিত্র কলঙ্কিত হইলে ইঁহাদের মন্তব্যে কোথাও না কোথাও জুগুপ্সা বা বিতৃষ্ণা উঁকিঝুঁকি দিত।

অবশ্য বিভূতিভূষণ ভট্টের কাছে ১৯০৮ সালে শরৎচন্দ্র যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, সেই চিঠিতে শরৎচন্দ্র নিজেকে হীন বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন—'চির-প্রবাসী, দুঃখী, কুৎসিত-আচারী আমি কাহারও সম্মুখে বাহির হইতে পারিব না,...এত পঙ্কিল জীবনে সাধুত্বের ভান খাটিবে না...' ইত্যাদি। আবার ইহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সমস্তটা কি তাঁহার একারই দোষ? এই অভিযোগও করিয়াছেন যে তাঁহারা যে তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছেন তাহার মধ্যে খানিকটা অবিচার আছে, সেই অপরাধের একমাত্র দায়িত্ব তাঁহার নিজের নয়। ইহা হইতে এবং প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে অবিশ্বাসের দিনের কথা উল্লেখ করিয়া যে চিঠি দিয়াছিলেন তাহা হইতে মনে হয় এমন কোন একটা লজ্জাকর ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহার জন্য তাঁহাকে কলঙ্কের বোঝা বহন করিতে হইয়াছিল, অথচ তাহার দায়িত্ব তাঁহার একার নয়। অনুরূপা দেবীও তাঁহার আস্ফালনে এইরূপ কোন ব্যাপারের ইঙ্গিত করিয়া থাকিবেন। আমাদের হাতের কাছে যে সমস্ত বিশ্বাসযোগ্য তথ্য আছে তাহা হইতে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা যায় না। ইহাও মনে করা যায় যে, সে ব্যাপারের সঙ্গে ভালবাসা জড়িত ছিল, পাপ জড়িত ছিল এবং সেখানেও তাঁহার আত্মসম্ভ্রম মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়াছে। দিলীপকুমার রায়কে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'জীবনে যে ভালবাসলে না, কলঙ্ক কিনলে না, দুঃখের ভার বইলে না, সত্যিকার অনুভূতির অভিজ্ঞতা আহরণ করলে না, তার পরের-মুখে-ঝাল-খাওয়া কল্পনা সত্যিকার সাহিত্য কত দিন জোগাবে।' তিনি লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে নিজের ইতিবৃত্ত বলিতে গিয়া জানাইয়াছিলেন যে তাঁহার পিতৃবিয়োগের পর কোন একজনের পাপের টাকা গ্রহণ করিলে তাঁহার সমস্ত সাংসারিক দুঃখ ঘুচিয়া যাইত। কিন্তু আত্মসম্মানে আঘাত লাগিবে বলিয়া তিনি তাহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এইখানেই আমাদের কৌতূহল থামিয়া যাইতে বাধ্য, কারণ আর কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র তিনি নিজে দেন নাই, অপরেও দিতে পারেন নাই।

ইহাও মনে রাখিতে হইবে শরৎচন্দ্রের আত্মসম্মানবোধ এত বেশি ছিল যে অর্থের বিনিময়ে উপন্যাস রচনাকে পর্যন্ত তিনি আত্মবিক্রয় বলিয়া মনে করিতেন। ধনবান্ স্বত্বাধিকারী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা

বাহির করিতেছিলেন এবং ইহার জন্য প্রমথনাথ ভট্টাচার্য তাঁহার কাছে গল্প উপন্যাস চাহিয়াছিলেন ; তখন তিনি ঈষৎ ব্যঙ্গের স্বরে উত্তর দিয়াছিলেন, উক্ত পত্রিকার লেখার অভাব হইবে না, কারণ তাঁহারা লেখার বিনিময়ে টাকা দিবেন। ইহার কিছুদিন পর তিনি অর্থাভাবে পড়িয়া মাত্র দুইশত টাকার বিনিময়ে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কে 'বিন্দুর ছেলে' ও 'বিরাজ বৌ' ছাপিতে অনুমতি দেন। ইহা কপিরাইট বা স্বত্ববিক্রয় কিনা সেই সম্পর্কে বিশেষ সন্দেহ আছে। এইরূপ মনে করিবার কারণ আছে যে শুধু প্রথম সংস্করণের জন্যই তিনি এই সামান্য টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আইনের এই প্রশ্ন এই আলোচনায় অবান্তর। তবে ইহা সত্য যে এই বই বিক্রয় করিয়া প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স বহু অর্থ পাইয়াছিলেন এবং তাহার কোন অংশ শরৎচন্দ্র গ্রহণ করেন নাই। এইরূপ পরিণতিতে অন্য যে কোন লোকের মনে কখনও না কখনও ক্ষোভের সঞ্চার হইত। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মনে তাহার বাষ্পমাত্র উদিত হয় নাই। বরং হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁহার অসীম প্রীতি ছিল ; এমন কি যিনি ঐ প্রকাশক সংস্থার প্রধান সম্পদ্-স্বরূপ ছিলেন তিনি নিজেকে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের 'দায়' বলিয়া মনে করিতেন। ইহা শুধু তাঁহার উদারতাই প্রমাণ করে না, ভালবাসিবার ক্ষমতাও প্রমাণ করে। উদারতা একতরফা হইতে পারে, কিন্তু ভালবাসা এমন একটা প্রবৃত্তি যাহা শুধু নিজেকে বিলাইয়া দেয় না, অপরের নিকট হইতে প্রতিদান প্রত্যাশা করে। তিনি সেইরূপ প্রতিদান শিষ্যগোষ্ঠীর নিকটও প্রত্যাশা করিয়া থাকিবেন।

শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশে গিয়াছিলেন ১৯০৩ সালে এবং যতদূর মনে হয় চার পাঁচ বৎসর পর প্রথম কলিকাতায় আসেন ১৯০৭ সালের শেষ ভাগে ডিসেম্বর মাসে, রেঙ্গুনে ফিরিয়া যান মাস তিনেক পরে, এবং ওখানে পহুঁছিবার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই অর্থাৎ ২২. ২. ১৯০৮ তারিখে বিভূতিভূষণ ভট্টের কাছে এক সুদীর্ঘ চিঠি লিখেন। ইহা শরৎচন্দ্রের জীবনী ও চরিত্রের উপর আলোকসম্পাত করে আবার কুহেলিকারও সৃষ্টি করে। এই সময়ই 'ভারতী'তে 'বড়দিদি' প্রকাশিত হইতেছিল। তাহা লইয়া কলিকাতায় ও বঙ্গদেশে পাঠকসমাজে আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তিনি এই বিষয়ে নীরব। চার বৎসর পরে বর্মা হইতে দেশে আসিলেন, ওলাউঠায় ভুগিলেন, অস্ত্রোপচার করাইলেন, কিন্তু কোথায় উঠিলেন, কাহার সাহায্য লইলেন এই সব কথার কোন উল্লেখ নাই। একদিন একজন সঙ্গী লইয়া বিভূতিবাবুর বাড়ি পর্যন্ত গিয়াছিলেন কিন্তু লজ্জায়

দেখা করিলেন না। এই লজ্জার কারণ কি? এইরূপ মনে করা যাইতে পারে প্রায় পাঁচ বৎসর পর ইহাই বিভূতিবাবুর সঙ্গে তাঁহার প্রথম সংযোগ। কিন্তু ইতিমধ্যে যে ভাবেই হউক কলিকাতায় আসিয়া তিনি বিভূতিবাবুদের বাড়ির সংবাদাদি সংগ্রহ করিয়াছেন কারণ, ইন্দুভূষণ ভট্টের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু, দ্বিতীয়বার বিবাহাদির উল্লেখ আছে।

এই চিঠিতে আত্মসম্ভ্রম, আত্মবিশ্বাস, অনুশোচনা, অভিমান, কৌতুকবোধ প্রভৃতির অপূর্ব সম্মিলন হইয়াছে। এই চিঠি পড়িলে ও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, দারিদ্র্যনিপীড়িত ভবঘুরে শরৎচন্দ্র এমন কোন ব্যাপারে জড়িত হইয়াছিলেন, যে জন্য তিনি অপযশের ভাগী হইয়াছেন এবং আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক অনেকটা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাহা হয়ত প্রেমঘটিত ব্যাপারে, কারণ এই পত্রে ভালবাসার কথা আছে এবং ভালবাসিবার একটি মাত্র উপযুক্ত পাত্রের অভাবের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। অথচ ইহাও নিশ্চিত যে সেই ব্যাপারে তাঁহার প্রতি বন্ধুবান্ধবেরা অবিচার করিয়াছিলেন; সেইজন্য নিজের পাপ বা পঙ্কিল জীবনের অতিরঞ্জিত বিবরণ দিলেও চিঠিতে আপনার জনদের বিরুদ্ধে অভিমান ও অভিযোগও আছে। ইহাও মনে হয় যে, তাঁহার অপরাধ যদি কিছু থাকে তাহা সামান্যই এবং তিনি যেন ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে বাড়াইয়া লইয়া নিজের দোষ স্বীকার করিয়া বন্ধুদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতেছেন। তাহা না হইলে পুঁটু ও বুড়ির উপরে তাঁহার অবিচল আস্থা থাকিতে পারিত না, বালবিধবা বুড়ির উল্লেখও থাকিত না এবং বিভূতিবাবুর যুবতী নব-বিবাহিতা ভগিনীকে তাঁহার কাছে চিঠি লিখিতে বলিতেন না। নিজের নিষ্কলঙ্কতা সম্পর্কে একান্তভাবে নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন বলিয়াই তিনি এই ভাবে অভিমান, অভিযোগ ও অনুরোধ করিতে পারিয়াছিলেন এবং আত্মগ্লানির অতিরঞ্জিত চিত্র আঁকিয়াছিলেন। স্মরণ রাখিতে হইবে নিরুপমা দেবীও তাঁহাদের অবহেলার জন্য অক্ষমতা স্বীকার করিয়াই শরৎচন্দ্রের স্মৃতি-তর্পণে যোগদান করিয়াছিলেন।

এই সব ব্যাপারের পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্রে লিখিত শরৎচন্দ্রের তথাকথিত দাম্পত্যচর্চার কাহিনী সরস ব্যঙ্গ বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। তিনি যে সব কুৎসার বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন যেন তাহাকে আরও জমকাল করিবার জন্যই চণ্ডীদাসের সঙ্গে নিজেকে একাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার তথাকথিত প্রণয়িনীকে রজকিনী রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং একটি আধা ট্র্যাজেডি

ও কমেডি সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু অন্য সব যুক্তি অগ্রাহ্য করিলেও শুধু সময়ের গণনায়ই এই কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ হয়। শরৎচন্দ্র বর্মা যান ১৯০৩ সালে এবং ১৯০৫ সালের ৩০শে জানুয়ারি অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেই বাড়িতেই ছিলেন। এই সময় তাঁহার অস্থায়ী চাকুরিটিও চলিয়া যায় এবং তাঁহার কোন স্থায়ী বাসস্থানও ছিল না। তিনি কিছু দিন রেঙ্গুন ছাড়িয়া পেগুতেও ছিলেন। ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে তিনি অর্ধ-পাকা চাকুরি পাইয়া রেঙ্গুনে পাকাপাকি ভাবে বাস করিতে থাকেন এবং ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসেন। তবে কি ইহা মনে করিতে হইবে যে, তিনি চাকুরি পাওয়া মাত্র তথাকথিত দাম্পত্যজীবন আরম্ভ করিলেন এবং প্রণয়িনী অন্যের গলায় বরমাল্য দেওয়া মাত্র ছুটির দরখাস্ত দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ অস্থায়ী কর্মচারীর ছুটি মঞ্জুর হইল, সময়সাপেক্ষ প্যাসেজ বুকিং সমাধা করিয়া হংকং চলিয়া গিয়া বিরহজ্বালা প্রশমিত করিলেন এবং তৎপর হংকং হইতে কলিকাতা গিয়াছিলেন? ১৯০৬ সালের মে হইতে ১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারি—এই ১৮ মাসের মধ্যে ইহা কি সম্ভব? ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রেঙ্গুনে চাকুরি পাইয়া ইনি সদাশয় মণীন্দ্রকুমার মিত্র, যিনি তাঁহাকে চাকুরি দিয়াছিলেন, তাঁহার বাড়িতেই প্রথম কয়েক মাস ছিলেন। সেই সময়টা বাদ দিলে গণিতের হিসাবে আরও গোলযোগ বাধিয়া যায়। সুতরাং এই কাহিনী শুধু বন্ধু-বান্ধবদের উন্নাসিকতাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্যই কল্পিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

শরৎচন্দ্র একাধিকবার বলিয়াছেন যে, মানবিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক কল্পনার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তিনি বহু পতিতার সঙ্গে মিশিয়াছেন, তাহারা তাঁহাকে 'দাদাঠাকুর' 'বাবাঠাকুর' বলিয়া সম্মানিত করিত, কিন্তু তিনি তাহাদের কাহারও সঙ্গে কখনও অসংযত আচরণ করেন নাই। ১৯১২ সালে মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—ইনিই পূর্বে বলিয়াছিলেন শরৎ 'বয়ে গিয়েছে'—হাওড়ায় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইয়া দেখেন যে এক গণিকালয়ের উপরের তলার ঘরে বসিয়া 'দাদাঠাকুর' 'চরিত্রহীন' উপন্যাস রচনা করিতেছেন। লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি খুব আন্তরিকতার সঙ্গে একটি কথা লিখিয়াছিলেন। তাহা উদ্ধৃত করিয়াই এই প্রসঙ্গ শেষ করিব, 'লীলা, আমার এই জীবনটা আগাগোড়াই যেন একটা মস্ত উপন্যাস, এবং এই উপন্যাসে সব কাজই করেচি শুধু ছোট কাজ কখনও করিনি। যখন মরবো—ফরসা খাতা রেখে যাবো যার মধ্যে কালির আঁচড় এক জায়গায়ও থাকবে না।'

২

বিবাহ—হিরণ্ময়ী দেবী

শরৎচন্দ্রের জীবনের বর্মা-পর্বের সব চেয়ে বড় ঘটনা হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে বিবাহ। ১৯০৮ সালে তিনি বিভূতিভূষণ ভট্টকে ক্ষোভ করিয়া লিখিয়াছিলেন, 'আমার ঘুড়ির নীচে ভার নাই, আমার তীরের মাথায় ফলা নাই, আমার নৌকায় হাল নাই···ইত্যাদি।' হিরণ্ময়ী দেবীর শিক্ষা বা আভিজাত্য ছিল না, কিন্তু তিনি শরৎচন্দ্রের জীবনের ঘুড়ির নীচে ভার, তীরের মাথায় ফলা, এবং নৌকার হাল হইয়া তাঁহার ভবঘুরে, উদ্দেশ্যহীন, প্রবাসী জীবনে স্থিতিস্থাপকতা আনিয়াছিলেন এবং যদিও বহুকাল পূর্বে লেখা 'বড়দিদি' বা 'কাশীনাথ' অবলম্বন করিয়াই শরৎচন্দ্রের খ্যাতির স্থত্রপাত হয়, তবু মনে হয় হিরণ্ময়ী দেবার সঙ্গে নিস্তরঙ্গ, নির্ঝঞ্ঝাট, স্নেহে প্রেমে পরিপূর্ণ গার্হস্থ্য জীবনের আস্বাদ পাইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি ১৯১২ হইতে আমরণ অর্থাৎ দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর বঙ্গসাহিত্য তথা ভারতীয় সাহিত্যকে এত সমৃদ্ধ করিয়া যাইতে পারিয়াছিলন।

১৯০৮ সালে শরৎচন্দ্র যখন বিভূতিভূষণ ভট্টকে চিঠি লিখেন তখন পর্যন্ত তিনি অবিবাহিত ছিলেন তাহা ঐ পত্র হইতেই অনুমান করা যায়। ১৯১২ সালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় লিখিবার জন্য বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য বোধ হয় তাঁহাকে চিঠি দেন। উত্তরে তিনি নিজের জীবনের যে ফিরিস্তি দেন তাহাতে দেখি গৃহদাহে তাঁহার সব কিছু পুড়িয়া গিয়াছে ; কিন্তু ঠিক ইহার পরের বৎসরের চিঠিতে এমন ভাবে 'যিনি' বলিয়া হিরণ্ময়ী দেবীর উল্লেখ করিয়াছেন যে এই মহিলার সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক বিষয়ে প্রমথবাবুর কোন সন্দেহ নাই। হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে যাঁহাদের আলাপ ছিল তাঁহারাও বলিয়াছেন যে, বাড়ি পুড়িবার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। ইহা হইতে মনে হয় যে, ১৯০৮ হইতে ১৯১২ সালের মধ্যে এই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকিবে। শরৎচন্দ্র যখন ভাগলপুরে ছিলেন, তখন তাঁহার আশেপাশে কতকগুলি 'কুঁড়ি' সাহিত্যিকের সমাবেশ হইয়াছিল। আর বর্মায় তিনি ছিলেন অখ্যাত চাকুরি-প্রার্থী এবং পরে সামান্য কেরাণী, যাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছে মিস্ত্রীপল্লীতে। অথচ এই অখ্যাত পল্লী হইতেই তিনি হঠাৎ খ্যাতির উচ্চশিখরে সমাসীন

হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার এখানকার জীবন যেমন রহস্যময় তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক।

এই কারণেই প্রথমে যাঁহারা এই কৌতূহল নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যেমন গিরীন্দ্রনাথ সরকার, যোগেন্দ্রনাথ সরকার, সতীশচন্দ্র দাস ও নরেন্দ্র দেব, ইঁহাদের বিবরণ আমরা নির্বিচারে মানিয়া লইয়া আপাত পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি এবং যেহেতু শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নায়কগণ এবং নায়িকাগণ অনেক ক্ষেত্রেই 'চল্‌তি (পথের) পন্থী' নহে, সেই জন্য উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে খাপছাড়া বা নিয়মবহির্ভূত কিছু থাকিলে গ্রন্থকারের জীবনের সঙ্গে তাহা যুক্ত করিয়াছি। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রায় চল্লিশ বছর চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার বহু চিঠিপত্র আমাদের হাতে আসিয়াছে। তাঁহার জীবনে যাহা নিয়ম-বহির্ভূত বলিয়া মনে হইত, কালের ব্যবধানে এখন তাহা বিস্ময় জাগায় না, অনেক কিছু যাহা অস্পষ্ট ছিল তাহা স্পষ্ট হইয়াছে এবং যাহা পূর্বে স্পষ্ট বলিয়া মনে হইয়াছিল এখন তাহা ঝাপসা হইয়া পড়িয়াছে।

এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রথমবার বিবাহের কাহিনীর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রহ্মপ্রবাসী বন্ধুদের মধ্যে গিরীন্দ্রনাথ সরকার শান্তি দেবীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহের ও প্লেগে শান্তি দেবীর মৃত্যুর কথা বলিয়াছেন। নরেন্দ্র দেব ও পরবর্তী লেখকেরা সেই কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন। সাহিত্যিক গিরিজাকুমার বসু ও তদীয় স্ত্রী তমাললতা বসু একসময়ে শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁহাদের একটি ছেলে মারা গেলে শরৎচন্দ্র নাকি এই বলিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তো ছেলেকে বেশ কয়েক বছর লালন-পালন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে তো তাঁহার ছেলেকে আদরযত্ন, লালন-পালন করিতেও পারেন নাই কারণ অতি শৈশবেই সে চলিয়া গিয়াছিল। গিরীন্দ্রনাথ সরকারের কাহিনীতে স্ত্রীর শবদাহের উল্লেখ আছে, কিন্তু ছেলের কথা নাই। তমাললতা বসু নাকি এই ব্যাপারটি এক স্বল্পপরিচিত পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই প্রবন্ধ যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহাদের একজন আমাকে বলিয়াছেন শরৎচন্দ্রের পুত্রশোকের উল্লেখ আছে, আর একজন বলিয়াছেন শরৎচন্দ্রের সস্নেহ সান্ত্বনাদানের কথা আছে, নিজের পুত্রশোকের উল্লেখ নাই। গোপালচন্দ্র রায় মনে করেন যে, এইরূপ শোকের সময় কেহ শোকার্ত পিতামাতাকে মিথ্যা কথা বলে না। কাজেই এই কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য কিন্তু মরণোত্তর শোকের সান্ত্বনা দিতে যাইয়াই লোকে সাধারণতঃ কল্পনার

আশ্রয় নেয়। সেই সময় কেহ সত্যাসত্য বিচার করে না। যুক্তির দ্বারা বিচার করিলে পিণ্ডদান প্রভৃতি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান তো প্রায় ষোল আনাই স্তোকবাক্য। সুতরাং সদ্য পুত্রহারা পিতামাতাকে তিনি কি বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন এবং তাঁহারা কি শুনিতে কি শুনিয়াছিলেন তাহার উপর খুব বেশি জোর দেওয়া যায় না।

আর একটা দিক হইতেও প্রথম বিবাহের কাহিনী একটু ঝাপ্‌সা বলিয়া মনে হয়। শরৎচন্দ্র খুব কোমলস্বভাবের লোক ছিলেন। নিরুপমা দেবীর স্বামীর সপিণ্ডকরণের দিনে এই সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের চোখে অশ্রুধারা দেখিয়া নিরুপমা অভিভূত হইয়াছিলেন। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ভাই বেদানন্দের মৃত্যুতে তিনি যে কত শোকবিহ্বল হইয়াছিলেন তাহার পরিচয় চিঠিপত্রে সর্বত্র দেদীপ্যমান। এমন কি প্রিয় কুকুর ভেলুর মৃত্যুতে তিনি শুধু অভিভূত হয়েন নাই, তাহার স্মৃতিফলক পর্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন। যে সব চিঠিপত্র এই পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে তাহাতে সকল আত্মীয়স্বজনের প্রতি তাঁহার গভীর স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়। কলিকাতায় আসিবার পর শুধু ছোট বোন সুশীলার সম্পর্কে তিনি কিছু বলেন নাই। এই নীরবতার কারণও উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তবে তাহার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

এইরূপ স্নেহপরায়ণ লোক কখনও চিঠিপত্রে মৃত স্ত্রী ও সন্তানের কথা কোথাও উল্লেখ করিবেন না ইহা বিশ্বাস করা শক্ত। তাঁহার রচনায় রেঙ্গুনে প্লেগমহামারির ভয়াবহ বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে ব্যক্তিগত শোকের ছায়া নাই। সেখানে সবচেয়ে জীবন্ত চিত্র স্বার্থপর মনোহর চক্রবর্তীর বিজ্ঞতা ও তাহার পরিণামের।

১৯০৮ হইতে ১৯১২ সালের মধ্যে কৃষ্ণদাস চক্রবর্তীর (অধিকারীর) কনিষ্ঠা কন্যা মোক্ষদাকে শরৎচন্দ্র বিবাহ করেন এবং ইঁহার নাম রাখেন হিরণ্ময়ী। কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন, শরৎচন্দ্র ইঁহাকে আদৌ বিবাহ করিয়াছেন কিনা। যাঁহারা বলেন তিনি বিবাহ করেন নাই, তাঁহারা প্রশ্ন করেন, শরৎচন্দ্র ইঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন, এমন কথা কাহাকেও বলিয়াছেন কি? এই যুক্তি যেমন অদ্ভুত, তেমনি উদ্ভট। গৃহিণীকে সত্যসত্যই বিবাহ করিয়াছেন এমন কথা কেহ বলিয়া বেড়ান ইহার দৃষ্টান্ত তো বড় শুনি নাই। বরং ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তই মনে খট্‌কা জাগায় বা জুগুপ্সার সঞ্চার করে।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নবকুমার অজ্ঞাতকুলশীলা কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ

করিয়া সপ্তগ্রামে ফিরিয়াছিলেন। নবকুমারের আত্মীয়স্বজন ও সমাজপতিরা এই বধূকে গ্রহণ করা লইয়া কেন প্রশ্ন করেন নাই তাহার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র জবাবদিহি করিয়াছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সমসাময়িক পাঠকবর্গের আপত্তি নিরসনার্থেই এই কৈফিয়তের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়াছিলেন। ইহার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর ১৯১৬ সালে শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে লইয়া প্রথমে হাওড়া শহরে এবং পরে হুগলীর পল্লীগ্রামে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বসবাস করিতে শুরু করেন। এখনকার কথা বলিতে পারি না। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মদেশ হইতে সস্ত্রীক প্রত্যাবর্তনের সময়ে আমাদের মত যাহারা বাংলার পল্লীগ্রামে বাস করিয়াছে তাহারাই জানে এইরূপ কার্য দলপতিদের কি মহোৎসবের সুযোগ করিয়া দিত। তখনও দেখিয়াছি যে, কেহ বিলাত হইতে আসিলেই একঘরে হইতেন, বিক্রমপুরের মেয়ে ত্রিপুরায় বিবাহিত হইলে মেয়ের পিতা অপাংক্তেয় হইতেন, ব্রাহ্মণ অ-ব্রাহ্মণের সঙ্গে আহার করিলে মহা অনর্থের সৃষ্টি হইত, কে কোন্ পর্যায়ের কুলীন তাহার মীমাংসা না হওয়ায় নিমন্ত্রণ পণ্ড হইবার উপক্রম হইত। আবার দলপতিরা পর্যাপ্ত দক্ষিণা পাইলে গণ্ডগোলের উপশম হইত। এই জন্যই শরৎচন্দ্রের 'পল্লী-সমাজ' যখন প্রথম বাহির হয়, তখন তাহা খুব জনপ্রিয় হইলেও, একাধিক পল্লীবাসী পাঠককে মন্তব্য করিতে শুনিয়াছি, ইহার মধ্যে নূতন কথা কিছু নাই, বেণী ঘোষাল, গোবিন্দ গাঙ্গুলি, ধর্মদাস চাটুয্যে, পরাণ হালদার প্রভৃতি তো সব গ্রামেই আছে। শরৎচন্দ্রের স্ত্রীর আবার একটা অমার্জনীয় অপরাধ ছিল বলিয়া মনে হয়। শোনা যায় তিনি বালবিধবা ছিলেন। তাহা হইলে শরৎচন্দ্রের নিজের ভাষায়ই বলিতে পারি, গ্রাম্য ঠাকুরদাদাদের কাছে বাজারের বাইজী অপেক্ষা বিধবা বিবাহের পত্নী উচ্চ আসন পায় না।

হিরণ্ময়ী দেবী সম্পর্কে যে সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে মনে হয় তাঁহাকে লইয়া যে সমস্যা ছিল তাহার কখনও সমাধা হইত না। তাঁহার পিতা কৃষ্ণদাস অধিকারী (বা চক্রবর্তী) ব্রাহ্মণ না বৈষ্ণব (বোষ্টম ?) চাতুর্বর্ণ্য-কণ্টকিত ভারতবর্ষে এই সমস্যা বহুদিনের। ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ হইলে তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব বজায় থাকে কিনা এই প্রশ্ন লইয়া এক সময় বহু বিতর্ক হইয়া থাকিবে বলিয়াই 'ব্রাহ্মণশ্রমণন্যায়' নামে প্রবচনের উদ্ভব হইয়াছিল। শরৎচন্দ্র এই সকল সমস্যার সকল দিক জানিতেন বলিয়াই একদিকে যেমন জাত বোষ্টমের জাতি-গর্ব লইয়া পরিহাস করিয়াছেন আবার (অগ্রদানী) চক্রবর্তী খুদিরাম দুরবস্থার

করুণ চিত্র আঁকিয়াছেন। এই সব চিত্রের মধ্য দিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা উঁকি দিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

সে যাহা হউক, তিনি পল্লীজীবনের প্রতি আসক্ত ও আত্মীয়বৎসল হইলেও তাঁহার স্ত্রীকে সেই সমাজের কাছে যে যাচাই করিতে চেষ্টা করেন নাই, ইহা তাঁহার পত্নীপ্রেম ও আত্মসম্মানবোধের পরিচায়ক। শ্রীরামচন্দ্র ভগবানের অবতার ; অযোধ্যার রামরাজত্ব ধরাধামে আদর্শ রাজত্ব। তাহা সত্ত্বেও উত্তরকাণ্ডে রামচন্দ্র যে ভাবে সভা ডাকিয়া সীতার সতীত্ব যাচাই করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা আমরা নির্বিচারে গ্রহণ করিতে পারি না। রাজশেখর বসু (পরশুরাম) 'চমৎকুমারী' গল্পে খুঁতখুঁতে স্বভাবের স্বামীকে 'রামচন্দ্রী স্বামী' বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। বাল্মীকির রামচন্দ্র খুঁতখুঁতে স্বভাবের ছিলেন না, কিন্তু যে ভাবে তিনি সীতার দ্বিতীয়বার পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাইতেই সীতা বসুমতীকে আহ্বান করিয়া সর্বসমক্ষে সদর্পে ঘোষণা করিয়াছিলেন :

> যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
> তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥

ভবভূতির উত্তররামচরিত নাটকে সীতা রামচন্দ্রের অতন্দ্র প্রজানুরঞ্জন লইয়া সংক্ষিপ্ত অথচ তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়াছেন এবং রাজর্ষি জনকের ক্রোধবহ্নি অপ্রতিরোধ্য রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বাল্মীকি হইতে ভবভূতি এবং ভবভূতির কাল হইতে বিংশ শতাব্দী—সব সময়েই অনেকের মনে রামচন্দ্রের ব্যবহার আত্মসম্মানবিরোধী বলিয়া মনে হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের নিজের কথাই উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। তিনি ক্ষুব্ধ চিত্তে কিন্তু বিনা দ্বিধায় সামাজিক নিগ্রহ সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু ইহাও বলিয়াছেন, 'আমার বিগত জীবনের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত উদাসীন। জানি এ লইয়া বহুবিধ জল্পনা-কল্পনা ও নানাবিধ জনশ্রুতি সাধারণে প্রচারিত আছে। কিন্তু আমার নির্বিকার আলস্যকে তাহা বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। শুভার্থীরা মাঝে মাঝে উত্তেজিত হইয়া আসিয়া বলেন এই সব মিথ্যের আপনি প্রতিকার করবেন না ? আমি বলি মিথ্যে যদি থাকে তো সে প্রচার আমি করিনি ; সুতরাং প্রতিকার করার দায় আমার নয়, তাঁদের।' (গোপালচন্দ্র রায় —'শরৎচন্দ্র' ১৯৭৬, পৃঃ ২২১) যাঁহার কোন কিছু লুকাইবার আছে তিনি এই জাতীয় উক্তি করেন না।

শরৎচন্দ্রের বহু চিঠিপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে দেখা যায় যে তিনি আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত হইয়া বাস করিতেন। বিশেষ করিয়া তাঁহার দিদির যৌথ পরিবারের সঙ্গে তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল; এবং দিদির দেবর-পত্নীরা তাঁহার নিজের বোনের মত ছিলেন। তাঁহাদের ছেলেরাই সকল সাংসারিক কাজেকর্মে তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে দিদি অনিলা দেবী হিরণ্ময়ী দেবীর কাছে থাকিতেন। তিনি কলিকাতায় পাকাপাকিভাবে বসবাস করিবার সময়ও এই অন্তরঙ্গতা ও ঘনিষ্ঠতা নষ্ট হয় নাই। যদি রক্ষণশীল পরিবারের পুরুষ ও বিশেষ করিয়া মহিলাদের হিরণ্ময়ী দেবীর পারিবারিক মর্যাদা সম্পর্কে কিছু মাত্র সংশয় থাকিত, তাহা হইলে এই নিঃসঙ্কোচ অন্তরঙ্গতা সম্ভব হইত না। শরৎচন্দ্র প্রমথনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি নিকট বন্ধুদের কাছে চিঠিতে যেখানে যেখানে হিরণ্ময়ী দেবীর সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন দ্বিধাহীনভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। নিকটতম আত্মীয় (ও সম্পর্কে গুরুজন) সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় হিরন্ময়ী দেবীকে সহজ সাধারণ ভাবে 'বড়মা' বলিয়া উল্লেখ করিতেন, সুরেন্দ্রনাথের রচনা হইতে এরূপ মনে হয়। যে দিক হইতেই দেখা যাক, হিরণ্ময়ী দেবী যে শরৎচন্দ্রের বিবাহিতা পত্নী ছিলেন এই বিষয়ে অন্তরঙ্গ কাহারও কোন সংশয় ছিল বলিয়া মনে হয় না। তবে নিরুপমা দেবী যাঁহাদিগকে কল্পনাজীবী বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন তাঁহারা কল্পনার জাল বুনিয়াছেন বলিয়াই এই বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে আমার নিজের কিছু বলিবার আছে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার আলাপ হয় ১৯২৯ সালে। তখন 'পথের দাবী' কিছু দিন আগে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। অনেকটা সেইজন্যই বোধ হয় বিপ্লবীদের সম্পর্কে আলোচনা একটু বেশি হয়। তিনি জনৈক প্রসিদ্ধ ও শ্রদ্ধাস্পদ বিপ্লবীর কথা উল্লেখ করিয়া আমাকে বলেন, ইঁহার পিতা ছিল অতিশয় পাষণ্ড; বৃদ্ধ বয়সে হঠাৎ লোকের কাছে বলে যে তাহার 'জীবনসঙ্গিনী'কে অর্থাৎ বিপ্লবীর মাকে সে বিবাহ করে নাই! নারীর প্রতি অবমাননা স্মরণ করিয়া শরৎচন্দ্র উত্তেজিত হইয়া উঠেন। তিনি নিজে এইরূপ পাষণ্ডের মত আচরণ করিয়াছিলেন ইহা মানিয়া লইতে মন সরে না।

অক্ষয় কুমার সরকারের সঙ্গে অনেককাল প্রেসিডেন্সী কলেজে কাজ করিয়াছি। অক্ষয়বাবু খুব সরল, স্পষ্টবাদী লোক ছিলেন এবং বয়সে বড়

হইলেও আমার এবং আমার বন্ধু তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং আমাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার একটা প্রধান বিষয় ছিল—শরৎচন্দ্র, কারণ তিনি সাহিত্যিক বা সাহিত্যরসিক না হইলেও শরৎচন্দ্রের খুব সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন এবং শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার কৌতুকোজ্জ্বল প্রীতির সম্পর্ক ছিল। শরৎচন্দ্র নাকি সহাস্যে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার রক্ষণশীলতা লইয়া মজা করিবার জন্যই তিনি 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসের উগ্র নীতিবাদীর নাম দিয়াছেন ইতিহাসের অধ্যাপক অক্ষয়। আমাদের অক্ষয়বাবু রক্ষণশীল মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মধ্যে কোথাও উগ্রতা ছিল না। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' অনেকটা আত্মজীবনীর আকারে লিখিত এবং এই কাহিনীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র রাজলক্ষ্মী, যে শ্রীকান্তের স্ত্রী নহে, অথচ যাহার দুঃসহ আকর্ষণ শ্রীকান্ত প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। শ্রীকান্ত কখনও তাহার একান্ত কাছে যাইতে পারে নাই আবার দূরে সরিয়াও যাইতে পারে নাই, শুধু উপগ্রহের মত তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। শরৎচন্দ্র যখন কলিকাতার অদূরে বসবাস করিতে লাগিলেন, তখন অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে, যে মহিলা তাঁহার সংসারে গৃহকর্ত্রী তিনিই কি রাজলক্ষ্মীর আদিরূপ? অক্ষয়বাবু এই প্রশ্ন এড়াইয়া না যাইয়া সোজাসুজি উত্তর দিতেন যে, শরৎচন্দ্রের স্ত্রী বিবাহিতা পত্নী এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের অল্পশিক্ষিতা মেয়ে। এই দুই প্রৌঢ়ের মধ্যে হাস্যরস ও আদিরস মিশ্রিত যে আলাপ হইত তাহার মধ্যে শরৎচন্দ্রের একটা প্রায়শঃ উদ্ধৃত উক্তি আমার এখনও কানে বাজিতেছে। শরৎচন্দ্র নাকি অক্ষয়-বাবুকে বলিতেন, এই সব 'মন্ত্রপড়া' স্ত্রীরা এত বেশি অধিকারলুব্ধ যে, 'ভেলু' কুকুরের সম্পর্কেও ঈর্ষা দমন করিতে পারে না, রাত্রিতে তাহার সান্নিধ্যেও আপত্তি করে!

এই বিষয়টি লইয়া পাঠকবর্গের মনে অতিরিক্ত কৌতূহল সঞ্চারিত হওয়ায় ইহার সুদীর্ঘ আলোচনা করিলাম। বাস্তবিকপক্ষে, ইহার উত্থাপন না করাই বোধহয় উচিত ছিল। শরৎচন্দ্র তাঁহার উইলে হিরণ্ময়ী দেবীকে তাঁহার স্ত্রী বলিয়া উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে ওয়ারিশ করিয়া গিয়াছিলেন এবং লাইফ ইন্‌সিওরেন্স সম্পর্কেও সেই একই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যে কোন জিজ্ঞাসুর পক্ষে তাহাই যথেষ্ট হওয়া উচিত।

হিরণ্ময়ী দেবী কি শরৎ-সাহিত্যে কোথাও প্রবেশ করিয়াছেন? স্রষ্টার সৃষ্টি এত রহস্যময় যে এই প্রশ্নের কোন সহজ উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। বাস্তব

জগতের অভিজ্ঞতা ছাড়া কল্পনা ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। যাঁহারা আকাশ-কুসুমের কথা বলেন তাঁহারাও আকাশ ও কুসুম দেখিয়াই ইহার কল্পনা করেন অথবা ইহার অসম্ভাব্যতা লইয়া পরিহাস করেন। Wuthering Heights-এর রচয়িত্রীর প্রতিভা অনন্যসাধারণ, কিন্তু ইহাও মনে হয় যে অভিজ্ঞতার স্বল্পতা সেই প্রতিভাকে সীমিত করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতা ছিল বিচিত্র ও বিস্তৃত, পর্যবেক্ষণশক্তিও ছিল তীক্ষ্ণ এবং তাঁহার কল্পনাও সুদূরপ্রসারী। সুতরাং কোন্ অভিজ্ঞতা কোন্ রূপে রূপায়িত হইয়াছে তাহা বলা কঠিন। আবার ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, কবির প্রতিভা ইতিহাস রচনা করে না। ইহা বাস্তবকে অতিক্রম করে বলিয়াই কবি স্রষ্টা আর ঐতিহাসিক মূলতঃ তথ্যনিষ্ঠ নির্মাতা।

এই সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া বিচার করিলে বলা যাইতে পারে যে, 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে উপীনের স্ত্রী সুরবালা, 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে অক্ষয়ের স্ত্রী—যাহার পরোক্ষ বর্ণনামাত্র আমরা পাই—হিরণ্ময়ী দেবীর সাদৃশ্যে পরিকল্পিত হইয়াছে। অপর দিকে 'মন্ত্রপড়া' পতিগতপ্রাণা স্ত্রীর একনিষ্ঠ অনুরক্তিকে ব্যঙ্গ করিতে যাইয়াই শরৎচন্দ্র অপরূপ ছোট গল্প 'সতী' লিখিয়া থাকিতে পারেন যেমন তিনি 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে পরিহাসাস্পদ রক্ষণশীল অধ্যাপকের চিত্র আঁকিয়া তাঁহার নাম দিয়াছেন অক্ষয় এবং সেই কথা নিজেই সকৌতুকে প্রতিবেশী বন্ধু ইতিহাসের (ও অর্থনীতির) অধ্যাপক অক্ষয়কুমার সরকারকে বলিয়াছিলেন।

এইরূপ মনে করার যথেষ্ট উপকরণ আছে যে, হিরণ্ময়ী দেবী 'জাত বোষ্টম' হইতে পারেন ; তাহা না হইলেও তাঁহার পিতা বৈষ্ণবধর্মে ও আচারে বিশ্বাসী ছিলেন। হয়ত ইঁহাদের সংস্রবে আসার জন্যই শরৎচন্দ্র বৈষ্ণবদের জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের নিবিড় পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং বৈষ্ণবধর্মের মর্মস্থলে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। একাদশী বৈরাগী, বৃন্দাবন ও কুসুম, সর্বোপরি দ্বারিকাদাস বাবাজী ও কমললতার মধ্য দিয়ে তিনি বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীদের চরিত্রের নানা দিক উদ্ভাসিত করিয়াছেন। একদিকে রহিয়াছে 'জাত বোষ্টম' টগরের জাত্যভিমান ও অশালীনতা, উষাঙ্গিনীর কণ্ঠিবদলের স্বামী মন্মথনাথের বীভৎস আচরণ আর অপর কোটিতে আছে কমললতার সর্বত্যাগী অথচ সর্বব্যাপী প্রেম ও দ্বারিকদাস বাবাজীর প্রশান্ত স্থৈর্য। কুসুমের মধ্যে বোষ্টম ও ব্রাহ্মণের সংস্কার ও আচারের সমন্বয় দেখা যায় আর সৌদামিনীর 'স্বামী' ঘনশ্যাম 'জাত বোষ্টম'

না হইলেও সহনশীলতায় ক্ষমাপ্রবণতায় আদর্শ বৈষ্ণব। সাহিত্য প্রতিভার সৃষ্টি, বাস্তবজগতের মানুষের জীবণচরিত নয়। তবু বাস্তবের সহিত সংযুক্ত বলিয়াই সাহিত্য সাহিত্য। মনে করা যাইতে পারে, উপরি-উল্লিখিত অপরূপ চরিত্র ও কাহিনী প্রভৃতির মধ্য দিয়া শরৎসাহিত্যের উপর হিরণ্ময়ী দেবীর প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। অবশ্য উপরের আলোচনা পড়িয়া কেহ যেন মনে না করেন যে বোষ্টম কুসুম বা 'সতী' গল্পের নির্মলা বা অন্য কোন উল্লিখিত রমণী হিরণ্ময়ী দেবীর প্রতিকৃতি।

তৃতীয় পর্ব

শিবপুর, সামতা ও কলিকাতা

১

শরৎচন্দ্র ১৯১৬ সালে চিরকালের জন্য ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন এবং হাওড়ায় বসবাস করিতে শুরু করেন। তখন তাঁহার প্রধান সম্বল ছিল গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের নিকট হইতে মাসিক একশত টাকার প্রতিশ্রুতি। তাঁহার 'বড়দিদি' প্রকাশিত হওয়ার পর সাহিত্যরসিক মহলে যে সাড়া পড়িয়াছিল সেই সম্পর্কে তিনি কোথাও কোন উল্লেখ করেন নাই। 'বিন্দুর ছেলে', 'বিরাজ বৌ', 'বড়দিদি' প্রভৃতি যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তখন ইহাদের বিক্রয় হইতে বিশেষ কিছু লাভ হইবে কিনা এই বিষয়েও তিনি সন্দিহান ছিলেন। কাজেই তিনি প্রথমে হাওড়ায় নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের উপযোগী ছোট বাড়ি ভাড়া লইয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হয় এবং সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য আসে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি পূর্বের আটপৌরে জীবনযাত্রা পরিত্যাগ করেন নাই। পরবর্তী-কালে কলিকাতায় বাড়ি করিলেও তিনি পল্লীগ্রামের সাধারণ লোকের এবং নিকট আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেই থাকিতে ভালবাসিতেন। কলিকাতার অভিজাত সমাজের সঙ্গে তাঁহার তেমন সম্পর্ক ছিল না; তখনকার দিনে সবাই জানিত কোন সভাসমিতিতে তাঁহাকে আনিয়া উপস্থিত করা এক দুরূহ ব্যাপার ছিল।

এই সব কথার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, জীবনের শেষ বাইশ বৎসর শিক্ষিত ও অভিজাত সমাজের বেশ কাছে থাকিলেও তাঁহার অভিজ্ঞতার পরিধি খুব বেশী বাড়ে নাই এবং রচনার বিষয়বস্তুর কোন মৌলিক পরিবর্তন হয় নাই। ইহার শুধু একটি ব্যতিক্রম আছে; তাহার কথা পরে বলিব। 'শ্রীকান্ত' প্রথম দুই পর্বের সঙ্গে পরের দুই পর্বের তুলনা করিলেই বর্তমান বক্তব্য স্পষ্ট হইবে। তৃতীয় পর্ব লিখিত হইয়াছিল ব্রহ্মদেশে প্রবাসের পর যখন শরৎচন্দ্র কলিকাতার কাছেই জীবন যাপন করিতেছিলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে প্রায় কোথাও শহুরে জীবনের সংস্পর্শ নাই। উপন্যাসের প্রয়োজনেই শরৎচন্দ্রের কাহিনীর কেন্দ্র হইয়াছে বাংলার এক অখ্যাত পল্লী—গঙ্গামাটি গ্রাম, যাহার অধিকাংশ বাসিন্দা দরিদ্র অন্ত্যজ নরনারী আর চতুর্থ পর্বে তিনি চলিয়া গিয়াছেন ঐরূপ পল্লীগ্রামে এবং এই পর্বের প্রধান চরিত্র বোষ্টমী কমললতা। অবশ্য এই শেষের দিকের

রচনায় দুই-একটি স্থানে বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শরৎচন্দ্র নিজে সন্ন্যাসী বেশে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসের প্রতি তাঁহার মনে বিতৃষ্ণাই ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি তাঁহার অত্যন্ত স্নেহভাজন দিলীপকুমার রায় অরবিন্দ আশ্রমে যোগদান করিলে তিনি তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। তাঁহার সনির্বন্ধ অনুরোধের মধ্যে সকৌতুক বিদ্রূপ আছে, কিন্তু তদপেক্ষা বেশি প্রকট হইয়াছে ক্ষোভ ও বেদনা-বোধ। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে, শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মদেশে প্রবাসকালে তদীয় মধ্যম ভ্রাতা প্রভাসচন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন এবং স্বামী বেদানন্দ নাম গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসী হইলেও পূর্বাশ্রমে জ্যেষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল; 'বসুমতী সাহিত্যমন্দির' হইতে যে শরৎ-রচনাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার প্রত্যেকটি গ্রন্থে ইঁহাদের এক ভ্রাতার স্বাক্ষর থাকিত। অনেক খণ্ডে 'বেদানন্দ' স্বাক্ষর পাঠকবর্গের চোখে পড়িয়া থাকিবে। শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের পল্লীনিবাসে শরৎচন্দ্রের বুকের উপর মাথা রাখিয়াই বেদানন্দ দেহত্যাগ করেন এবং শরৎচন্দ্রের হৃদয়ে তাঁহার করুণ মধুর স্মৃতি সর্বদা জাগরূক ছিল। এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে. শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্বে স্বামী বজ্রানন্দের মধ্যে নির্লিপ্ততা ও স্নেহপরায়ণতার যে অপরূপ চিত্র শরৎচন্দ্র আঁকিয়াছেন তাহার পিছনে বেদানন্দর সঙ্গে সম্পর্ক ও তাঁহার কর্মধারার সঙ্গে পরিচয় নিহিত ছিল। অবশ্য তাই বলিয়া ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, বজ্রানন্দে বেদানন্দ স্বামীর জীবন বা চরিত অঙ্কিত হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ভাগলপুরের একটি বাঙালী অভিজাত পরিবারের পরিচয় ছিল। ইহার প্রতিষ্ঠাতা রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের আগেকার রচনায় অভিজাত সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য কোন চিত্র নাই। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া যে বাইশ বছর তিনি জীবিত ছিলেন তাহার মধ্যে বাঙালী সমাজের উঁচু স্তরের বহু লোকের সঙ্গে তাঁহার অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। শরৎসাহিত্যে এই সমাজের কোন উল্লেখযোগ্য চিত্র নাই।

শুধু একটি দিকে শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছিল এবং তাহার কথা কিছু বলা দরকার। তিনি এত কাল ব্যক্তিবিশেষের দিক হইতে জীবনকে দেখিতেন, এখন দেশে ফিরিয়া সামগ্রিকভাবে জন্মভূমিকে দেখিতে শিখিলেন। দেশের মানুষকে লইয়াই তো দেশ; তবু এই অভিন্নতার মধ্যেও পার্থক্য আছে। কংগ্রেস্ স্থাপিত হইয়াছিল ১৮৮৫ সালে যখন শরৎচন্দ্রের বয়স মাত্র নয় বৎসর।

কিন্তু বাংলায় তথা ভারতবর্ষে—গোখ্‌লে বলিয়াছিলেন বাংলা আজ যাহা চিন্তা করে বাকি ভারতবর্ষ কাল তাহাই চিন্তা করে—ইহা জাতীয় জীবনকে বিশেষ-ভাবে নাড়া দেয় ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে। তখন শরৎচন্দ্র ছিলেন ব্রহ্মদেশে, সেইখানে এই আন্দোলনের হাওয়া তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই এবং পরবর্তীকালে তিনি ইহার সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাও খুব অনুকূল নয়। যাহা হউক, এই আন্দোলনে কংগ্রেস দুই দলে বিভক্ত হয়; ইহাদিগকে বলা হইত নরমপন্থী বা মডারেট এবং চরমপন্থী বা এক্সট্রিমিস্ট। শরৎচন্দ্র দেশে ফিরেন ১৯১৬ সালে, এবং ১৯১৭ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতে অ্যানি বেসান্তের সভাপতিত্বে চরমপন্থীরা আধিপত্য বিস্তার করে। অল্প দিনের মধ্যেই কংগ্রেসের এতকালের প্রবীণ নেতা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং অনতিকালের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের অবিসংবাদিত নেতৃত্ব লাভ করেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। এই কলিকাতা নগরীতেই ১৯২০ সালে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধী অসহযোগ প্রস্তাব পেশ করেন এবং এই অসহযোগ আন্দোলনে আসমুদ্র হিমাচল ভারতভূমি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। বঙ্গদেশে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব নেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রধান কর্মকর্তা হইলেন সুভাষচন্দ্র বসু।

শরৎচন্দ্রের মত মানুষ যে এই আন্দোলনে সাড়া দিবেন এবং আন্দোলনের নেতৃবর্গ যে তাঁহার সহযোগিতা সাদরে গ্রহণ করিবেন ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। পরবর্তীকালে মহাত্মাজীর প্রোগ্রামের সবটা তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু যাহা তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত হৃদয় ও বুদ্ধিকে সর্বাপেক্ষা বেশি স্পন্দিত করিয়াছিল তাহা ইহার স্বাদেশিকতার সামগ্রিকতা। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের একটা দিক তাঁহার মনকে ব্যথিত করিয়াছিল—ইহা ভারতবাসীর প্রাদেশিকতা। মহাত্মা গান্ধীর প্রেরণায় এই সংকীর্ণতা বিদূরিত হয়। ১৯৩৭ সালে মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেস ত্যাগের সময় শরৎচন্দ্র একটি প্রবন্ধ লিখেন। ইহাতে মহাত্মাজীর স্থায়ী কৃতিত্ব বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, 'বঙ্গবিভাগের দিনেও জাতীয় মহাসমিতি বঙ্গকে তাহার অঙ্গ বলিয়া ভাবিতে জানিত না। বাংলার প্রশ্ন ছিল শুধু বাংলারই, বোম্বাই-আহমদাবাদ বাঙালীকে এক টাকার কাপড় চার টাকায় বিক্রি করিত, কংগ্রেস নিরুপায় বিস্মিত চক্ষে শুধু চাহিয়া থাকিত—কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন, অক্ষম জাতীয় মহাসমিতিকে নিজের অদম্য অকপট বিশ্বাসের জোরে সমগ্রতা আনিয়া দিলেন

মহাত্মা, দিলেন শক্তি, সঞ্চারিত করিলেন প্রাণ, তাঁহার এই দানই সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিব।' এই যে নূতন অনুভূতি ইহা শরৎচন্দ্রের শেষের দিকের রচনায়ও প্রতিফলিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ রচনায় পল্লীসমাজের দুঃখদারিদ্র্যের অশিক্ষা, কুসংস্কার, মহামারির প্রকোপের কথা আছে। কিন্তু সেই সব চিত্র যতই করুণ ও ভয়াবহ হউক তাহা ব্যক্তিবিশেষের বা স্থানবিশেষের কাহিনী। কিন্তু 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বে গঙ্গামাটির ও অন্যান্য অঞ্চলের যে চিত্র পাই তাহা একটু অন্যরকমের। মনে হয় গঙ্গামাটি সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতীক।

আর একটি কারণেও শরৎচন্দ্র মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েন। তাহা ইহার অভিনবত্ব। হানাহানি, কাটাকাটি করিয়া, লড়াই করিয়া দেশ জয় করা হইয়াছে আবার দেশ এই পথেই স্বাধীন হইয়াছে। সর্বকালে ইহার নজির মিলিবে। কিন্তু গান্ধীজী দেশকে স্বাধীন করিতে চাহিয়াছিলেন আত্মিক শক্তির দ্বারা, সহিষ্ণুতার দ্বারা, সত্যনিষ্ঠার দ্বারা। সেইজন্য শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের কর্মসূচী গ্রহণ করিলেন, খদ্দর ও চরকা অবলম্বন করিলেন এবং দেশবন্ধুর নেতৃত্বে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। দেশবন্ধু 'নারায়ণ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা এবং সেই পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের একটি গল্প ছাপা হইয়াছিল—'স্বামী'। প্রসঙ্গক্রমে শরৎচন্দ্র আমাকে লিখিয়াছিলেন যে এই গল্পটির এই নাম দেশবন্ধুরই দেওয়া। দেশবন্ধুর বিরাট্ ব্যক্তিত্ব তাঁহাকে নানাভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। পরবর্তীকালে 'পথের দাবী' উপন্যাসে সব্যসাচী সুমিত্রা সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'যে একুশ বছরের সমস্ত সংস্কারকে এক দিনে মুছে ফেলে আসতে পারে, তাকে আমি শ্রদ্ধা করি।' সুমিত্রা আফিমের চোরাচালানে লিপ্ত ছিল; তাহার সঙ্গে দেশবন্ধুর তুলনা খুব মানানসই হইবে না। তবু মনে হয়, সাতাশ বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় অর্জিত প্রতিষ্ঠা ও ঐশ্বর্য যেভাবে দেশবন্ধু এক মুহূর্তে জীর্ণবস্ত্রের মত পরিত্যাগ করিলেন তাহাই শরৎচন্দ্রের মত প্রতিভাবান্ লোকের চিত্তকে বিশেষভাবে স্পন্দিত করে। বিনা দ্বিধায় তিনি দেশবন্ধুর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইলেন এবং তাঁহার অনুরোধে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। ইংরেজ সরকার স্থাপিত স্কুল-কলেজ বর্জন অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গ ছিল এবং বহু ছাত্র এই আহ্বানে সাড়া দেয়। তাহাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিবার জন্য ওয়েলিংটন (রাজা সুবোধ মল্লিক) স্কোয়ারের পূর্বদিকে 'গৌড়ীয় সর্ব বিদ্যায়তন' নামে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু

এবং বাংলার প্রধান অধ্যাপকের পদে বৃত হয়েন শরৎচন্দ্র। এইখানেই তাঁহার 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধ পঠিত হয়। ক্ষণজীবী এই 'বিদ্যায়তন' শিক্ষাজগতে যদি কোন স্থায়ী সম্পদ্ রাখিয়া গিয়া থাকে তাহা এই বক্তৃতা।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে দেশবন্ধুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাহচর্য ঘনিষ্ঠ হইলেও দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই, কারণ ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর মৃত্যু হয়। সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন এবং সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের খুব হৃদ্যতা জন্মে। আমার মনে হয়, সুভাষচন্দ্রের প্রভাব তাঁহার জীবনে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল এবং এই প্রভাব রাজনীতির মতামত ছাড়াইয়া সাহিত্যেও প্রতিফলিত হইয়াছিল। যখন বহু লোক কোন আদর্শবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় তখন সর্বত্রই তাহাদের মধ্যে দুইটি দল গড়িয়া উঠে—নরমপন্থী ও চরমপন্থী। মহাত্মাজীর কংগ্রেসেও এই বিভাগ ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে এবং চরমপন্থীদের নেতৃত্ব দেন সুভাষচন্দ্র। মহাত্মাজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের প্রধান পার্থক্য এই যে, সুভাষচন্দ্র অহিংস অসহযোগকে একমাত্র অস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করেন নাই অথবা বলা যায় তিনি অহিংসায় পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন না এবং সেই কারণেই সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁহার চিরকালই সংযোগ ছিল। এই সকল বিপ্লবীরা চরকা ও খদ্দরকে কখনই সম্পূর্ণ চিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই এবং ক্রমে এই কর্মসূচীর ব্যর্থতা দেখিয়া ইহাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতে শুরু করেন। এই মনোভাবের জোরালো অভিব্যক্তি পাওয়া যায় গোপাল হালদারের 'একদা' উপন্যাসে। শরৎচন্দ্র নিজেও ক্রমে ক্রমে মহাত্মাজীর পথ হইতে সরিয়া আসেন এবং 'নূতন প্রোগ্রাম' প্রবন্ধে 'পরশুরাম' ছদ্মনামে চরকা-প্রোগ্রামের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেন। সুভাষচন্দ্র অবশ্য নিজে কংগ্রেস পরিত্যাগ করেন নাই; বরং মহাত্মাজীর সমর্থনপুষ্ট প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। তাহা হইলেও নরমপন্থীদের কৌশলে বা চক্রান্তে তাঁহাকে এই পদে ইস্তফা দিতে হয়। পরবর্তীকালে তিনি স্বাধীনতা লাভের জন্য যে বিস্ময়কর অভিযান করিয়াছিলেন তাহা পুরাপুরি সশস্ত্র সংগ্রামের পথ।

প্রধানতঃ সুভাষচন্দ্রের প্রভাবেই শরৎচন্দ্র মনে মনে সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থক হইয়া উঠেন এবং সশস্ত্র বিপ্লবীদের অন্যতম নেতা শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষের সান্নিধ্যে আসেন। ইঁহাদের প্রভাবে তাঁহার রচনাও নূতন পথে অগ্রসর হয়। ইহার সাক্ষ্য—'পথের দাবী' ও 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসের রাজেন। এই বিপ্লবীদের

মারফতেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় এবং তাঁহার নিকটই আমি বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের কথা প্রথম শুনি। 'পথের দাবী'র অনেক অংশ হেমচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হইতে সংগৃহীত এই কথা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন। 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে রাজেন মুখ্য চরিত্র নয়। কিন্তু 'শেষপ্রশ্ন' ও ও 'পথের দাবী'তে শুধু যে কাহিনী ও চরিত্রই অন্যান্য উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র হইতে বিভিন্ন তাহা নহে, ইহারা মূলতঃ নূতন ধরনের উপন্যাস—এই জাতীয় উপন্যাসে মুখ্য উপাদান কাহিনী বা চরিত্র নয়, কোন সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক প্রশ্ন, সমস্যা বা বিতর্ক। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, ইহারা আইডিয়া-প্রধান উপন্যাস। প্রত্যেক শিল্পকর্মেই এক বা ততোধিক আইডিয়া থাকে, কিন্তু কোন কোন সৃষ্টিতে আইডিয়াই প্রাধান্য লাভ করে; মনে হয় যেন কাহিনী ও চরিত্রগুলির সার্থকতা এই যে তাহাদের মধ্য দিয়া সেই আইডিয়া অভিব্যক্ত হইতেছে। প্রচারধর্মী, তর্কপ্রধান রচনার দিকে প্রথম হইতেই শরৎচন্দ্রের প্রবণতা ছিল। তাঁহার প্রথম দিকের সৃষ্টি 'পথনির্দেশ'ই তাহার প্রমাণ। ইহার সঙ্গে অপর যে দুইটি গল্প—'বিন্দুর ছেলে' ও 'রামের সুমতি'—প্রকাশিত হইয়াছিল তাহারাই অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে, কিন্তু গ্রন্থকার নিজে 'পথনির্দেশ'কেই বেশি সার্থক বলিয়া মনে করিতেন। বর্তমান আলোচনায় ইহাদের গুণাগুণ বিচার অপ্রাসঙ্গিক হইবে। শেষ পর্যায়ে এই জাতীয় রচনার দিকে যে তাঁহার মন প্রধাবিত হয় ইহার মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনে অনুপ্রবেশ ও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাহচর্যের প্রভাব লক্ষিত হয়।

আর একটি কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গের ছেদ টানিব। সকল দেশেই কবিকে বলা হয় স্রষ্টা ও দ্রষ্টা। আমাদের দেশের সাহিত্যতত্ত্বে কবিকে প্রজাপতি ব্রহ্মার মত স্রষ্টা বলা হইয়াছে, আবার তাঁহার দৃষ্টির সঙ্গে যোগীর প্রত্যক্ষ দৃষ্টির তুলনা করা হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য শাস্ত্রে কবি 'poet' অর্থাৎ নির্মাতা বা স্রষ্টা, আবার তিনি 'prophet' বা 'vates' অর্থাৎ দ্রষ্টা যিনি বর্তমান কালের নিহিত রহস্যকে উদ্ঘাটিত করেন এবং দিব্যচক্ষে ভবিষ্যৎকে দেখিতে পান। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িয়া বলিয়াছিলেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যেন পূর্ব হইতেই রবীন্দ্রনাথের কল্পনার দর্পণে তাহার প্রতিবিম্ব বিস্তার করিয়াছিল। 'পথের দাবী' যখন লিখিত হয় তখন আমরা অনেকেই মনে করিয়াছিলাম, ইহার কাহিনীর অনেকখানি আজগুবি ও অবান্তর কারণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে বর্মা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে সব্যসাচীর পরিক্রমার সম্পর্ক কি?

কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়াছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষ পর্ব শরৎচন্দ্রের মানসপটে বহু দিন পূর্বেই অঙ্কিত হইয়াছিল, কারণ ভারতের বহির্দেশে পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ হইতেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ্ ফৌজ লইয়া ইংরেজ শক্তিকে আঘাত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাময়িক অসাফল্য চরম বিজয়ের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। ইহা দেখিয়া সেই পুরাতন প্রশ্ন মনে জাগে: সাহিত্য বাস্তবকে অনুকরণ করে, না বাস্তব সাহিত্যকে অনুকরণ করে?

২

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র

বঙ্গদেশে ফিরিয়া শরৎচন্দ্র যে রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিবেন ইহা স্বাভাবিক। তিনি বহুবার বলিয়াছেন যে তিনি রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ সেবক, সাহিত্য-স্রষ্টা হিসাবে কবির তুলনায় একেবারেই নগণ্য; আমাকেই বলিয়াছিলেন, 'কবি এভারেস্টে, আমরা তো valleyতে।' ব্রহ্মদেশে যাইবার সময় তিনি আত্মীয়দের বলিয়া গিয়াছিলেন যে, কুন্তলীন পুরস্কার পাইলে তাঁহারা যেন তাঁহাকে মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থ পাঠাইয়া দেন। তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে 'চোখের বালি' তাঁহাকে খুব প্রভাবিত করিয়াছিল এবং 'গোরা'র পরেশবাবুর ছায়া তাঁহার একটি গল্পে ('বৈকুণ্ঠের উইল'-এ) প্রতিফলিত হইয়াছে। 'আকাশবিহারী' মিতা'র মত রবি-প্রতিভা পূর্ব ও পশ্চিম জগৎকে দীপ্ত করিয়াছে। কিন্তু ইহাও মানিতে হইবে যে, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে মানপত্র রচনা করিয়াছিলেন পুঞ্জীভূত রবীন্দ্রপ্রশস্তি-সাহিত্যে তাহা অনন্য। রবীন্দ্রনাথও শরৎচন্দ্রকে স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। 'বড়দিদি'র প্রথম প্রকাশকে কেন্দ্র করিয়া যে কিংবদন্তী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার প্রত্যেক অংশের সত্যতা যাচাই করা এখন সম্ভব নয়। তবে ইহা সম্ভব যে, ঐ গল্প পড়িয়া রবীন্দ্রনাথই প্রথম প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, এই অসামান্য প্রতিভাশালী লেখককে স্বদেশে সাহিত্যক্ষেত্রে ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

হয়ত খানিকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই শরৎচন্দ্রের অন্তর্লীন প্রতিভা কেমন করিয়া রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল সেই প্রসঙ্গের আলোচনা

যথাস্থানে করা হইবে। তবে ইহা আশ্চর্যের বিষয় যে, জীবনে এই দুই স্রষ্টার যে প্রকাশ্য সংস্পর্শ হইয়াছে, তাহার মধ্যে মিলন অপেক্ষা সংঘর্ষের ভাবই সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছে এবং এইখানে তাহারই বিচার করিতে হইবে।

১৯২০ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মাজী অসহযোগ আন্দোলন প্রস্তাব পাস করান। তাঁহার কার্যপরিক্রমার একটি অংশ ছিল ইংরেজ-প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজ পরিবর্জন, কারণ ঐ সব বিদ্যালয় প্রকৃতপক্ষে গোলামী মনোভাব বা slave mentality সৃষ্টি করে। এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ১৯২১ সালে কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে রবীন্দ্রনাথ এক প্রবন্ধ পাঠ করেন—'শিক্ষার মিলন'। এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই কবি বলিলেন—'এ কথা মান্‌তেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে।' মহাত্মার আহ্বানে সমস্ত দেশ যখন পশ্চিমী শক্তির শৃঙ্খলমোচনের আন্দোলনে উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে, দেশের ব্যবহারজীবীরা যখন কোর্ট-কাছারি পরিত্যাগ করিতেছেন এবং ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজ ছাড়িতেছে, তখন এই 'জলতরঙ্গ' রোধ করিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন দেশের শ্রেষ্ঠ কবি এই বাণী লইয়া—'আজকের দিনের পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে।' তিনি ইহাও বলিলেন যে পশ্চিমের এই আধিপত্যের কারণ তাহার বিপুল শক্তি যাহার ভিত্তি বৈজ্ঞানিক সাফল্য। অথচ এই কবিই একদিন লিখিয়াছিলেন :

'কোরো না কোরো না লজ্জা হে ভারতবাসী,
শক্তিমদমত্ত ওই বণিক বিলাসী
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সম্মুখে
সরল জীবনখানি করিতে বহন।'

অসহযোগ-অভ্যুত্থানের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে যখন ইংরেজের স্থাপিত স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন' স্থাপন করিলেন, তখন সেই জাতীয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কর্তব্য হইল কবির সহযোগিতার আহ্বানের প্রতিবাদ করা। এই প্রতিবাদের দায়িত্ব স্বভাবতঃই ন্যস্ত হয় শরৎচন্দ্রের উপর, সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁহার স্থান কবির অব্যবহিত পরেই। কবি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, পশ্চিমের জগৎ যে-শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে তাহা দানবশক্তি, কিন্তু তাহার বলে সে সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করিয়াছে। শরৎচন্দ্র উত্তরে বলিলেন, দানবশক্তির বলেই যে সে অন্য দেশকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়াছে, এই কথা

বিস্মৃত হইলে চলিবে না এবং পরাধীন দেশে বিদেশী প্রভু যে শিক্ষা দান করিয়াছে তাহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল স্বীয় প্রভুত্বকে কায়েমী করা। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন যে, উল্লিখিত সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করিতে যাইয়া কচকে দৈত্যদের কাছে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হইয়াছিল। বর্তমান যুগের সাম্রাজ্যবাদী শাসকও প্রজাকে শিক্ষাদানের ভান করিয়া শুধু পরস্বাপহরণের পথই প্রশস্ত করিয়াছে। সুতরাং আমাদের বিরোধিতা পশ্চিমী বিদ্যার বিরুদ্ধে নহে, সেই বিদ্যাবিতরণের দুরভিসন্ধিপ্রসূত, দুষ্ট পদ্ধতির বিরুদ্ধে।

শরৎচন্দ্র সাম্রাজ্যবাদীর শিক্ষাপ্রদান নীতির বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তির অবতারণা করেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসক সম্প্রদায় শাসিত 'দেশের সম্পদ্ অপহরণ করে এবং প্রজাপুঞ্জের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করে যে তাহার অক্ষম, অশিক্ষিত এবং তাহাদিগকে মানুষ করা শাসকদের দায়িত্ব ও দায়। এই ভাবে কুশিক্ষার মারফতে আমাদের আত্মসম্মানবোধও ক্ষুণ্ণ, অনেক ক্ষেত্রে লুপ্ত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বিশ্ববরেণ্য কবিও এই দোষ হইতে মুক্ত নহেন। কবি বলিয়াছিলেন, 'ইউরোপের কোন কোণে-কানাচে যাদুমন্ত্রের পরে বিশ্বাস কিছুমাত্র নেই এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু এ সম্বন্ধে সেঁকো বিষের প্রতি বিশ্বাস সেখানে প্রায় সর্ববাদিসম্মত। এই জন্যেই ওরা ইচ্ছা করলেই মারতে পারে এবং আমরা ইচ্ছা না করলেও মরতে পারি।' সাহেবদের কাছে এই জাতীয় মন্তব্য উপহার দেওয়ায় শরৎচন্দ্র কবিকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, ' "গোরা" বলে বাঙ্গালা সাহিত্যে একখানি অতি সুপ্রসিদ্ধ বই আছে ; কবি যদি একবার সেখানি পড়ে দেখেন ত দেখতে পাবেন তার একান্ত স্বদেশভক্ত গ্রন্থকার গোরার মুখ দিয়ে বলেছেন, "নিন্দা পাপ, মিথ্যা নিন্দা আরও পাপ এবং স্বদেশের মিথ্যা নিন্দার মত পাপ সংসারে অল্পই আছে।" '

শরৎচন্দ্র জোরালো যুক্তির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তখনকার দিনে শরৎচন্দ্রের এবং আমাদের দেশের অনেকেরই প্রধান ক্ষোভের কারণ ছিল যে, কবি ঐ বক্তৃতায় দেশের শত্রু, এদেশীয় ইংরেজ শাসকদের হাতে একটি অস্ত্র তুলিয়া ধরিয়া দিলেন। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, মহাত্মা গান্ধী যে আন্দোলনের সূচনা করিয়াছিলেন এবং যে আন্দোলনে দেশ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল সেই আন্দোলনে যদি কোন মৌলিক [illegible] তাহা হইলে [illegible] বিরুদ্ধে দেশকে সতর্ক করিয়া দেওয়ার

অধিকার ও দায়িত্ব নিশ্চয়ই দেশের শ্রেষ্ঠ কবির। রবীন্দ্রনাথ সেই দায়িত্ব অকুতোভয়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অর্ধ শতাব্দীর পরের ইতিহাস কবির আশঙ্কার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী পরে এবং অন্য প্রসঙ্গে যাহাই বলুন না কেন, তাঁহার অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যেই 'অংরেজি হটাও' বুলির বীজ নিহিত ছিল এবং তাহার ফল কোন দিক দিয়াই শুভ হয় নাই। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ইহা হইতেই ভাষাভিত্তিক রাজ্যবিভাগের নীতি গৃহীত হইয়াছে এবং তাহার ফলে উগ্র প্রাদেশিকতা নানা স্তরে মাথা তুলিয়াছে, হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের আশঙ্কায় নূতন গৃহযুদ্ধের আভাস পাওয়া যাইতেছে, নদীর জলবণ্টন লইয়া দেশের ভিতরেই যে সমস্যা দেখা দিয়াছে এবং কোন একটি সীমান্তবর্তী জায়গার জন্য যেরূপ কলহের সূচনা হইয়াছে তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, আমরা যেন এক অখণ্ড ভারতবর্ষের অধিবাসী নাহি। মনে হয়, মহাত্মাজী এক হাতে যাহা দান করিয়াছিলেন তাহাই যেন অন্য হাতে ফিরাইয়া লইতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই উগ্র, সংকীর্ণ স্বাদেশিকতা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাহার প্রভাবের বিরুদ্ধেই দেশকে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজ আমলে আমরা আপত্তি করিতাম শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় সরকার খুব সামান্য অর্থ ব্যয় করে; শিক্ষার মান সম্বন্ধে আমাদের তেমন সন্দেহ জাগে নাই। এখন স্বাধীন ভারতে সরকার শিক্ষার জন্য অকৃপণ হস্তে অর্থ ব্যয় করিতেছে, কিন্তু অন্ধ না হইলে কেহ অস্বীকার করিবে না যে, শিক্ষার পরিধির বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মানের অধোগতি হইয়াছে এবং তাহার প্রধান কারণ আমরা বিদেশীর প্রতি বিমুখ হইয়াছি বলিয়াই খাঁটি স্বদেশীও হইতে পারি নাই। সেই জন্যই আমরা শুধু যে ইচ্ছা না করিলেও মরিতে পারি তাহা নহে ইচ্ছা করিয়াই আত্মঘাতী হইতে চলিয়াছি।

আর একটি বিষয়ে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্র-পত্রিকার মারফৎ তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েন। এবার তর্কের বিষয়—সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। ১ ৩৪ (ইংরেজি ১৯২৭) সালের 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ধর্ম নিরূপণ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া একটি প্রবন্ধ লিখেন। আধুনিক সাহিত্যে অশ্লীলতা বা যৌনমিলনের নিরাভরণ চিত্রের আধিক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কবি বাস্তবের তথ্যানুগ চিত্র ও সাহিত্যের সৌন্দর্যের পার্থক্য নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করেন। ইহা লইয়া খানিকটা বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। কবির মত খণ্ডন করিয়া ঐ বৎসরের 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় শরৎচন্দ্র 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' নামে একটি প্রবন্ধ

প্রকাশ করেন। ইহা সুবিদিত যে, রবীন্দ্রনাথের মতে ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন মিটাইয়াও মানুষের যে উদ্বৃত্ত, অতিরিক্ত শক্তি থাকে তাহারই প্রকাশ হয় সাহিত্যে ও শিল্পে ; সেইখানেই মানুষের সৃজনী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, সেইখানেই সে দৈহিক জগৎকে অতিক্রম করিয়া মনোজগতে সঞ্চরণ করে এবং দেশকাল-অনালিঙ্গিত রসের আস্বাদ পায়। মানুষের আদিম প্রবৃত্তি বুভুক্ষা ও যৌনমিলনের আকাঙ্ক্ষা। দ্বিতীয় প্রবৃত্তিটি প্রজাসৃষ্টির গোড়ার কথা, কিন্তু ইহা মূলতঃ দৈহিক প্রয়োজন। যখন এই প্রয়োজন অতিক্রম করিয়া যৌন-প্রবৃত্তি প্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত হয়, তখনই ইহা সাহিত্য ও শিল্পের স্তরে উন্নীত হয়। যখন সাহিত্য নিরাবরণ যৌন আকাঙ্ক্ষাকেই প্রকাশ করে তখন তাহা রসের সৃষ্টি না করিয়া অশ্লীলতার আবর্জনার দ্বারা মনোজগৎকে ভারাক্রান্ত ও কলুষিত করে।

আধুনিক কালের প্রচারধর্মী সাহিত্যের রচয়িতারা এই যুক্তি গ্রহণ করেন না। ইঁহাদের একজনের কথা উল্লেখ করিলেই চলিবে। বার্নার্ডশ' বলিয়াছেন যে, যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা বর্তমান প্রয়োজনের জগতের কথাই বলিতে চাহিয়াছেন এবং সেই পথেই তাঁহাদের সৃষ্টি মানুষের চিরন্তন সম্পদে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা শাশ্বত কালের দিকে চাহিয়া বিষয়বস্তু খুঁজিয়াছেন তাঁহাদের রচনা আঁস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র এই পথ অবলম্বন করিয়া কবির যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন। তর্কযুদ্ধে কবির প্রধান অস্ত্র ও প্রধান দুর্বলতা—উপমার প্রাচুর্য এবং উপমাকে যুক্তি বলিয়া গ্রহণ করিবার ও করাইবার চেষ্টা। বহুকাল পূর্বে বন্ধু লোকেন পালিত কবিকে এই দুর্বলতার কথা বলিয়া থাকিবেন ; কারণ কবি পালিতকে লিখিয়াছিলেন, '......উপমার জালায় তুমি বোধ হয় অস্থির হয়ে উঠেছ। কিন্তু আমার এ প্রাচীন রোগটিও তোমার জানা আছে।......এরকম রচনাপ্রণালী অত্যন্ত বহুকেলে, মনের কথাকে সাক্ষাৎভাবে ব্যক্ত না করে প্রতিনিধি দ্বারা ব্যক্ত করা।'

প্রতিনিধির আশ্রয় গ্রহণ করার বিপদ এই যে, অপর পক্ষ পালটা প্রতিনিধি বা উপমা প্রয়োগ করিয়া পূর্ব-পক্ষকে পরিহাসাস্পদ করিতে পারে। শরৎচন্দ্র সেই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। কবি লিখিয়াছিলেন, 'সজনে ফুলের সৌন্দর্যের অভাব নেই। তবু ঋতুরাজের রাজ্যাভিষেকে কবিরা সজনে ফুলের নাম করেন না। ও যে আমাদের খাদ্য এই খর্বতায় কবির কাছেও সজনে আপনার ফুলের মর্য্যাদা হারিয়েছে।......ফুল আছে, উদর আছে, তাদেরও গন্ধ

নেই, তবু অলংকার মহলে তাদের দ্বার খোলা—কেন না পেটের ক্ষুধা তাদের গায়ে হাত দেয়নি।' কবি উপমার সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে পহুঁছিয়াছেন, শরৎচন্দ্র উল্টো রকমের উপমার মাধ্যমে এবং বিদ্রূপ ও শ্লেষের দ্বারা তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, 'কবির হঠাৎ চোখে পড়িয়াছে যে, সজিনা, বক, কুমড়া প্রভৃতি কয়েকটা ফুল কাব্যে স্থান পায় নাই।...রান্নাঘর তাহাদের জাত মারিয়াছে। তাই উদাহরণের জন্য ছুটিয়া গিয়াছেন গঙ্গাদেবীর বাহন মকরের কাছে। অথচ হাতের কাছে বাগ্দেবীর বাহন হাঁস খাইয়া যে মানুষে উজাড় করিয়া দিল, সে তাঁহার চোখে পড়িল না।.... তিল ফুলের সহিত নাসিকার, কদলী বৃক্ষের সহিত সুন্দরীর জানুর উপমা কাব্যে বিরল নহে। অথচ, সুপক্ক বর্তমান রম্ভার প্রতি বিতৃষ্ণার অপবাদ কোন কবির বিরুদ্ধেই শুনি নাই।'

এই তর্কে কাহারও যুক্তি অসত্য নহে, অথচ উভয়ের সিদ্ধান্তই একদেশদর্শী। প্রসঙ্গতঃ ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে, এই একদেশদর্শিতার মধ্য দিয়াই ইঁহাদের সাহিত্যসৃষ্টির পার্থক্যও উপলব্ধি করা যাইতে পারে। ইঁহাদের সাহিত্যের বিচার এই স্থানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে; শুধু বক্ষ্যমাণ বিতর্কের স্বরূপ নির্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। সাহিত্যের ভিত্তি ব্যবহারিক জীবন, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের বর্ণনা ও আলোচনা করা হয় ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, নীতিকথায় বা ধর্মশাস্ত্রে। এই লৌকিক জীবনের কথা যখন অ-লৌকিক ক্ষেত্রে উন্নীত হয়, তখনই তাহা সাহিত্য বা কাব্য বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করে। লৌকিক জীবনের ভিত্তি সুদৃঢ় না হইলে, কাব্য ও সাহিত্য অলীক কল্পনাজাল রচনা করিবে। আর যদি তাহা অ-লৌকিকে রূপান্তরিত না হয় তবে তাহা রসের জগতে অপাংক্তেয় হইবে। কোন না কোন উপায়ে সকল শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিকই লৌকিক ও অ-লৌকিকের সাহিত্য মানিয়া লইয়াছেন। আমাদের দেশে আনন্দবর্ধন ও অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন যে, অভিধা হইতে ব্যঞ্জনায় পরিক্রমণ করিয়াই আমরা শাস্ত্র-ইতিহাসাদির সমতল ভূমির সহিত সংযোগ রাখিয়া রসোপলব্ধির আকাশে সঞ্চরণ করিতে পারি। পাশ্চাত্য মনীষী অ্যারিস্টটল বলিয়াছেন যে, কাব্য জীবনের অনুকরণ করে, কিন্তু সে বাস্তবের অনুকরণ না করিয়া সম্ভাব্যের অনুকরণ করে এবং জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে অনিবার্যতার সূত্রে দিয়া গ্রথিত করে। কোলরিজ বলিয়াছেন, উপলব্ধি দুই প্রকারের—একটি প্রাথমিক (primary imagination); ইহা [illegible]

জানে ; আর একটি উপলব্ধি এই প্রাথমিক উপলব্ধিসঞ্জাত অভিজ্ঞতাকে ভাঙিয়া-চুরিয়া অলংকারে সাজাইয়া, যোগবিয়োগ করিয়া নবজন্ম দান করে। ইহারই নাম কবিপ্রতিভা।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আর দুইবার পত্রের মাধ্যমে সংযোগ হইয়াছিল। উভয় ক্ষেত্রেই নিজের রচনার বিষয়ে কবির কাছে প্রার্থনা লইয়া শরৎচন্দ্র উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং উভয়ত্র তিনি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে, কোন ক্ষেত্রেই কবির মত সমর্থনযোগ্য নয়।

'দেনা-পাওনা' উপন্যাসকে 'ষোড়শী' নাটকে রূপান্তরিত করিয়া শরৎচন্দ্র মতামতের জন্য রবীন্দ্রনাথকে একখণ্ড বই পাঠাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তদুত্তরে লিখিয়াছিলেন, 'ষোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে খুশি করতে চেয়েচ,⋯ ⋯ কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুন্ন করেচ। যে ষোড়শীকে এঁকেচ সে এখনকার কালের ফরমাসের মনগড়া জিনিস, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়।⋯⋯যে কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়াগাঁয়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারত সে এই কাহিনী নয়।' রবীন্দ্রনাথ যে ঠিক কি বলিতে চাহিয়াছেন তাহা শরৎচন্দ্র বুঝিতে পারেন নাই ; আমরাও পারিব বলিয়া মনে হয় না। এমনও হইতে পারে অস্পষ্টতা রহিয়াছে কবির চিন্তায় এবং সেই কারণেই তাঁহার ভাষাও অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হইয়াছে। তিনি উল্লিখিত চিঠিতেই বলিয়াছেন, 'সকল বড় সাহিত্যের যে পরিপ্রেক্ষিত পারস্পেকটিভ সেটা দূরব্যাপী, সেইটির সঙ্গে পরিমাণ রক্ষা করতে পারলে তবেই সাহিত্য টিঁকে যায়—⋯।' আবার পরে এই বিষয়েই অন্য চিঠিতে লিখিয়াছেন, 'তোমার নাটকে যে পারস্পেকটিভের কথা বলেছি, সে হচ্ছে নাটকের আখ্যানবস্তুগত। অর্থাৎ যে পল্লীগ্রামের মধ্যে যে বেষ্টনের মধ্যে সমস্ত ঘটনা স্থাপিত, তার ভাষায় চরিত্রে ব্যবহারে যথাযথ পরিমাণ সামঞ্জস্য রক্ষা হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস।' তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, শরৎচন্দ্র ষোড়শী ভৈরবীকে পল্লীগ্রামের তখনকার সময়ের সীমিত পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করিতে পারেন নাই আবার ইহাও তাঁহার অপরাধ যে তিনি এই কাহিনীকে দূরগত পারস্পেকটিভ দিতে পারেন নাই। এইরূপ পরস্পরবিরোধী দাবী কবির চিন্তার অস্পষ্টতারই সাক্ষ্য দেয়।

[illegible] একটা [illegible] পরিবেশের কাহিনী [illegible] ভাবে রচনা করা

যায়। ইংরেজি সাহিত্য হইতে দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা স্পষ্ট করা যাইতে পারে। থ্যাকারে হেনরি এস্মণ্ড উপন্যাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তদুপযোগী আখ্যানবস্তু গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই সময়কার ভাষা পর্যন্ত প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অপরদিকে, শেক্সপীয়র নিজের কালের উপযোগী করিয়া মধ্যযুগের চিত্র আঁকিয়াছেন—রাজা জন (*King John*) রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড (*Richard II*) প্রভৃতি নাটকে ; তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল নিজের কালের বাহবা পাওয়া। এস্মণ্ড ইংরেজি সাহিত্যে একটি সার্থক উপন্যাস, কিন্তু শেক্সপীয়রের নাটকের ব্যাপ্তি অনেক বেশি।

রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ ভৈরবীদের পরিবেশ বা জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এমন কথা কোথাও বলেন নাই। তাঁহার মন্তব্য অপরিচয়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই অস্পষ্ট। শরৎচন্দ্র এইরূপ একটি কাহিনী জানিতেন এবং তাহার ভিত্তিতেই 'দেনা-পাওনা' লিখিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের ভৈরবীর চিত্র বাস্তবানুগ কিনা সেই প্রশ্ন এখানে অবান্তর; কারণ শরৎচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস বা নাটক লিখিতে চেষ্টা করেন নাই। কবি শুধু শুধু এই প্রশ্ন তুলিয়াছেলেন বলিয়াই এত কথার অবতারণা।

ভৈরবী-প্রথার সঙ্গে পরিচিত না হইলেও দেবায়তনের মোহান্তের সঙ্গে আধুনিক কালেও আমাদের পরিচয় আছে। মোহান্তরা দেবায়তনের অধ্যক্ষ এবং সেখানকার পূজা-অর্চনা, উৎসবাদির পরিচালক। অনেক দেবায়তনের প্রচুর আয় হইত বা এখনও হয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন এখানেও সেই রকম, কোন কোন মোহান্ত জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসী, আবার কোন কোন মোহান্ত যে রক্ষিতা-বিলাসী ইহাও অজানা থাকে না। এই মোহান্তের জায়গায় সন্ন্যাসিনী ভৈরবীকে কল্পনা করিয়া লইতে বাধা নাই এবং এইরূপ কল্পনা করিতে পারিলে ভৈরবী বা অন্যান্য চরিত্র কেহই বেমানান হইবে না। ইহাতে বিষয়বস্তু ভৈরবী প্রথা নয়, ষোড়শী ও জীবানন্দের ব্যক্তিগত সমস্যা। আর সব কিছুই কাঠামো বা বহিরাবরণ মাত্র। সেই সমস্যা এবং এই দুই চরিত্র যদি পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তাহা হইলে পারস্পেকটিভের দূরত্ব বা নৈকট্যের প্রশ্ন উঠিবে না, আর তাহা যদি দীপ্যমান না হইয়া থাকে তাহা হইলে কোন পারস্পেকটিভই প্রাণসঞ্চার করিতে পারিবে না। রাজলক্ষ্মী যেমন শহরে বাইজীর প্রতিনিধিস্থানীয়া নহে, তেমনি ষোড়শী গ্রামীণ ভৈরবীর প্রতিনিধি নহে, যেমন শেক্সপীয়রের ইয়াগো রাইমারের পরিকল্পনানুযায়ী সৈনিকের প্রতিনিধি নয়।

দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথের ষোড়শী-সমালোচনা রাইমারের শেক্সপীয়র সমালোচনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয় !

আর একটা বিষয়ে যে ইঁহাদের মতের ও মনের অমিল হয় তাহা ব্যক্তিগত হইলেও তাহার সঙ্গে সাহিত্যের ও সাহিত্যিকের বৃহত্তর দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রশ্ন জড়িত আছে। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইলে তিনি কবিকে অনুরোধ করেন যে, কবি যেন এই আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন ; তাঁহার প্রতিবাদের বিশেষ সার্থকতা এই যে তাহা হইলে পৃথিবীর লোক জানিতে পারিবে যে, ইংরেজ গভর্নমেণ্ট কি ভাবে সাহিত্যের কণ্ঠরোধ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এবং এই প্রত্যাখ্যানের সপক্ষে যে যুক্তি দেখান তাহা তাঁহার কথা উদ্ধৃত করিয়াই বলা যাইতে পারে। কবি পত্রযোগে শরৎচন্দ্রকে লিখেন, 'বইখানি উত্তেজক। ·· লেখকের কর্তব্য হিসাবে সেটা দোষের না হতে পারে—কেননা লেখক যদি ইংরেজরাজকে গর্হণীয় মনে করেন তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু ·····ইংরেজরাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজরাজকে আমরা নিন্দা করব সেটাতে পৌরুষ নেই। ···· কিন্তু তাই 'বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে ? আমি তা বলি নে—শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে। যে কোন দেশে রাজশক্তিতে আর প্রজাশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেচে, সে এমনিই ঘটেচে······।' প্রসঙ্গক্রমে কবি ইংরেজশক্তিকে ধৈর্য ও সহনশীলতার জন্য সার্টিফিকেটও দিয়াছিলেন ; তাহা সত্য হইলেও সময়োচিত হইয়াছিল কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে।

কবি শরৎচন্দ্রের কর্তব্য এবং ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধতার যৌক্তিকতা সম্পর্কে অনেক কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে নীরব রহিয়াছেন। যুগে যুগে কি রাজনীতির ক্ষেত্রে কি অন্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহকে দমন করে কিন্তু বিদ্রোহের নৈতিক অধিকারও স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। ধর্মের ক্ষেত্রে এই বিদ্রোহ হইতেই প্রটেস্টান্টিজ্‌মের উৎপত্তি। তাহাও লুথারের লিখিত থীসিস হিসাবেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। আর এই অধিকার সর্বোপরি কবি ও সাহিত্যিকের, কারণ রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়ই বলা যাইতে পারে সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিত পারস্পেকটিভ দূরগত, প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকদের ভাষায়, দেশ-কাল-অনালিঙ্গিত। এই জন্যই স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী অরবিন্দকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছিলেন :

'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।'

পরে, অসহযোগ আন্দোলনের প্রাক্কালে ইংরেজ রাজশক্তির গর্হণীয় আচরণের প্রতিবাদে নাই-খেতাব বর্জন করিয়া তিনি সাহিত্যিকের কর্তব্য উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। বড়লাটকে সেই সময়ে তিনি যে দৃপ্ত পত্র লিখিয়াছেন তাহা সাহিত্যের সম্পদ্‌। যদি লেখক হিসাবে ইংরেজ রাজত্বের শোষণনীতির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করা শরৎচন্দ্রের কর্তব্য হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ লেখক হিসাবে সেই কার্যকে সমর্থন করা রবীন্দ্রনাথের আরও অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য ছিল এবং তাহা তিনি পালন করেন নাই। রাজশক্তি পশুশক্তি এবং সেই পশুশক্তি যে কি করিবে তাহা শরৎচন্দ্রের অপ্রত্যাশিত নয়। সেই বিষয়ে কবির বাগ্‌বিস্তার অবান্তর এবং তেমনি অবান্তর শরৎচন্দ্রের উপর সহিষ্ণুতা ও পৌরুষ সম্পর্কে উপদেশ-নিক্ষেপ।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উভয়েই প্রথম শ্রেণীর লেখক, কিন্তু এক ধরনের লেখক নহেন। ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই; কারণ মৌলিক সৃজনী প্রতিভার প্রথম ও প্রধান লক্ষণ অনন্যতা। এই কারণে ইঁহারা কখনও কখনও তর্কবিতর্কে জড়িত হইয়া পড়িবেন বা ইঁহাদের মতবিরোধ তীক্ষ্ণ অভিব্যক্তি পাইবে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। রবীন্দ্রনাথের তুলনায় তিনি অনেক ছোট একথা শরৎচন্দ্র বহুবার বহু জায়গায় বলিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র একাধিকবার কবির বিপক্ষে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ায় কবি সখেদে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, 'তুমি আমাকে বারবার তীব্র ভাষাতেই আক্রমণ করেছ—আমি কোন দিন তার প্রতিবাদ করিনি এবং কখনই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে নিন্দা করে তার শোধ তুলিনি।' এই অভিযোগ যে একেবারে নিরর্থক নয় শরৎচন্দ্র অনুতাপের সহিত তাহা স্বীকার করিয়া দিলীপকুমার রায়কে লিখিয়াছিলেন, '……কোন আক্রমণেরই প্রতিবাদ করিনে। যৌবনে এক আধটা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে করেছিলেম বটে কিন্তু সে আমার প্রকৃতি নয়, বিকৃতি। নানা হেতু থাকার জন্যেই হয়ত ভুল করে করেছিলাম।' রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রধান লক্ষণ বিস্তৃতি বা ব্যাপকতা, নোবেল পুরস্কারের ইতিহাস যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহারাও স্বীকার করিয়াছেন যে এই পুরস্কারবিজয়ীদের মধ্যে তাঁহার রচনার আবেদনই সবচেয়ে বেশি সার্বভৌমিক (universal)। এই লক্ষণ শরৎচন্দ্রই সবচেয়ে ভাল উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাই তিনি দেশবাসীর পক্ষ হইয়া কবির উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন, 'হাত পাতিয়া জগতের

কাছে আমরা নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।' অপর দিকে শরৎসাহিত্যের প্রধান গুণ বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটি ও বাঙ্গালীর হৃদয়ের সঙ্গে সূক্ষ্ম ও নিবিড় পরিচয়। এই কথাই রবীন্দ্রনাথ গদ্যে ও পদ্যে বলিয়া গিয়াছেন। তিনি এক অভিনন্দন সভার উপলক্ষে লিখিয়াছিলেন, 'জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মি-সমবায়ে গড়া নানা কক্ষপথে নানা বেগে আবর্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙ্গালীর হৃদয়রহস্যে। সুখে-দুঃখে মিলনে-বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন, বাঙ্গালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে।' ১৯৩৮ সালের ১৬ই জানুয়ারী শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তাহার দিন দশেক পরে, কবি একটি ছোট কবিতা লিখিয়া তাঁহার স্মৃতিতর্পণ করেন :

'যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি।'

এই বাণীর মধ্যেই শরৎসাহিত্যের মর্মকথা বিধৃত হইয়াছে।'

সাহিত্য

শরৎসাহিত্যের মর্মকথা

শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির আয়তন খুব বিপুল নহে। তিনি শুধু উপন্যাস এবং বড় ও ছোট গল্প লিখিয়াছেন। কবিতা লিখিতে পারিতেন এই কথা নিরুপমা দেবী প্রভৃতি বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাহার কোন পরিচয় রাখিয়া যান নাই। উপন্যাস ও গল্প যাহা লিখিয়াছেন তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের এই জাতীয় রচনা অপেক্ষা ওজনে ও সংখ্যায় ভারী; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্য-নাটক এবং উপন্যাস ও গল্পের তুলনায় হালকা। তাহা হইলেও প্রত্যক্ষতা ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়া শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি অনন্য। রবীন্দ্রনাথ অনেক গল্প লিখিয়াছেন কিন্তু তাহাদের মধ্যে বৈচিত্র্য অপেক্ষা সুরের ঐক্যই বেশি লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কেও সেই কথা আরও বেশি করিয়া খাটে। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির ক্ষেত্র সীমিত; তিনি বঙ্গের বাহিরে আরাকান ও বর্মার কথা কিছু কিছু লিখিয়াছেন এবং সব্যসাচীর সঙ্গে সুমিত্রার প্রথম দেখা হইয়াছিল সুমাত্রায়। তাহা হইলেও প্রধানতঃ তিনি বাঙ্গালী ও বাংলার সামাজিক চিত্রই আঁকিয়াছেন। কোথাও কোথাও অভিজাত শ্রেণী উঁকিঝুঁকি দিলেও, মধ্যবিত্ত, বিশেষ করিয়া নিম্নমধ্যবিত্ত এবং তাহারও নীচু স্তরের মানুষ তাঁহার গল্পে-উপন্যাসে ভিড় করিয়াছে, কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে অধিকাংশ চরিত্রই আপন বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল। চসারের গল্পে চরিত্রের প্রাচুর্য দেখিয়া ড্রাইডেন বলিয়া উঠিয়াছিলেন, '.....here is God's plenty'; এই বর্ণনা সমালোচকরা শেক্সপীয়রের সৃষ্ট জগৎ সম্পর্কে সমধিক প্রযোজ্য বলিয়া মনে করেন। বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া আধুনিক সাহিত্যে, যদি কাহারও রচনা পড়িয়া এই উক্তি মনে আসে তবে তিনি শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্র প্রধানতঃ নরনারীর প্রেমের কাহিনী লিখিয়াছেন এবং সেইখানে তিনি বহু নায়ক-নায়িকার সমাবেশ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই আছে যাহাদিগকে ব্যঙ্গরসিক রাজশেখরের ভাষায় বলা যাইতে পারে—সাধ্বী বারাঙ্গনা। কিন্তু এইরূপ সমালোচনায় শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের চরিত্রের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িবে না। উপেন্দ্রের স্ত্রী সুরবালা বা বিপ্রদাসের স্ত্রী সতীর অপেক্ষা সাধ্বী ও পতিগতপ্রাণা রমণীর চিত্র কোন ঔপন্যাসিক আঁকিতে পারেন নাই। অপর কোটিতে তিনি বারবনিতা বিজলী বাইজী ও চন্দ্রমুখীর মধ্যে বিশুদ্ধ প্রেমের

উন্মেষকে শিরোধার্য করিয়াছেন এবং সহানুভূতির সহিত পদস্খলিতা বিরাজ বৌ, অচলা এবং সবিতাকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। টগর বোষ্টমী, কামিনী বাড়িউলি, মোক্ষদা প্রভৃতির মধ্যে ভ্রষ্ট-চরিত্রার জীবনের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা যুগপৎ কৌতুক ও জুগুপ্সার সঞ্চার করে। সর্বাপেক্ষা তিনি বিধবা রাজলক্ষ্মী, রমা, সাবিত্রী প্রভৃতির যে মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক (সাইকো: এণ্ড এথিকেল) বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহার মধ্যে তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। আর অন্নদাদিদি ও অভয়াকে কোন সংজ্ঞার মধ্যেই ফেলা যাইবে না।

শরৎচন্দ্র একাধিকবার বলিয়াছেন যে, সাহিত্যে তিনি গুরুবাদ মানেন এবং তিনি রবীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি 'চোখের বালি', 'গোরা' প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয় কবি 'মেঘদূত'-কাব্যের যে অভিনব ও অপরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শরৎচন্দ্রের সৃজনী প্রতিভাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। কালিদাস বিরহের কাব্য লিখিলেও তাঁহার যক্ষের নিশ্চিত প্রত্যয় ছিল যে বৎসরান্তে তিনি প্রিয়ার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে পুনর্মিলিত হইবেন। এই দ্বিধাহীন বিশ্বাস কালিদাসের কাব্যকে একদিকে যেমন ঐশ্বর্য দান করিয়াছে অপরদিকে ইহার প্রতীয়মান অর্থকে সীমিত করিয়াছে। ইংরেজ কবি ম্যাথু আর্নল্ডের একটি কবিতার উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের মধ্যে অনতিক্রম্য বিরহের ব্যঞ্জনা দেখিতে পাইয়াছেন। এই ভাবে কালিদাসের কাব্য রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় পুনরুজ্জীবিত ও নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। কবির নিজের কথা উদ্ধৃত করিলেই তাঁহার বক্তব্য সুপরিস্ফুট হইবে এবং বর্তমান প্রসঙ্গেও তাহার তাৎপর্য স্পষ্ট হইবে। রবীন্দ্রনাথ 'মেঘদূত' প্রবন্ধে বলিয়াছেন, '—আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি সে আপনার মানসসরোবরের অগম তীরে বাস করিতেছে; সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই। আমিই বা কোথায় আর তুমিই বা কোথায়! মাঝখানে একেবারে অনন্ত, কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে!…এই চিরবিরহের কথা উল্লেখ করিয়া বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন: দুঁহু-কোলে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

আমরা প্রত্যেকে নির্জন গিরিশৃঙ্গে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া উত্তরমুখে চাহিয়া আছি—মাঝখানে আকাশ এবং মেঘ এবং সুন্দরী পৃথিবীর রেবা সিপ্রা অবন্তী

উজ্জয়িনী, সুখ সৌন্দর্য ভোগ ঐশ্বর্যের চিত্রলেখা—যাহাতে মনে করাইয়া দেয়, কাছে আনিয়া দেয় না—আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে, নিবৃত্তি করে না। দুটি মানুষের মধ্যে এতটা দূর !'

কালিদাস তাঁহার বিরহের কাব্যের পটভূমিতে স্থাপন করিয়াছিলেন দেবতা ও যক্ষের বিহারভূমি অলকা; মর্ত্যজগৎকে তিনি দেখিয়াছেন গগনবিহারী মেঘের দৃষ্টিতে। রবীন্দ্রনাথ সেই বর্ষব্যাপী বিরহের মধ্যে অনন্ত, অনপনেয় 'ব্যবধান' দেখিতে পাইয়াছেন। রোমান্টিক কল্পনার আতিশয্যে তিনি এই বিরহকে প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতার পরিবেশে বিশ্লেষণ করেন নাই। শরৎচন্দ্রের প্রধান মৌলিকতা এইখানেই যে, তিনি প্রাত্যহিক জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার মধ্য দিয়া মিলন ও বিচ্ছেদের নিবিড় সংসক্তির চিত্র আঁকিয়াছেন। এই ভাবেই তিনি এক অপরূপ, অভিনব ট্র্যাজেডি-সাহিত্য রচনা করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের এই ট্র্যাজেডির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার সময় অন্য এক শ্রেণীর গল্পের উল্লেখ করিতে হইবে—যেখানে মিলন সম্পূর্ণ ও সার্থক হইয়াছে। সেই সব কাহিনী সুখপাঠ্য, সুন্দর, কিন্তু তাহাদের মধ্যে শরৎচন্দ্রের প্রতিভার বিশিষ্ট ছাপটি নাই। এই জাতীয় গল্প হইল—'কোরেল', 'চন্দ্রনাথ' প্রভৃতি এবং এই শ্রেণীর সবচেয়ে সার্থক রচনা 'দত্তা'। এখানে নরনারীর মিলনে বাধা আসিয়াছে বাহির হইতে বা সাময়িক অভিমান হইতে, যাহা বাহিরের বাধারই সামিল; সেই বাধা অপসৃত হইলে মিলন সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। 'দুঁহু-কোলে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'—বিরহমিলনের এই অন্যোন্যসংসক্তি এই সব কাহিনীতে নাই।

প্রথম পর্ব

শরৎচন্দ্রের প্রতিভার মৌলিকতা সেইখানেই সমধিক অভিব্যক্তি পাইয়াছে যেখানে তিনি মিলনের মধ্যে অনন্ত বিরহ এবং তাহা হইতে মানব-হৃদয়ের গভীরতার তলদেশে এক সমাধানহীন সমস্যাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহা কবির স্বপ্ন নহে, বাস্তব জীবনের মধ্য দিয়া তিনি এই অন্তর্নিহিত রহস্যকে স্পষ্ট করিয়াছেন। এই সূত্র ধরিয়া শরৎপ্রতিভার পরিণতির ধারা লক্ষ্য করা যাইতে পারে, যদিও ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রতিভার অগ্রগতি সব সময় সময়ের পঞ্জী মানিয়া চলে না। শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনা 'কাশীনাথ' গল্প। অনুমান করা যায় ইহা তিনি দেবানন্দপুরে থাকিতেই আরম্ভ করিয়াছিলেন; হয়ত শেষ করিয়াছিলেন ভাগলপুরে আসিয়া। এই গল্পটির একটু ইতিহাস আছে; তাহা বিশদ করিয়া বলিলে ইহার সাহিত্যিক তাৎপর্য সমধিক স্পষ্ট হইবে। ইহা শরৎচন্দ্রের অনুমতি না লইয়া ১৯১৩ (বাং ১৩১৯-২০) সালে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'সাহিত্য'-পত্রিকায় ছাপেন। শরৎচন্দ্র ইহাতে ক্ষুণ্ণ হয়েন। তিনি ইহাকে অপরিণত রচনা বলিয়া মনে করিতেন। কলিকাতায় আসার পর স্বকীয় প্রবর্তনায়—এবং অনুরাগী কোন কোন পাঠকের চাপে পড়িয়া—তিনি ইহার ট্র্যাজিক পরিণতিকে বদলাইয়া নূতন রূপ দেন। স্রষ্টা অনেক সময় নিজের সৃষ্টির যোগ্য বিচারক নহেন। এই পরিবর্তন সেই পুরাতন সত্যই প্রমাণিত করে, কারণ শস্তা মিলনের প্রয়োজনে ট্র্যাজিক রস তরল হইয়া গিয়াছে। বর্তমান আলোচনায় 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত রূপকেই প্রামাণ্য বলিয়া ধরা হইবে।

'কাশীনাথ' গল্পের উপজীব্য স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। ধনী জমিদারের একমাত্র সন্তান, আদরে প্রতিপালিতা কন্যা কমলার বিবাহ হইল মাতুলালয়ে প্রতিপালিত দরিদ্র কাশীনাথের সঙ্গে। জমিদারের চক্ষে কাশীনাথের একমাত্র এবং অপরাজেয় গুণ—কৌলীন্য। সে স্বভাবতঃ উদাসীন প্রকৃতির; তারপর বাড়িয়া উঠিয়াছে অযত্নে পুষ্ট আগাছার মত। খুব স্নেহপ্রবণ হইলেও সে জমিদারবাড়ির বিলাসবহুল জটিল জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজেকে মানাইয়া লইতে পারিল না এবং সেই চেষ্টাও করিল না। উদ্ভিন্নযৌবনা স্ত্রী কমলা

প্রেমের সহস্রদলবিকসিত পদ্ম নিবেদন করিয়াও কাশীনাথের হৃদয়ে কোন সাড়া জাগাইতে পারিল না। কমলা দুঃখ করিয়া এই 'ব্যবধান'কে খুব সংক্ষেপে তাহার বাবাকে বুঝাইয়া বলিয়াছে, 'বাবা, আমরা যেন কেউ কারো নয়।' এই ব্যবধান ঘুচাইবার জন্যই সে পিতার সম্পত্তি নিজ হাতে গ্রহণ করিয়াছে এবং কাশীনাথকে বশে আনিবার উদ্দেশ্যেই একজন দক্ষ ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়াছে। কিন্তু কোন ফল হয় নাই; স্বামী-স্ত্রীর ব্যবধান একটুও কমে নাই। বোধ হয় দক্ষ ম্যানেজারবাবুর প্ররোচনায় একদিন কাশীনাথ অজ্ঞাত আততায়ীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কমলা সমস্ত বুঝিতে পারিয়া বিষপানে আত্মহত্যা করিল। প্রাণত্যাগ করিবার পূর্বে সে নূতন ম্যানেজারকে বরখাস্ত করিয়া অধিকাংশ সম্পত্তি ননদ বিন্দুবাসিনীর স্বামীর নামে উইল করিয়া দিল। এই দানের দ্বারা সে পিতার প্রাথমিক নির্দেশ এবং স্বামীর অকথিত ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ করিল। সে বিন্দুবাসিনীকে যে চিঠি লিখিয়া গেল তাহা উদ্ধারযোগ্য: 'বিন্দু, শুনিয়াছি আত্মহত্যা করিলে নরকে যায়। তাই আত্মহত্যা করিয়া দেখিতেছি, যদি নরকে যাই। আশীর্বাদ করি সুখী হও।' জীবনে যে ব্যবধানকে সে ঘুচাইতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছিল মৃত্যুর মধ্য দিয়া সেই ট্র্যাজেডিকে স্মরণীয় রূপ দান করিয়া গেল।

'কাশীনাথ' বইয়ের 'আলো ও ছায়া' গল্পটির উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের সবচেয়ে সুসংহত, নিটোল গল্প 'মন্দির'; ইহাকে কুন্তলীন পুরস্কার দিয়া জলধর সেন শুধু নিজের রসোপলব্ধির পরিচয় দেন নাই, সর্বকালের পরীক্ষক-মণ্ডলীর ইজ্জত বাঁচাইয়াছেন। এই গল্পের প্রধান কথা প্রীতির মধ্যে অনতিক্রম্য ব্যবধান। বোধ হয় প্রথম হইতেই শরৎচন্দ্রের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরক্তি ছিল; তাই তিনি ভক্তি ও প্রীতিকে একই পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। কায়স্থ জমিদার কন্যা এবং মদনমোহনের একনিষ্ঠ সেবিকা অপর্ণার বিবাহ হইল অমরনাথের সঙ্গে। কিন্তু মদনমোহন স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করিলেন। বৈধব্যের পর অপর্ণা মদনমোহনের সেবায় পুনরায় আত্মনিয়োগ করিল। কিন্তু যে হৃদয়কে জাগ্রত করিতে যাইয়া স্বামী অমরনাথ প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল সেই হৃদয়ই পুরোহিতপুত্র অসহায় শক্তিনাথের অজ্ঞতায় বিগলিত হইল এবং সেই অনুকম্পার মধ্যে যে সুপ্ত প্রেমের স্পর্শ ছিল তাহা অজ্ঞাতসারে অন্যমনস্ক শক্তিনাথের হৃদয়তন্ত্রীতেও আঘাত করিল। এবার মদনমোহন ও তাঁহার সেবিকার মধ্যবর্তী হইল এই অপটু শিল্পী; সেও

উপহার প্রত্যাখ্যানের আঘাত সহ্য করিতে পারিল না। অপর্ণা নিজেই এই মর্মান্তিক পরিণতির উপর যথাযোগ্য মন্তব্য করিয়াছে, 'ঠাকুর, এ কার পাপে? ·· ঠাকুর, আমি যা নিতে পারি নাই—তা তুমি নাও।' পরবর্তী কালে, শরৎচন্দ্র যখন চিত্রবিদ্যা শিখিয়া 'ছবি' গল্প লিখেন তখন তিনিই এই সংঘাতকে অন্যভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। বা-থিন ভগবান্ বুদ্ধের স্ত্রী দেবী গোপার চিত্র আঁকিবার বরাত পাইয়াছিল, কিন্তু তাহার ছবি প্রত্যাখ্যাত হইল, কারণ 'এত দিন এই প্রাণান্ত পরিশ্রম দ্বারা সে হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে যে সৌন্দর্য, যে মাধুর্য বাহিরে টানিয়া আনিয়াছে, দেবতার রূপে যে তাহাকে অহর্নিশি ছলনা করিয়াছে,—সে জাতকের গোপা নহে, সে তাহারই মা-শোয়ে।' শরৎচন্দ্রের এই গল্প দুইটি পড়িয়া স্বতঃই রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত পংক্তিগুলি মনে পড়ে :—

সত্য করি কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
... ...
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে!

'অনুপমার প্রেম' অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট, যদিও কোন কোন 'কল্পনাজীবী' সমালোচক ইহার মধ্যে আত্মজীবনীমূলক তাৎপর্যের সন্ধান করিয়াছেন। গল্পের অনেকখানি জায়গা জুড়িয়াছে অপরিপক্ক বয়সে নভেল নাটক পড়ার ফলে উদ্ভূত প্রেমাকাঙ্ক্ষার উপরে ব্যঙ্গ আর শেষের দিকে চমৎকার উৎপাদনের দ্বারা রসসঞ্চার করিবার চেষ্টা। কিন্তু শরৎপ্রতিভার ভবিষ্যৎ পরিণতির ইঙ্গিতও এই গল্পে আছে। ইহার অন্যতম প্রধান চরিত্র ললিতমোহন মদ্যপ, উচ্ছৃঙ্খল কিন্তু হৃদয়বান্। অনুপমার দাদা কৌশল করিয়া তাহাকে জেলে পুরিয়াছিলেন। কিন্তু চরম দুর্দিনে এই 'চরিত্রহীন' নায়কই নায়িকার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রথম পর্বের রচনার আলোচনা করিলে আর একটি চরিত্রের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 'শুভদা' গল্পের কাহিনী হারাণের পরিবারের দুঃখ-দুর্দশাকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। হারাণের চরিত্রের অভিনবত্বের প্রতি পূর্বেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। হারাণের রক্ষিতা কাত্যায়নী সম্পর্কে দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন। তরুণ লেখক তাহার উপরে কোন মহৎ আদর্শের আলোক সম্পাত করিতে চাহেন নাই। সে

সাধারণ বারবনিতা ; তাহার কলঙ্কিত, নিঃসঙ্গ জীবনে তাহার যে অর্থ ছাড়া অন্য কোন অবলম্বন নাই তাহা সে জানে এবং খুব রূঢ় ভাবেই সে হারাণকে তাহা শুনাইয়া দিয়াছে। কিন্তু তবু দুর্দিনে হারাণ তাহার নিকট দুই টাকা প্রার্থনা করিয়া দশ টাকা পাইয়াছে এবং হারাণকে প্রত্যাখ্যান করিলেও ঝড়জলের রাত্রিতে সে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে। ইহাই শরৎসাহিত্যের ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্দেশ করে। মনে রাখিতে হইবে নিরুপমা দেবীর 'অন্নপূর্ণার মন্দির' উপন্যাসে হারাণ ও কাত্যায়নীর অনুরূপ চরিত্র নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি গল্পের উল্লেখ করিতে হইবে। তাহার নাম 'বাল্য-স্মৃতি'। এই গল্প পড়িলে প্রথমেই বক্তার তথা গ্রন্থকারের হৃদয়ে নিপীড়িত পাচক গদাধর ঠাকুরের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেকের কথা মনে হইবে। কিন্তু শরৎ-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত হইয়াছে গদাধর ঠাকুরের আত্মসম্মানবোধের চিত্রে। সুকুমারবাবু তাহার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হইলেও একদিন বিনাদোষে তাহাকে নিগৃহীত করাইয়াছিল। সেই সুকুমারবাবুকে—খানিকটা ব্যঙ্গ করিবার জন্যই সে লিখিয়া গিয়াছিল যে, সেই চার টাকা চুরি করিয়াছে। তাহার মাহিনা হইতে আড়াই টাকা কাটা হইয়াছিল এবং পাঁচ মাস পরে দেড় টাকা মনি অর্ডার যোগে প্রেরণের মাধ্যমে এই গরীব ভৃত্যের সম্ভ্রমবোধ ধনী মনিবদের উপর যোগ্য প্রতিশোধ লইল। যে লেখক কৈশোরে এই গল্প লিখিয়াছিলেন তিনিই উত্তরকালে 'মহেশ', 'হরিলক্ষ্মী' প্রভৃতি লিখিয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এই প্রথম পর্বে শরৎচন্দ্র যে সমস্ত গল্প-উপন্যাস লিখেন তন্মধ্যে 'বড়দিদি' ও 'দেবদাস' সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, যদিও গ্রন্থকার নিজে ইহাদের সম্পর্কে খুব সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলেন। 'বড়দিদি' প্রকাশিত হওয়ার পর বঙ্গীয় পাঠকসমাজে কিরূপ সাড়া পড়িয়া যায় তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। 'দেবদাস' শুধু যে বাঙালী পাঠকসম্প্রদায়ের প্রিয় গ্রন্থ তাহা নহে, একাধিক অ-বাঙালী লেখকের রচনায় পড়িয়াছি যে ইহাই—বিশেষ করিয়া ছায়াচিত্রে ইহার রূপায়ণ—বঙ্গের বাহিরে শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তাকে বিশেষভাবে বর্ধিত করে। তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই দুইটি গ্রন্থে কাঁচা হাতের পরিচয়ও যথেষ্ট।

'বড়দিদি' মাধবী ও 'শিশু' সুরেন্দ্রনাথ যে ভাবে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট

হইয়াছে এবং যে ভাবে নিজেদের অলক্ষিতে এই আকর্ষণ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার চিত্র সূক্ষ্ম শিল্পকলার পরিচয় দেয়। তদানীন্তন কালের লেখকদের মধ্যে এক রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই এইরূপ ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ রচনা সম্ভব বলিয়া পাঠকরা মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু এই আকর্ষণের যে-পরিণতি দেখানো হইয়াছে তাহা অনিবার্য নয়। মনে হয় গ্রন্থকার আকস্মিক ঘটনার সাহায্যে চমৎকার উৎপাদন করিয়া মূল সমস্যা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন ইউরোপীয় নাটকে এক রকমের পরিহাসাস্পদ গোঁজামিলকে বলা হইত—যন্ত্র হইতে দেবতার আবির্ভাব (deus ex machina)। যখন কোন নাটকে দুরূহ সমস্যার উদ্ভব হইত তখনই (কোন কোন নাটকে) দেখা যাইত আকাশ হইতে রথে চড়িয়া কোন দেব বা দেবী রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া সেই সমস্যার সমাধান করিয়া দিতেছেন। শরৎচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন জলধর সেনের কোন একটি বইতে একজন লোককে সরাইয়া ফেলিবার প্রয়োজন হয়। অনন্যোপায় গ্রন্থকার তাহার সর্পাঘাতে মৃত্যুর ব্যবস্থা করিলেন। জলধরবাবুকে এই আকস্মিক মৃত্যু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে, তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, 'কেন, সাপের কামড়ে কি মানুষ মারা যায় না নাকি?' অন্যমনস্ক লোকে হঠাৎ জমিদারী পায়, পিতার মৃত্যুর পর এককালে সংসারের কর্ত্রী বালবিধবা পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুরগৃহে যাইতে বাধ্য হয়, অনুপস্থিত বা অক্ষম জমিদারের ম্যানেজার প্রজাদের উপর উৎপীড়ন করে—এই সকল ঘটনার কোনটিই অসম্ভব নহে। কিন্তু মাধবী-সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে যে সূক্ষ্ম, জটিল সমস্যা গড়িয়া উঠিয়াছিল এই সব ঘটনার মধ্য দিয়া তাহার পরিণতির যে ব্যবস্থা হইল শিল্পের দিক দিয়া তাহাকে সম্ভাব্য ও অপরিহার্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

'দেবদাস' উপন্যাসে দেবদাস ও পার্বতীর প্রণয়ের উন্মেষের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হিসাবে তাহা অনন্য। শুধু এক প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্য প্রণয়ের আলেখ্যের সঙ্গে তাহার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সেইখানেও শরৎচন্দ্রের মৌলিকতা সর্বত্র সুস্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র গার্হস্থ্য জীবনের চিত্রকে ঐতিহাসিক আলোড়নের অন্তর্ভুক্ত করিয়া কাহিনীকে বিশালতা দান করিয়াছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র কিশোর-কিশোরীর মন দেয়া-নেয়াকে গ্রাম্যজীবনের গচরাচরতার মধ্যে নিবদ্ধ রাখিয়া বাস্তব, পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র আঁকিতে পারিয়াছেন। শুধু পুঙ্খানুপুঙ্খতা নয়, এই বিশ্লেষণের অতলস্পর্শী গভীরতাও অতুলনীয়। মধ্য-

রাত্রে সুগভীর অন্ধকারে দেবদাসের সঙ্গে গোপনে দেখা করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া পার্বতী যখন বলিল, 'দেবদা, নদীতে কত জল। অত জলেও কি আমার কলঙ্ক চাপা পড়বে না?' তখন তরুণ লেখকের মনের গহনে প্রবেশ করিবার শক্তিতে এবং সংক্ষিপ্ত, ব্যঞ্জনাগর্ভ শব্দযোজনায় বিস্মিত হই।

এই উপন্যাসেও শেষার্ধে গ্রন্থকার চমৎকার উৎপাদন করিয়া সহজে শিল্পীর দায়িত্ব এড়াইতে চাহিয়াছেন। যে পার্বতী মনে করিয়াছিল দেবদাস তাহার সমস্ত লজ্জা ঢাকিয়া দিবে, সে-ই ক্ষুব্ধ অভিমানের বশে দেবদাসের বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজের লঘুচিত্তের পরিচয় দিল। দেবদাসের অধঃপতনের বর্ণনা এবং চন্দ্রমুখীর গৃহে তাহার আবির্ভাব—এই চিত্রে করুণ রস ও অদ্ভুত রসের যে মিশ্রণ হইয়াছে তাহা শিল্পকলার দিক দিয়া বিশ্বাসযোগ্য হয় নাই; ইহা মনে করিয়াই যেন গ্রন্থকার উপসংহারে পাঠকের কাছে চোখের জল ভিক্ষা করিয়াছেন। পার্বতীর বিবাহ হইল বিপত্নীক, পরিণতবয়স্ক জমিদার ভুবন চৌধুরীর সঙ্গে। এই বিবাহ খুব অদ্ভুত রকমের। ইহাতে অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি ছিল না, কিন্তু পার্বতী দেবদাসকেই স্বামী বলিয়া মনে করিত। অথচ ইচ্ছা করিলেই পার্বতী দেবদাসেরই স্ত্রী হইতে পারিত অথবা নদীর জলে কলঙ্ক চাপা দিতে পারিত। গ্রন্থকার বহু তথ্যের সমাবেশের দ্বারা এই বিচিত্র গৃহিণীপনার চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা জীবন্ত হইয়া উঠে নাই। এই প্রাণহীন, উদ্ভট দাম্পত্য জীবনের সঙ্গে লবঙ্গলতার কাহিনীর তুলনা করা যাইতে পারে। অল্প বয়সে লবঙ্গলতা ও অমরনাথ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল; তাহার পর বিপত্নীক রামসদয় মিত্রের সঙ্গে লবঙ্গলতার বিবাহ হয়। এই বিবাহকে সে সহজভাবেই গ্রহণ করিয়াছে; তাই অমরনাথ চোরের মত রাত্রিতে তাহার গৃহে প্রবেশ করিলে সে বিনা সঙ্কোচে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিল। অমরনাথের প্রতি আকর্ষণ যে তাহার হৃদয়ের গভীরতম তলদেশে বাসা বাঁধিয়াছিল ইহা সে বুঝিতেই পারে নাই। সুতরাং সে অনায়াসে রামসদয় মিত্রের গৃহে পত্নী ও কর্ত্রী হইতে পারিয়াছিল। অমরনাথের পুনরভ্যাগমে নিকষে কনক-রেখার মত পূর্ব আকর্ষণ জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠিল এবং সে তাহার সুগভীর দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হইয়া পরজন্মের উপর ভরসা রাখিয়া এই সঙ্কট হইতে মুক্তির সন্ধান খুঁজিল। এই চিত্র সম্ভাব্য, বিশ্বাস-যোগ্য এবং তড়িৎরেখার মত ইহা হৃদয়ের গুহাহিত রহস্যের উপর আলোক সম্পাত করে। 'রজনী' বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত বয়সের রচনা। অল্প বয়সে

লিখিত 'দেবদাস' সম্পর্কে শরৎচন্দ্র নিজেই খুব সঙ্কোচ বোধ করিতেন। ইহাদের তুলনা হয়ত খুব সঙ্গত হইল না, কিন্তু এইরূপ তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমেই সাহিত্যের রসবিচার সম্ভব।

'চন্দ্রনাথ' শরৎচন্দ্র লিখিয়াছিলেন ভাগলপুরে, কিন্তু ইহা প্রকাশ করিতে পাঠাইয়াছিলেন ব্রহ্মদেশ হইতে। প্রথম বয়সের কাঁচা লেখা সংশোধনের জন্য আনাইয়াছিলেন এবং তাঁহার কোন কোন চিঠি হইতে মনে হয় সংশোধন করিয়াই দুই কিস্তিতে তাহা প্রকাশের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। আবার প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকায় একবার লিখিয়াছিলেন যে তিনি বিশেষ কিছু পরিবর্তন করেন নাই। শরৎচন্দ্র নিজেই বলিয়াছিলেন যে ইহা 'সুমিষ্ট গল্প' অর্থাৎ ইহার অতিরিক্ত কোন মূল্য এই বইয়ের নাই। ইহা অনেকটা রূপকথার মত। যে গভীরতা, প্রত্যক্ষতা ও তীক্ষ্ণতা শরৎচন্দ্রের পরিণত রচনার প্রধান লক্ষণ তাহার চিহ্ন এখানে নাই বলিলেই চলে। কিন্তু দুইটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ বৃদ্ধ কৈলাসের চরিত্র। তিনিও অনেকটা রূপকথারই মানানসই; যেন বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি তিনি জীবনসায়াহ্নে পহুঁছিয়া সরযুকে আশ্রয় দিলেন এবং শিশু বিশুর মধ্যে তাঁহার হৃদয় আশ্রয় পাইল। কাশীতেই এই জাতীয় বৃদ্ধের দেখা মিলিতে পারে এবং বলা যাইতে পারে এখানে রূপকথার স্বপ্ন ও দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের সমন্বয় হইয়াছে। এই জাতীয় করুণ মধুর চরিত্রের সাক্ষাৎ শরৎসাহিত্যেই মিলে; প্রশংসার বিষয় এই যে কৈলাস খুড়োর আবির্ভাব হইতে তিরোধান পর্যন্ত সব কিছুই বিস্ময়কর, কিন্তু তাঁহার একটি কথা বা কাজও অসম্ভব বা অবিশাস্য বলিয়া মনে হয় না। এই রূপকথার আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বাংলার পল্লীসমাজের খণ্ড চিত্র। ইহার বাহিরের দিকে যতই শাসন-অনুশাসন, নিয়মশৃঙ্খলা থাক, ভিতরে ভিতরে কালোবাজারি চলে আবার সেই কালোবাজারকে নিয়ন্ত্রিত করেন সমাজপতিরা। চন্দ্রনাথের খুল্লতাত মণিশংকর স্পষ্ট করিয়াই ভাইপোকে বলিয়াছেন, 'যার অর্থ আছে, সেই সমাজপতি। আমি ইচ্ছা করলে তোমার জাত মারতে পারি, তুমি ইচ্ছা করলে আমার জাত মারতে পার।' শরৎচন্দ্র যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মধ্যে অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া আছে পাড়াগাঁয়ের পল্লীসমাজ। 'চন্দ্রনাথ' তাঁহার প্রথম দিকের রচনা; 'সুমিষ্ট গল্প' হইলেও ইহার পশ্চাৎপটে কঠোর বাস্তবের কালো ছায়া আবর্তিত হইয়াছে এবং সেইখানেই পরিণত রচনার পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয় পর্ব

১

উল্লিখিত উপন্যাস বড় গল্প ও ছোট গল্প প্রভৃতি আত্মীয় বন্ধুদের কাছে রাখিয়া শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশে পাড়ি দেন। ব্রহ্মদেশে যাওয়ার পূর্বে তিনি একখানি বড় উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। সেই অসমাপ্ত উপন্যাস 'চরিত্রহীন'। ইহার পাণ্ডুলিপি লইয়া তিনি ব্রহ্মদেশে পদার্পণ করেন। সেইখানে ইহা সমাপ্ত করিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। কিন্তু ১৯১২ সালে আগুন লাগার ফলে তাঁহার কাঠের বাসাবাড়ি পুড়িয়া যায়, সেই সঙ্গে এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিও পুড়িয়া যায়। তিনি 'শ্রীকান্ত'র ইংরেজি অনুবাদ উপলক্ষে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে মনে হয় তিনি অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপির প্রথমাংশ ব্রহ্মদেশে পুনরুদ্ধার করিয়া থাকিতে পারেন মাত্র, কারণ তিনি ঐ চিঠিতেই বলিয়াছিলেন যে, তিনি ভুলিয়াই গিয়াছিলেন যে এক সময়ে তিনি সাহিত্য অর্থাৎ গল্প-উপন্যাসাদি রচনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশে থাকাকালে 'চরিত্রহীন' অংশতঃ 'যমুনা'য় বাহির হইলেও মনে হয় ইহাকে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়াই সমাপ্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহার আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক হইবে না।

ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়া মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি ফণীন্দ্রনাথ পাল-সম্পাদিত 'যমুনা'র জন্য লিখিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েন এবং বর্মা হইতে 'রামের সুমতি' গল্পটি লিখিয়া পাঠান এবং তাহা ১৩১৯ (ইং ১৯১৩) সালে 'যমুনা'য় প্রকাশিত হয়। পরে ঐ পত্রিকায়ই আর দুইটি গল্প 'বিন্দুর ছেলে' ও 'পথনির্দেশ' প্রকাশিত হয়। লেখকরা অনেক সময় নিজেদের রচনার ঠিক মূল্যায়ন করিতে পারেন না। শরৎচন্দ্র মনে করিতেন যে 'পথনির্দেশ' এই তিনটি গল্পের মধ্যে সবচেয়ে ভাল। অপর দুইটি বাঙালী যৌথ পরিবারের কাহিনী; ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নাই। অপর দিকে, 'পথনির্দেশ' একটি গভীর সমস্যার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে এবং সেই হিসাবে অপর দুইটি গল্প অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। এই গল্পটি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে একটি সপ্রশংস চিঠি লিখিয়াছিলেন এবং তিনি ইহা পাইয়া উল্লসিত হইয়াছিলেন।

শরৎচন্দ্র বিধবার প্রেম লইয়া অনেক গল্প ও উপন্যাস লিখিয়াছেন। ইহা

শরৎসাহিত্যের একটি সুপরিচিত বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক কাহিনীতেই এই বিষয়টি প্রাধান্য পাইয়াছে। 'পথনির্দেশ' শরৎসাহিত্যে খুব বৈশিষ্ট্য দাবী করিতে পারে না। কিন্তু অন্য দুইটি গল্পে শরৎচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়াছেন। কাহারও পরিবার বলিতে বুঝা যায় সস্ত্রীক, সসন্তান কোন গৃহস্থের সংসার। তাহার মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থের সংযোগ বা সংঘাতের কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যৌথ পরিবারে একাধিক আত্মীয়ের পরিবার যুক্ত হইয়া একটি সংসারে পরিণত হয়। তাই তাহার মধ্যে যেমন ব্যাপকতা ও জটিলতা থাকে তেমনি সংঘাত এবং সহযোগিতা, স্বার্থান্বেষণ ও স্বার্থত্যাগের রঙবেরঙের বৈচিত্র্য দেখা যায়। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের কথা বলিতে পারি না, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের বাঙালী হিন্দু সমাজে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং সেই কারণেই বাংলা উপন্যাসে ইহার বহু বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের গল্প ও উপন্যাসে ইহার বৈচিত্র্য ও জটিলতা, মাধুর্য ও ক্রূরতার যেরূপ তীক্ষ্ণ ও সরস চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা অতুলনীয়। আজ সেই যৌথ পরিবার বিলীয়মান, তবু প্রধানতঃ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেই ইহা অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। 'রামের সুমতি' ও 'বিন্দুর ছেলে'তেই তিনি এই রচনার সূত্রপাত করেন, যদিও উভয় গল্পেই বিশেষ করিয়া 'বিন্দুর ছেলে'তে যৌথ পরিবার অপেক্ষা ব্যক্তিচরিত্রের রহস্যই উপজীব্য। পরবর্তীকালে লিখিত গল্প-উপন্যাসে যৌথ পরিবারের বৈশিষ্ট্য আরও বেশি উজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছে।

এই দুইটি গল্পে বিশেষ করিয়া 'রামের সুমতি'তে শরৎ-প্রতিভার আর একটি দিকের পরিচয় পাওয়া যায়, যাহা আরও বেশি বিস্ময়কর। ইহা শিশু চরিত্র অঙ্কনে তাঁহার নৈপুণ্য। বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কমলমণির শিশুপুত্র সতীশচন্দ্রকে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া মধুর রসের (সংস্কৃত আলংকারিকেরা শব্দের অপপ্রয়োগ মার্জনা করিবেন) কিঞ্চিৎ আস্বাদ দিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তাহা সার্থক হয় নাই। অনেকটা গ্রীক ট্র্যাজেডির প্যাটার্নে লিখিত এই উপন্যাসে অবান্তর বস্তুর স্থান করা মুশকিল। রবীন্দ্রনাথ শিশু সম্পর্কে অনেক কবিতা লিখিয়াছেন, তাঁহার গল্পে-উপন্যাসে মীনু হইতে আরম্ভ করিয়া সুচরিতার ছোট ভাই 'বক্তিয়ার' সতীশ পর্যন্ত একাধিক শিশুর চিত্র পাই, কিন্তু কোনটিই যেন সম্পূর্ণাঙ্গ নয়। সুকুমার রায় যে শিশুসাহিত্য রচনা করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। কিন্তু শিশুমন যে রস আস্বাদ করিবে তিনি তাহাই সৃষ্টি করিয়াছেন,

সেই হিসাবে বলা যাইতে পারে পরোক্ষভাবে তাহার মধ্যে শিশুর পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু শিশুর রসানুভূতির খোরাক জোগানো আর শিশুর অনন্যতার চিত্র আঁকা এক বস্তু নয়। আধুনিক কালে অবনীন্দ্রনাথের রচিত শিশুসাহিত্যের সুখ্যাতি শুনিয়া তাহা পড়িবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু বোধ হয় আমার অক্ষমতার জন্যই ইহার মধ্যে শিশু বা সাহিত্য কোনটিরই সন্ধান পাই নাই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এক পরশুরামের রটন্তীকুমার শরৎচন্দ্রের রাম বা ('দত্তা'র) পরেশ প্রভৃতির সঙ্গে তুলনীয়।

কথাটা স্পষ্ট করিতে হইলে সাহিত্যতত্ত্বের গোড়ার প্রশ্নে একটু প্রবেশ করিতে হইবে। সাহিত্য স্রষ্টার সৃষ্টি; সুতরাং সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টা থাকিবেন ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্ত্য নন্দনতাত্ত্বিকের ভাষায় বলা যাইতে পারে, সকল সৃষ্টিই লিরিক, অর্থাৎ লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। কিন্তু সীমিত ব্যক্তিত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারেন বলিয়াই কোন কোন ব্যক্তি সাহিত্যিক প্রতিভার দাবী করিতে পারেন, অর্থাৎ সৃজনী প্রতিভা মূলতঃ নাট্যধর্মী। এই জন্যই শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রচয়িতা (আধুনিক কালে ঔপন্যাসিক) নিজে খানিকটা বর্ণনা দিয়া পাত্রপাত্রীদিগকে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ করান, যাহাতে তাহারা স্রষ্টার কবল হইতে মুক্তি পাইয়া স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন কোন সমালোচক বলেন, প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার সৃষ্টি পরনির্ভর (relative) আর দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিভার সৃষ্টি স্বনির্ভর (absolute)। কবির সৃষ্টি নিজেরও নয়, অপরেরও নয়, তাহা অ-লৌকিক, কিন্তু কবির দৃষ্টি কখনও যোগীর দৃষ্টির মত স্বচ্ছ, প্রসারিত বা প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, কারণ তাঁহার নিজের ব্যক্তিত্ব রসদৃষ্টিকে সীমিত করিবেই তবুও ইহা মনে রাখিতে হইবে সৃষ্টি যতটা স্রষ্টার ব্যক্তিত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে সেই পরিমাণেই তাহা উৎকর্ষ লাভ করিবে।

শরৎচন্দ্রের একটি শিশুচরিত্রের বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে তাহা কেমন করিয়া আপন বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, কেমন করিয়া তাহার মধ্যে প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিতের সমাবেশ হইয়াছে। রামের দুরন্তপনার বহু দৃষ্টান্ত এই গল্পে দেখা গিয়াছে এবং প্রত্যেকটির মধ্যেই তাহার চরিত্রের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য অতর্কিতভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছে। মনে হয়, রাম যেন প্রতি পদে গ্রন্থকারের নির্দেশনা হইতে মুক্ত হইয়া আপন পথে অগ্রসর হইয়াছে। রামের প্রধান চেলা ভোলা; একা সে-ই রামের মনের খবর রাখে, রামের সমস্ত পাগলামির মধ্যে যোগ-সূত্র বাহির করিতে পারে। রামের প্রিয় দুই বিরাট রোহিত মাছ পুকুরে খেলা

করিয়া বেড়াইত ; ইহাদের নাম কার্তিক আর গণেশ। অপরের চোখে ইহারা একই রকমের, ইহাদের সূক্ষ্ম পার্থক্য—কোন্‌টি কার্তিক আর কোন্‌টি গণেশ—শুধু জানিত রাম আর হয়ত তাহার সাকৃরেদ ভোলা। রামকে জব্দ করিবার উৎসাহে দাদার শাশুড়ী দিগম্বরী জাল ফেলিয়া ইহাদের একটিকে ধরাইলেন—তাঁহার ব্রত সমাপনে ব্রাহ্মণ ভোজনের উদ্দেশ্যে। রাম বাগানে পিয়ারা খাইতেছিল ; ভোলা তাহার গতিবিধি সবই জানিত। সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, 'দেখবে এস দাঠাকুর ভগা তোমার কাত্তিককে মেরেচে।'… 'রাম ঝুপ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া দৌড়িল এবং ঝড়ের বেগে ছুটিয়া আসিয়া উঠানের মাঝখানে থমকিয়া দাঁড়াইয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো, এই ত আমার গণেশ"।' ইহার আগে পরে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার সূত্র নির্দেশ করা অসম্ভব নয়। কিন্তু ছায়ার মত যে ভোলা রামের সমস্ত কাজে তাহার অনুগামী, সেও যে কার্তিক আর গণেশের মধ্যে প্রভেদ ঠিক জানিবে না ইহা খুবই বিস্ময়কর, আবার ইহার মধ্যে বিস্ময়েরও কিছু নাই। কারণ ভোলা অপেক্ষা সে বেশি জানে এই আত্মাভিমান রামের চরিত্রের অন্যতম প্রধান উপাদান এবং পরম বিপর্যয়ের মধ্যেও সে তাহার পরিচয় দিল। এই সব ছোটখাটো কিন্তু সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়াই শরৎচন্দ্রের মৌলিকতা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

'রামের সুমতি'তে রামের চরিত্রই মুখ্য বিষয়বস্তু হইলেও শরৎচন্দ্র ইহাকে যৌথ পরিবারের কাঠামোর মধ্যে অতি নিপুণভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, যেন যৌথ পরিবারের ভাঙাগড়ার কাহিনী বলিবার জন্যই তিনি এই গল্প লিখিয়াছিলেন মানুষের মধ্যে ভাল ও মন্দ—বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'সুমতি' ও 'কুমতি'—উভয় প্রবৃত্তিই আছে এবং এই দুই রকমের প্রবৃত্তির তারতম্য অনুসারে ভালমন্দ ও মাঝারি ধরনের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। যৌথ পরিবার এই বিভিন্ন প্রবৃত্তির অপূর্ব লীলাক্ষেত্র। স্নেহ, প্রীতি, পরোপচিকীর্ষা, তিতিক্ষা, স্বার্থপরতা, ঈর্ষা, মাৎসর্য, ক্ষমতালিপ্সা—সকল প্রবৃত্তি এইখানে জায়গা পায় এবং প্রায় কোনটিকেই ঠিক কার্যকারণ বা প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের বাঁধাধরা নিয়মে পরিমাপ করা যায় না। রাজা লীয়রের মেয়েদের মধ্যে গণেরিল-রিগ্যানের অপচিকীর্ষার মতই কর্ডেলিয়ার মহত্বও রহস্যাবৃত। প্রবৃত্তির ধর্মই হইল ইহার স্বতঃস্ফূর্ততা। এই জন্যই শরৎচন্দ্র স্নেহ ও প্রীতির চিত্র আঁকিবার সময় সাধারণতঃ ব্যবধান রচনা করিয়াছেন ; ব্যবধানকে অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রকাশ করে বলিয়াই

ভালবাসা তাহার অপরাজেয় শক্তি প্রমাণ করে। শরৎচন্দ্রের প্রথম পারিবারিক গল্পই ইহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নারায়ণীর মাতৃস্নেহ উৎসারিত হইয়াছে মাতৃহীন দেবরের জন্য ; সে দেবরও স্বামীর সহোদর নহে, বৈমাত্র ভাই। সে রামের জন্য একটু বাড়াবাড়ি করিত আর স্বামী শ্যামলাল মনে করিয়াছিল নারায়ণীর নিজের সন্তান হইলে তাহা সংযত হইবে। কিন্তু দেখা গেল, নারায়ণীর হৃদয়ে দেবর রাম ও পুত্র গোবিন্দ পাশাপাশি জায়গা করিয়া লইল। তারপর রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন নারায়ণীর নিজের মাতা দিগম্বরী। এই ক্রূরস্বভাবা রমণীর মধ্যে মনুষ্যহৃদয়ের সেই আদিম অবিমিশ্র মাৎসর্যের ও প্রভুত্বলিপ্সার পরিচয় পাওয়া যায় যাহার সর্বাপেক্ষা অবিস্মরণীয় রূপ দেখিতে পাই শেক্সপীয়রের ইয়াগো চরিত্রে। শরৎচন্দ্র এই জাতীয় অনেক চরিত্র আঁকিয়াছেন, যদিও কোথাও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেন নাই বা গভীরতম রহস্যে যাইতে চেষ্টা করেন নাই। যৌথ পরিবারের ব্যাপক পটভূমিতে সব চরিত্রই জায়গা পায়, কোন চরিত্রই জায়গা জুড়িয়া বসে না। দিগম্বরীর মধ্যে ক্রূরতার ও নারায়ণীর স্নেহরসধারার যে আতিশয্য দেখিতে পাই তাহা পরস্পরের পরিপূরক এবং একে অপরকে বিশ্বাস্য করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের মাঝখানে রহিয়াছে শ্যামলাল, যে জাতীয় চরিত্র যৌথ পরিবারে খুব বেশি দেখা যায়। নানা স্রোতের টানে ইহারা নানা দিকে পরিচালিত হয় বলিয়া ইহারা স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারে না ; সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বের অভাবই ইহাদের ব্যক্তিত্বের প্রধান লক্ষণ।

শরৎচন্দ্রের জীবনে একটা বড় পরিবর্তন আসে ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে (বাংলা ১৩২৩, বৈশাখ) যখন তিনি কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু প্রথম দিকে সাহিত্যে এই পরিবর্তনের কোন প্রভাব দেখা যায় না। অনেক সময় মনে হয় বর্মায় যাহা আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাই কলিকাতায় আসিয়া শেষ করিয়াছিলেন অথবা ওখানে যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহা এখানে আসিয়া লিখিয়াছেন। তবু ক্রমপরিণতির ধারা দেখাইবার জন্য 'শ্রীকান্ত'র পূর্ববর্তী রচনাগুলিকে বর্মা পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে।

'রামের সুমতি'-ও 'বিন্দুর ছেলে'তে যৌথ পরিবারের বা একান্নবর্তী পরিবারের কাহিনী লিখিয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়া শরৎচন্দ্র সেই পথে অগ্রসর হইয়া 'বৈকুণ্ঠের উইল' লিখিলেন। ইহার মূল কথা বিমাতা ও সপত্নীপুত্রের মধ্যে গভীর স্নেহের সম্পর্ক। নানা ভাবে এই স্নেহের সম্পর্কের মধ্যে ব্যবধান রচিত

হইয়াছে ; পরে সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করিয়াছে বিমাতা ও সপত্নীপুত্রের দৃঢ় বন্ধন। কিন্তু যৌথ পরিবারের জটিলতা এখানে ততটা প্রাধান্য পায় নাই। গল্পের মুখ্য আকর্ষণ গোকুলের অদ্ভুত চরিত্র। সে লেখাপড়া শিখে নাই, তাহার বুদ্ধি প্রখর নহে, কিন্তু তাহার বুদ্ধিহীন সরলতার কাছে চক্রীর চক্র ব্যর্থ হইয়াছে এবং বিমাতা ও বৈমাত্র ভাইয়ের সঙ্গে জন্মগত ব্যবধান নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। তবু ইহাও মানিতে হইবে যে, এই জাতীয় চরিত্র উপন্যাস অপেক্ষা রূপকথায় বেশি মানানসই হয়।

বাঙালীর পারিবারিক কাহিনী লইয়া এই পর্বে শরৎচন্দ্র যে সকল গল্প লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে 'মেজদিদি' সর্বোৎকৃষ্ট। শরৎচন্দ্র এই সকল গল্পে বাস্তব-জীবনের নানা ছোটখাটো ঘটনার মধ্য দিয়া কাহিনী রচনা করেন ; সেই কারণে প্লটগুলি পরমাশ্চর্য তীক্ষ্নতা লাভ করে। কিন্তু এই ঘটনাগুলির উৎস যে সকল চরিত্র তাহারা মহত্ত্বে বা ক্রূরতায় অনন্যসাধারণ। আবার কয়েকটি গৌণ চরিত্র থাকে যাহারা দোষেগুণে আটপৌরে ধরনের। এই জাতীয় ঘটনার সমাবেশে এবং সাধারণ ও অসাধারণ চরিত্রের সম্মিলনের ফলে এই সকল গল্প একাধারে রোমান্স ও বাস্তব চিত্রের রসে সমৃদ্ধ হইয়াছে। নবীন ও বিপিন সহোদর ভাই, ইঁহারা পূর্বে একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত ছিলেন। কাহিনী যখন আরম্ভ হইয়াছে তখন ইঁহারা পৃথক হইয়া একই বাড়ির বিভিন্ন অংশে বসবাস করেন। বাঙালীর বহুরূপী যৌথ পরিবারের ইহাও এক রূপ ; দুই ভাইয়ের পরিবার পৃথক্‌ও বটে আবার সম্পৃক্তও বটে। বড়বৌ কাদম্বিনী ও মেজবৌ হেমাঙ্গিনী যেন গনেরিল ও কর্ডেলিয়া আর ইহাদের স্বামীরা খুবই সাধারণ চরিত্রের লোক এবং সাধারণ চরিত্রের লোকের মতই স্ত্রীর বাধ্য। দুই বৌয়ের মাঝখানে রহিয়াছে কাদম্বিনীর অসহায় বৈমাত্র ভ্রাতা কেষ্ট যাহাকে হেমাঙ্গিনী আশ্রয় দিয়া ভগিনী ও ভগিনীপতির অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছে। গ্রন্থকার স্পষ্ট ইঙ্গিতে দেখাইয়াছেন, এই স্বতঃস্ফূর্ত পরোপচিকীর্ষা হেমাঙ্গিনীর পক্ষে আকস্মিক নয়, ইহার পূর্বেও একান্ত মানবিক সহানুভূতির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া স্বামী বিপিনকে সে আরও দুই দুইবার হাঙ্গামায় ফেলিয়াছে, কিন্তু সে শেষ পর্যন্ত লড়িয়াছে। এবারও অপর পক্ষের অত্যাচার ও স্বামীর ঔদাসীন্য হইতে নিরুপায় কেষ্টকে সে উদ্ধার করিয়া তবে নিরস্ত হইয়াছে। আমরা অনুমান করিতে পারি যে দুই সংসারের বিরোধ তীব্রতর হইবে, বড়বৌ আর মেজবৌয়ের

কলহ আ[illegible] হইবে, কিন্তু কেষ্ট মেজদিদির মধ্যে তাহার হারানো মাকে পাকাপাকি ভাবে ফিরিয়া পাইয়াছে।

'পরিণীতা'য় যৌথ পরিবারের জটিলতা নাই। ইহা প্রধানতঃ একটি পরিবারের কাহিনী, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর দুইটি পরিবার জড়াইয়া গিয়াছে, ইহার জন্য কিছু গোলযোগ ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এই গল্পের মধুর ও বিস্ময়কর পরিসমাপ্তি বাস্তব সামাজিক চিত্র অপেক্ষা রূপকথার সঙ্গেই বেশি সাদৃশ্যযুক্ত। ইহা সুখপাঠ্য গল্প; ইহার মধ্যে শরৎপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত হয় নাই।

'পরিণীতা' প্রেমের গল্প। শেখর ও গিরীন উভয়েই ললিতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। শেখরের দিক দিয়া বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার পিতার অর্থ-লোলুপতা আর গিরীনের দিক দিয়া অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াছিল ধর্মমতের পার্থক্য। কিন্তু এই সকল বাহিরের বাধা অতিক্রম করিয়া শেখর ললিতার সঙ্গে গোপনে মালা বদল করিল এবং গিরীন তাহা জানিতে পারিয়া বিনা দ্বিধায় ললিতাকে ছাড়িয়া ললিতার মামাতো বোন আন্নাকালীকে বিবাহ করিল।

২

শরৎচন্দ্রের মৌলিক প্রতিভা সেই সব ক্ষেত্রেই সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছে যেখানে প্রেমের বাধা আসিয়াছে অন্তরের সংস্কার বা প্রবৃত্তি হইতে। ইহা খুব তীব্রভাবে প্রকট হইয়াছে ব্রহ্মদেশ হইতে প্রেরিত প্রথম গল্পসমষ্টির তৃতীয় গল্প 'পথনির্দেশ'-এ। এই কারণেই বোধহয় শরৎচন্দ্র ইহাকে 'বিন্দুর ছেলে' ও 'রামের সুমতি' হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। ইহা 'সাইকো' ও 'এথিক্যাল'। গুণী ও হেমের মিলনে অন্তরায় আসিয়াছে হেমের মনের নানা প্রবৃত্তির সংঘাত হইতে। সে গুণীনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু গুণী ব্রাহ্ম; সে নিজে তাহার মার হিন্দু সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে চায় না। তাহার হিন্দুমতে বিবাহ হইল, কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে তাহার মন বসিল না, সে মন বাঁধা রহিল গুণীনের কাছে। বিধবা হওয়ার পর সে গুণীর কাছে ফিরিয়া আসিল। বৈধব্য তাহার মনে বিশেষ কোন রেখাপাত করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তারপর শ্বশুরবাড়ি, কাশী ও গুণীর আশ্রয়—এই তিন জায়গায় আনাগোনা করিয়া শেষ পর্যন্ত সে

কাশীতেই চলিয়া গেল। গুণীর সংস্পর্শে আসিয়াই সে এমন [illegible] নির্দেশ পাইল যাহা তাহাকে দূরে চলিয়া যাইতে বাধ্য করিল। সে বুঝিতে পারিল, প্রকৃত প্রেম শুধু কাছে টানে না, দূরে ঠেলিয়া দিয়া ব্যবধানের সৃষ্টি করে; অতৃপ্ত বাসনাই মহৎ প্রেমের প্রাণ। ইহা শরৎচন্দ্রের পরবর্তী সার্থক রচনার প্রধান উপজীব্য। তবে এই গল্পে ইহার প্রকৃষ্ট রূপায়ণ হয় নাই, কারণ এখানে সাইকোলজি অপেক্ষা এথিকস প্রাধান্য পাইয়াছে অর্থাৎ ইহার মধ্যে বিশ্লেষণ অপেক্ষা বক্তৃতার আধিক্যে রসসৃষ্টি ব্যাহত হইয়াছে।

পল্লীসমাজ লইয়া লিখিত শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে নামকরা গ্রন্থ 'পল্লীসমাজ'। এক হিসাবে ইহাই ব্রহ্মদেশ হইতে লিখিত শেষ রচনা। আমরা আলোচনার খাতিরে শরৎচন্দ্রের গল্প ও উপন্যাসরচনাকে যে তিন ভাগে ভাগ করিয়াছি তাহা অনুসরণ করিলে বলা যাইতে পারে এইখানেই দ্বিতীয় পর্বের সমাপ্তি, কিন্তু এখানকার সূত্র ধরিয়াই তিনি তৃতীয় পর্বে উপনীত হয়েন। সেই তৃতীয় পর্বে তিনি শিবপুর, সামতাবেড় এবং কলিকাতায় বসবাস করিলেও মোটামুটিভাবে ইহাকে 'কলিকাতা পর্ব' বলা যাইতে পারে।

'পল্লীসমাজ' গ্রন্থাকারে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং ইহার বহু সংস্করণ হয়। পরে গ্রন্থকার ইহার নাট্যরূপ দেন এবং শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রযোজনায় নাট্যরূপও প্রশংসিত হয় এবং এক সময়ে ইহার ছায়াচিত্রও বহুল প্রচার লাভ করে। বইটি পাঠকদের ভাল লাগিয়াছে জানিয়া তিনি মুরলীধর বসুকে লিখেন, 'বাল্য এবং যৌবন কালটার অনেকখানি পাড়াগাঁয়েই আমার কাটিয়াছে। গ্রামকেই বড় ভালবাসি। তাই দূরে বসিয়াও যে দুই চারিটা কথা মনে পড়িয়াছে লিখিয়াছি···তারপরে প্রতিকারের উপায়?··· পরামর্শ দেওয়ার সাধ্য কি আমার আছে? সে অনেক শক্তি অনেক অভিজ্ঞতার কাজ। · তবুও মনের ঝোঁকে মাঝে মাঝে বলিয়া ফেলিয়াছি ত!'

'পল্লীসমাজ' খুব জনপ্রিয় হইলেও এবং গ্রামীণ সমাজের প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হইলেও ইহা প্রথম শ্রেণীর রচনা নয়। বেণী ঘোষাল, গোবিন্দ গাঙ্গুলি প্রভৃতি কয়েকটি চরিত্র চিত্রণে খানিকটা নৈপুণ্যের পরিচয় আছে এবং কোন কোন জায়গায় গ্রাম্য দলাদলির বর্ণনাও সজীব হইয়াছে। তবু ইহা কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চিত্রের সমষ্টি বলিয়া মনে হয়। এই খাপছাড়া ভাবটা নাট্যরূপে আরও বেশি ধরা পড়ে। শরৎচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন, 'যে দুই চারিটা কথা মনে পড়িয়াছে

লিখিয়াছি।' ইহার মধ্যে যে সামগ্রিকতা বা ঐক্যের অভাব আছে, অজ্ঞাতসারে যেন তাহাই তিনি এখানে স্বীকার করিয়াছেন। পরবর্তী কালে অনেক সময় ছোট ছোট চিত্র, দুই একটা টুকরো কথার মধ্য দিয়া পল্লী বাংলার যে চিত্র বিদ্যুৎ চমকের মত ঝল্‌সিয়া উঠিয়াছে তাহার অনুরূপ এখানে কিছু নাই। তারপর রমেশের চেষ্টা ও বিশ্বেশ্বরীর ভাষণের মধ্য দিয়া পল্লী উন্নয়নের যে প্রোগ্রাম দিয়াছেন তাহাও যেন একটু খাপছাড়া হইয়াছে। তিনি নিজেই হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখিয়াছিলেন, 'এ গল্পটা বেশ হওয়ার কোন আশা আমার ছিল না। কারণ প্রথম হইতেই ঠিক করিয়া বসিয়াছিলাম এসকল বস্তু প্রবন্ধ হইলেও হইতে পারিত।' বাস্তবিক পক্ষে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে স্বামী বজ্রানন্দের দেশসেবা উপন্যাসের অঙ্গ, কিন্তু এখানে রমেশ ও জ্যাঠাইমার দেশোদ্ধারের প্রোগ্রাম উপন্যাসে প্রবন্ধের অনধিকার প্রবেশ।

রমা ও রমেশের প্রেমের চিত্র সম্পর্কেও সেই কথা খাটে। বিধবার নিষিদ্ধ ব্যর্থ প্রেম শরৎসাহিত্যে নানা জায়গায় চিত্রিত হইয়াছে—ইহার বিশুদ্ধতা, জটিলতা, হৃদয়ের মধ্যে নানা ভাবের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার তিনি অনেক বিস্ময়কর চিত্র আঁকিয়াছেন, কিন্তু এখানে সেই বিষয়টি গৌণ বলিয়া তিনি ইহার রহস্য ও বৈচিত্র্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। ইহাকে ঠিক উপকাহিনীও বলা যায় না, আবার মূল কাহিনীতে ইহা আগন্তুক। শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মী, সতীশ-সাবিত্রী, অপর্ণা-শক্তিনাথ প্রভৃতির কথা চিন্তা করিলে—শরৎচন্দ্রের ভাষায়ই বলিতে হয়—এই কাহিনী 'ফ্যাকাশে' বলিয়া মনে হইবে। রমার তুলনায় রমার মাসী অনেক বেশি ঝাঁঝালো এবং জোরাল চরিত্র।

'পণ্ডিত মশাই' গল্পেও শরৎসাহিত্যের সেই বহু আবর্তিত প্রশ্নই পুনরুত্থাপিত হইয়াছে—বিধবার হৃদয়ে ধর্মবোধ ও প্রণয়াকাঙ্ক্ষার বিরোধ। বঙ্কিমচন্দ্রের মনোরমা ধর্মবোধকে তাচ্ছিল্য করিয়াছে, সরলা কুন্দ এই সমস্যায় প্রবেশ করিতে পারে নাই এবং 'সর্পী' হীরা ও রোহিণীর মনে ধর্মবোধ জাগ্রতই হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী প্রথমে সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বিজিগীষার দ্বারা চালিত হইয়াছিল, পরে এক অস্পষ্ট আদর্শবাদের দ্বারা তাহার হৃদয়াবেগ আচ্ছন্ন হইয়াছে। ছোট গল্প ছাড়িয়া শরৎচন্দ্র যখন 'পথনির্দেশ', 'পল্লীসমাজ', প্রভৃতি বড় গল্প এবং পরে উপন্যাসে এই সমস্যা উত্থাপন করিলেন তখন তিনি নারীহৃদয়ের গভীরতর স্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার স্বরূপ আবিষ্কার করিতে

চেষ্টা করিলেন। তাঁহার অপরিণত ও পরিণত রচনার মধ্যে পার্থক্য এই যে, শেষোক্ত ক্ষেত্রে বাহিরের শক্তি ক্রিয়াশীল হইলেও অন্তর্নিহিত নানা প্রবৃত্তি এবং যুক্তি ও বিবেচনার সংঘর্ষকে তিনি প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হেমনলিনী তাহার মায়ের ধর্মে বিশ্বাস করিত বলিয়া মনে হয় না, বরং সনাতন হিন্দুধর্ম ও আচারের প্রতি তাহার তাচ্ছিল্যই ছিল। কিন্তু যে সংস্কার তাহার নাই সেই সংস্কারের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই সে গুণীনকে গ্রহণ করে নাই। তাহার মনের যে দোলাচলবৃত্তি তাহা এই জন্যই কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়।

'পণ্ডিত মশাই' গল্পে শরৎচন্দ্র এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছেন। কুসুম ও বৃন্দাবনের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা আন্তরিক সংস্কার হইতেই উদ্ভূত। প্রারম্ভেই গ্রন্থকার বলিয়াছেন, পাঁচ বছর বয়সেই বোষ্টমের মেয়ে কুসুমের বিবাহ হয় বৃন্দাবনের সঙ্গে। কিন্তু দু বছর পরে কুসুমের মার কি একটা বদনাম শুনিয়া বৃন্দাবনের পিতা কুসুমকে ত্যাগ করিয়া ছেলের অন্যত্র বিবাহ দেন। কুসুমের মাও কুসুমকে অন্যত্র লইয়া গিয়া আর এক বোষ্টমের সঙ্গে কণ্ঠিবদল করাইয়া বিবাহ দেয়। কোথায় কি হইয়াছিল আর কেহই জানিত না এবং এই দ্বিতীয় বারের আসল বৈরাগীটি তথাকথিত কণ্ঠিবদলের ছয় মাস পরেই বৈকুণ্ঠে গমন করে। কাহিনী যখন আরম্ভ হইয়াছে তখন বৃন্দাবনের বাবা ও কুসুমের মা পরলোকগত, কুসুম বিধবার আচার পালন করে এবং বড় ভাইয়ের আশ্রয়ে থাকে। বৃন্দাবনও বিপত্নীক হইয়াছে; তাহার দ্বিতীয়া স্ত্রী একটি ছোট ছেলে রাখিয়া মারা গিয়াছে। বোষ্টম সমাজের রীতিনীতি অনুসারে বৃন্দাবন ও কুসুমের পুনর্মিলনে কোন বাধা ছিল না, যদিও তাহার জন্য সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইত। বৃন্দাবন আদর্শবাদী, সম্পন্ন গৃহস্থ। সে গ্রামের গরীব ছেলেদের জন্য অবৈতনিক পাঠশালা খুলিয়া তাহার পণ্ডিত মশাই হইয়া এবং অন্যান্য উপায়ে দেশসেবায় ব্রতী হইল। তাহার পিতা যাহাই করিয়া থাক্, কুসুমের প্রতি তাহার কর্তব্যবোধ ও অনুরাগ দুই-ই আছে। তাই সে কুসুমকে পাইবার জন্য আগ্রহী হইল এবং চেষ্টাও করিল। কুসুম এখন যুবতী; হাতের নোয়া ও সিঁথির সিঁদুর পরিত্যাগ করিলেও সেও বৃন্দাবনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিত। বৃন্দাবন যে শুধু তাহাকে দেখিবার জন্যই তাহাদের গ্রামে ঘোরাঘুরি করিত এই সম্পর্কে যে সচেতন ছিল।

সকল দিক দিয়া পুনর্মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলেও কুসুম কিন্তু টলিল না।

বোষ্টম হইলেও সে ব্রাহ্মণ মেয়েদের সঙ্গে মানুষ হইয়াছে, লেখাপড়া শিখিয়াছে, সেলাই শিখিয়াছে, সেই সমাজের সংস্কারই তাহার সংস্কার। এমতাবস্থায় ঘটা করিয়া তাহার সখী-সঙ্গিনীদের চোখের সামনেই আবার সিঁদুর পরিয়া সধবার জীবন আরম্ভ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে কুসুমের সঙ্গে বৃন্দাবনের মিলন ঘটিয়া গেল। এই কাণ্ডটি ঘটিল কুসুমের দাদা কুঞ্জনাথের নির্বুদ্ধিতা, সরলতা, আত্মাভিমান এবং আত্ম-অবিশ্বাসের ফলে। আকস্মিক ও স্বাভাবিক, প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিতের এই রকম সম্মিলন উচ্চাঙ্গের প্রতিভার পরিচয় দেয়। 'পণ্ডিত মশাই' মোটের উপর অপরিণত রচনা, কিন্তু এই অধ্যায়টি শেক্সপীয়রের নাটকে ডগবেরী ও ভার্জেস কর্তৃক আসামী ধরার দৃশ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

বৃন্দাবনের সঙ্গে কুসুমের যে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ হইল এবং সেই সংকটের মধ্যে পত্নীর সুপ্ত অধিকারলিপ্সা যে ভাবে জাগিয়া উঠিল তাহার পরে [illegible]হাদের মধ্যে মিলনে আর কোন বাধা রহিল না এবং বৃন্দাবনের মা তাহাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে আশীর্বাদ করিয়া এই মিলনকে পাকা করিয়া দিল। বৃন্দাবনের সঙ্গে সাক্ষাতে ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ফলে তাহার পূর্ব সংস্কার বিমথিত হইয়া গেল এবং সে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বৃন্দাবনের ধর্মপত্নী বলিয়া মনে করিল। অতি সূক্ষ্মভাবে একটি ছোট্ট উক্তির মধ্য দিয়া এই আমূল পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে। সে পূর্বে বিধবার আচারের অঙ্গ হিসাবে একাদশীর উপবাস করিত, কিন্তু এখন তাহা ছাড়িয়া দিল। পরের একদিন [illegible]তে বৃন্দাবন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আগে করতে, হঠাৎ ছাড়লে কেন?' কুসুম উত্ত্যক্ত হইয়া কহিল, 'করিনে আমার ইচ্ছে বলে। জেনে শুনে কেউ নিজের সর্বনাশ করতে চায় না সেই জন্যে।'

সেই প্রথম সাক্ষাতের পর বৃন্দাবনের পুত্র চরণ ইহাদের মধ্যে সংযোগের দ্বিতীয় সেতু নির্মাণ করিয়া দিল। কিন্তু তবু কুসুম অনমনীয় রহিয়া গেল। বাধা সৃষ্টি করিল অভিমান, বাহিরের লজ্জা—যাহার ভিত্তি অতিশয় শিথিল। পরে জানা গেল, যে কণ্ঠিবদলের জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া সে বিধবার আচরণ পালন করিয়াছিল সেই কণ্ঠিবদলই নাকি হয় নাই, অর্থাৎ সে আগাগোড়াই বৃন্দাবনের স্ত্রী এবং ব্রাহ্মণবালিকাদের সাহচর্যে যে আচার সে পালন করিত তাহা একেবারে[illegible]ক। হয়ত এই কথা জানাইতেই বৃন্দাবন একদিন [illegible] বাড়ি[illegible]। শুধু তাহার সামান্য বিচার-

বিভ্রমের জন্যই বৃন্দাবন সব কথা স্পষ্ট করিয়া মিলনের পথ প্রশস্ত করিতে পারে নাই। তারপর চরণের মৃত্যুর পর যখন সমস্ত কুয়াশা কাটিয়া গেল তখন উভয়েই মিলিতভাবে সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরিপূর্ণ বৈরাগীর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পথে বাহির হইয়া গেল।

সামান্য বোঝার ভুল বা তুচ্ছ মান-অভিমানে যে ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হইতে পারে না তাহা নহে। অ্যারিস্টটল তো hamartia অর্থাৎ সামান্য চারিত্রিক ত্রুটি বা সামান্য বিচারবিভ্রমকে ট্র্যাজেডির ভিত্তি করিয়াছেন। তিনি রাজা ঈদিপাস নাটকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা নির্ণয় করিয়াছিলেন। সেই ট্র্যাজেডিতে সবাই ছোটখাটো ভুল করিয়াছে এবং সেই ভুল বোঝাবুঝিতে মিলিয়া এমন জটিল জাল রচিত হইয়াছে যাহার সন্ধান শুধু দেবতারাই রাখিতে পারেন; মানুষ তাঁহাদের ক্ষুদ্র ক্রীড়নক মাত্র। শেক্সপীয়রের ওথেলোতে ডেসডিমোনা সামান্য ভুল করিয়া রুমাল হারাইয়া যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করিল তাহাই ট্র্যাজেডিকে অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে কতকগুলি তুচ্ছ ঘটনা, তুচ্ছ ত্রুটিবিচ্যুতি গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের জীবনে অনর্থের সৃষ্টি করিয়া দিল। 'সাহিত্য-কথা' প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই তুচ্ছ ঘটনাবলীর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তবু এই সমস্ত গ্রন্থে ছোট ছোট ঘটনা চরিত্রের গভীর, অপ্রতিরোধনীয় প্রবৃত্তির সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু 'পণ্ডিত মশাই' উপন্যাসে প্লটের সংসক্তি বা চরিত্রের গভীরতম তলদেশে অবগাহনের কোন পরিচয় নাই। যদি প্রথম সাক্ষাৎ ও একত্র খাওয়া-দাওয়ার পরই ইহাদের মিলনের মধ্যে গল্পের উপসংহার হইত তাহা হইলে গ্রন্থের ভারসাম্য নষ্ট হইত; আদি ও মধ্য পর্বের তুলনায় অন্ত্য পর্ব অতিশয় ছোট হইয়া পড়িত। বোধ হয় সেই জন্যই নানা ঘটনার সন্নিবেশ করিয়া গ্রন্থকার এই শেষাংশকে বড় করিয়াছেন। কিন্তু এই পর্বের অনেকটাই অবান্তর; বৃন্দাবন ও কুসুমের মন দেয়া-নেয়ার সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক অনেকটা ভাসা-ভাসা। চরণের মৃত্যুও এই সমস্যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয়। বাহিরের ঘটনা ও অন্তরের আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে মৌলিক সম্পর্ক না থাকায় এই কাহিনী শুধু শরৎপ্রতিভার বৈশিষ্ট্যের আভাস দেয়, তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে পারে না।

কুলভ্রষ্টা, কিন্তু অসতী নয়। এই সময়েই তিনি 'চরিত্রহীন' রচনা করিয়াছিলেন, তাহার অন্যতম প্রধান চরিত্র কিরণময়ী। সে স্বামীর গৃহে থাকিয়াই মুমূর্ষু স্বামীর চিকিৎসকের প্রেমনিবেদনে সাড়া দিয়া নিজের প্রেমতৃষ্ণা মিটাইতে চাহিয়াছে, পরে স্বামীর বন্ধু উপেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, তারপর স্বামীকে ভালবাসিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিরণময়ী সকল দিক দিয়া এত অনন্য যে তাহাকে কুলত্যাগিনী সধবার পর্যায়ে ফেলিয়া অন্য কোন রমণীর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। কিছুদিন পরে শরৎচন্দ্র 'স্বামী' গল্পে সধবা সৌদামিনীর পূর্ব-[illegible]রেনের সঙ্গে পলায়ন ও পরে স্বামিগৃহে প্রত্যাবর্তনের কথা লিখিয়াছেন। [illegible]ই গল্পেও তিনি সৌদামিনীর গৃহত্যাগ অপেক্ষা [illegible] সহিষ্ণুতা [illegible]লতাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। বোধ হয় [illegible]ন্ধু এই [illegible]নাম রাখিয়াছিলেন 'স্বামী'। শরৎচন্দ্রের শে[illegible]পন্যাস 'শেষের পরিচয়'—ইহার নায়িকা সবিতাও পতিভক্তিপরা[illegible]ী।

শরৎচন্দ্র নিজের উপন্যাস সম্পর্কে দাবী করিয়াছেন যে ই[illegible]কো অ্যাণ্ড এথিক্যাল', অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক ও নীতিসম্মত। সকল রকমের সার্থক সাহিত্যেরই একটি গুণ এই যে তাহা আমাদের সহানুভূতিকে প্রসারিত করে। সেই দিক হইতে বিচার করিলে ইহারা যে এথিক্যাল তাহা মানিয়া লইতে পারি, কিন্তু ইহারা কি মনস্তত্ত্বসঙ্গত অর্থাৎ ইহাদের স্বামিত্যাগ কি বিশ্বাসযোগ্য? শেষ জীবনে শরৎচন্দ্র যেন নিজেই এই জিজ্ঞাসার উত্তর পান নাই। সঙ্গিনী সারদার প্রশ্নের উত্তরে সবিতা বলিয়াছে, 'পদস্খলনের কি কেন থাকে সারদা? ও ঘটে আচমকা সম্পূর্ণ নিরর্থকতায়।' একথা মানিলে কিন্তু মনস্তত্ত্বকে [illegible] দিতে হয়। 'শেষের পরিচয়' শরৎচন্দ্র নিজে কি ভাবে শেষ করি[illegible] এই শি[illegible]ার ব্যঞ্জনা কি তাহা বলিতে পারি না; কাজেই [illegible]ভূত আ[illegible]না না করাই ভাল। এই প্রশ্ন যে তাঁহার চিন্তা ও [illegible]দিন [illegible]ত করিয়াছিল সবিতা-সারদার কথোপকথন তাহার[illegible]

[illegible]জ বৌ'-এর পদস্খলন লইয়া প্রথম হইতেই আপত্তি উঠি[illegible]। এক [illegible] যাইতে পারে, কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্বার্থপরতার ফলে যৌথ[illegible]বারে [illegible]লোক কুটুম্বের দাবী মিটাইতে কন্যাদায়গ্রস্ত অভিভা[illegible] নিঃস্ব হওয়া, দারিদ্র্যের নিপীড়ন, আর্থিক অসচ্ছলতা, মানসিক অশা[illegible] ঘোর ইত্যাদি কারণে স্বামীর ক্ষণিক দুর্ব্যবহার—এই সমস্ত বাহিরের কারণ দিয়াই কি বিরাজ বৌ-এর পদস্খলনের যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া যায়? প্রমথনাথ

ভট্টাচার্যকে লেখা চিঠি হইতে মনে হয় ঔপন্যাসিক প্রভাত মুখোপাধ্যা[illegible] আপত্তি তুলিয়াছিলেন। এই আপত্তি শিরোধার্য করিয়া শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশে থাকিতেই একটি নূতন উপন্যাস লিখিতে শুরু করেন, যেখানে শুধু মনস্তত্ত্বের দিক দিয়াই সধবার পদস্খলনের সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। ইহার নাম 'গৃহদাহ'। তিনি নিজে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃতিযোগ্য : 'বিরাজ বৌ লিখে অনেকটা জ্ঞান হয়েছে। ভায়া, এবারে আর ফাঁদে পা শীগগীর দিচ্ছি না। এমন করে এবার থেকে আট-ঘাট বেঁধে লিখব যেন, প্রভাত বাবুও দোষ খুঁজে না পান। ····· একটা বড় [illegible] "গৃহদাহ" নাম দিয়ে খানিকটা লিখেছি—····· বিরাজ বৌ নিয়ে [illegible] খুঁৎ পেয়েই হৈ চৈ ক'রে নিন্দে করবার সুযোগ পেলে—[illegible]ধ্যমত দিচ্ছি না।'

এই চি[illegible]দিক দিয়া স্মরণীয়। 'গৃহদাহ' শরৎচন্দ্রের পরিণত প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান[illegible]। কিন্তু ইহার সূত্র রহিয়াছে অপেক্ষাকৃত অপরিণত 'বিরাজ বৌ'-এ এবং তাহারও আগে কুলত্যাগিনী নারীদের বিষয়ে গবেষণায়। এই সূত্র ধরিয়া শরৎ[illegible]র অগ্রগতির ধারা চিহ্নিত করা যাইতে পারে। 'গৃহদাহ' ১৯১৪ সালে [illegible] আরম্ভ করিলেও তিনি ইহা শেষ করিয়াছেন বছর তিনেক পরে—[illegible]তা পর্বে। সেই পর্বের আলোচনায় ইহার পুনরুল্লেখ করা হইবে। এ[illegible]টি কথা বলা প্রয়োজন। শরৎচন্দ্র যাহাকে 'বিরাজ বৌ'-এর 'ঐটুকু খুঁৎ ব[illegible]য়াছেন তাহা মারাত্মক দোষ, কারণ ঐ দোষের জন্য গ্রন্থের মূলীভূত বিষয়—সতী নারীর ধর্মচ্যুতি—মনস্তত্ত্বসম্মত হয় নাই।

বিরাজ বৌ কুলত্যাগিনী হইলেও তাহাকে কুলটা বলা যায় না। যাহারা দেহোপজী[illegible]দের চরিত্রচিত্রণেও শরৎচন্দ্র প্রথম হইতেই দক্ষতা দেখাই[illegible] 'শুভদা'র কাত্যায়নীর কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 'দেবদা[illegible]; সেইখানেও বারবনিতা চন্দ্রমুখীর সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু [illegible]র্শে আসার পর তাহার শুদ্ধ পরিস্নাত মূর্তির মধ্যে বারবনিতার [illegible] চিহ্নমাত্র নাই। এই দিক দিয়া দ্বিতীয় পর্বে লিখিত 'আঁধারে [illegible] বেশি জটিল ও মর্মস্পর্শী।

এই গল্পের বিজ[illegible] প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া উঠিলে সিক্তবসনা মোহিনী মূর্তি দেখিয়া যুবক সত্যেন্দ্রনাথ অভিভূত হইয়াছিল। ইহার গঙ্গাস্নানও মনে হয় দ্বিবিধ-উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রক্রিয়া। রাত্রিতে যে পাপ কুড়াইত,

[illegible] গঙ্গায় অবগাহন করিয়া সে হয়ত তাহা ক্ষালন করিতে চাহিত। আর সে ইহাও জানিত যে প্রাতঃকালে শুভ্র সিক্ত বসনে তাহার রূপ পুরুষের চোখে অপ্রতিরোধনীয় আকর্ষণ সঞ্চার করিবে। যাহা হউক অল্প পরিসরের মধ্যে শরৎচন্দ্র তাহার লাস্যময়ী বারাঙ্গনার জীবন এবং সত্যেন্দ্রের সংস্পর্শে আসার ফলে সেই জীবনের ছেদ এবং প্রেমময়ী, স্নেহময়ী, ত্যাগের প্রতিমূর্তি নারীর অভ্যুদয়ের চিত্র আঁকিয়াছেন। তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, বিজলী-বাই-এর আঁধার হইতে আলোতে যে বিবর্তন এই গল্পে চিত্রিত হইয়াছে তাহা চমকপ্রদ ও বর্ণাঢ্য হইলেও ছোট গল্পের সীমিত পরিস[illegible] উপযোগী নয়। দীর্ঘ উপন্যাসে এই জাতীয় পরিবর্তনের প্রত্যেকটি প[illegible] পারিত। পিয়ারী বাইজীর মধ্যে রাজলক্ষ্মী সব সময়ই আত্মরক্ষা ক[illegible]তরাং তুলনা হয়ত খুব সঙ্গত হইবে না। তবু অতিশয় সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে[illegible] দিয়া রাজলক্ষ্মী ও পিয়ারীর সহ-অবস্থান চিত্রিত হইয়াছে এবং যখন পিয়ারী নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়াছে তখন রাজলক্ষ্মীর জীবনে আবার নূতন জটিলতার উদ্ভব হইয়াছে। প্রেমের এই দুর্ভেদ্য জটিলতা ও দুরবগাহ রহস্যই শ[illegible] রচনার প্রধান গুণ। এই পথেই তিনি মানবজীবনের গভীরতম সত্যের স[illegible]রিয়াছেন।

তৃতীয় পর্ব—১

শ্রীকান্ত

১

শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশে থাকিতেই 'শ্রীকান্ত' লিখিতে শুরু করেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ইহার প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালের গোড়ার দিকে (মাঘ ১৩২২) এবং ইহার চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয় সতের বৎসর পর ১৯৩৩ সালে। দীর্ঘকাল ব্যবধানে লিখিত হইলেও ইহার আপাতবিশৃঙ্খল কাহিনীর মধ্যে ঐক্য [illegible]য় রহিয়াছে। শুধু চতুর্থ পর্বের আরম্ভে কোন নূতনত্ব নাই এবং রাজলক্ষ্মী [illegible]ললতার মধ্যে সংযোগ একটু কৃত্রিম। প্রথম পর্ব যখন আরম্ভ হইয়াছে [illegible] শ্রীকান্তের বয়স বছর বারোর বেশি হইবে না, আর চতুর্থ পর্বের প্রারম্ভে [illegible] রাজলক্ষ্মীর বয়স সাতাশ এবং সে লিখিতেছে যে শ্রীকান্ত তাহার অপেক্ষা বছর চারেকের বড়। মনে করা যাইতে পারে যে এই গ্রন্থে দুই দশকের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। স্থানের দিক দিয়া বিস্তৃতিও অনুরূপ। শুরু হইয়াছে বঙ্গের বাহিরে এক শহরে, তার পর বিহারের বিঠোরা গ্রাম পার হইয়া পাটনায় [illegible]ছিয়াছে—তারপর সুদূর বর্মায়। ব্রহ্মদেশ হইতে আবার চলিয়া আসিয়াছে [illegible]ার পল্লীতে—আবার পাটনায়। তারপর চলিয়া গিয়াছে বীরভূমের অজ [illegible]গাঁয়ে। ইহার মধ্যে বার দুই কাশী পরিক্রমা করিয়া—পল্লীবাংলায় ও [illegible]লকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক জায়গার বর্ণনাই বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ। শুধু মনুষ্যসমাজের নয়, প্রকৃতির এইরূপ বর্ণনা খুব কম উপন্যাসেই পাওয়া যায়—ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র, তরঙ্গসঙ্কুল নদী, আবার শস্যশ্যামল, লতাগুল্ম-পরিবৃত বা অপেক্ষাকৃত ঊষর পল্লীভূমি। এই বিস্তৃত রঙ্গমঞ্চে লোকের সমাবেশও বিস্ময়কর। এমন খুব কম উপন্যাসই আছে যাহার মধ্যে এত লোকের ভিড় হইয়াছে অথচ প্রায় প্রত্যেক চরিত্রই আপন বৈশিষ্ট্যে এত সমুজ্জ্বল। বাংলা সাহিত্যে যে সব প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস আছে তাহার মধ্যে পরিসরের বিস্তৃতিতে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'ই ইহার কাছাকাছি আসে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এক পৃষ্ঠাসংখ্যার দিক হইতেই ইহারা তুলনীয়। কাহিনীর ব্যাপ্তিতে, চরিত্রের প্রাচুর্যে ও বৈচিত্র্যে এবং নানারসের সম্মিশ্রণে 'শ্রীকান্ত' অনন্য। অথচ এত

বৈচিত্র্য ও বৈষম্য সত্ত্বেও ইহার মধ্যে সুরের ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। প্রথম পর্বে রাজলক্ষ্মী ও সুরলক্ষ্মীর সঙ্গে এক পুরুষের ভঙ্গ-কুলীন পাচকঠাকুরের বিবাহ, তৃতীয় পর্বে পণ্ডিতাগ্রগণ্য রাখালঠাকুরের 'মন্ত্রপড়া' মালতীর বিবাহ এবং চতুর্থ পর্বে দ্বাদশতিলিকুলতিলক মন্মথ সরকারের সঙ্গে অন্ত্যজ উষাঙ্গিণী বা কমল[illegible]লতার কণ্ঠিবদল—সবই বিবাহের প্রহসন মাত্র। কিন্তু তবু যুগ যুগ ধরিয়া এই জাতীয় মিলনকে ভিত্তি করিয়াই সমাজ বাঁচিয়া রহিয়াছে। সমস্ত জানিয়া শুনিয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া অন্নদাদিদি এই বন্ধনকে স্বীকার করিয়াছেন। আবার ইহাও স্বাভাবিক এই বন্ধনের বিরুদ্ধে অভয়ার মত মেয়েরা বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া ধরিবে এবং তাহাদের বিদ্রোহের মধ্য দিয়াই সমাজ আপনাকে যাচাই করিবে, সংশোধিত করিবে, সংহত করিবে এবং নিজের শির উন্নত রাখিবে। এমন কি সনাতন হিন্দুধর্মের সংকীর্ণতা ও অপূর্ণতাকে কশাঘাত করিলেও অভয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিতে চাহে নাই। শরৎচন্দ্র ঔপন্যাসিক, শাস্ত্রপ্রবক্তা ন[illegible] তিনি জীবনের ছবি আঁকিয়াছেন, রহস্যের সন্ধান করিয়াছেন, সমস্যার উথ[illegible] করিয়াছেন, সমাধান দেন নাই। এই সমস্ত রমণীর চিত্রের এবং বিচ্ছিন্ন কাহি[illegible] মধ্য দিয়া একটি নিবিড় ঐক্যের সূত্র স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

শরৎসাহিত্যে 'শ্রীকান্ত' একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। শ্রীকান্ত কল্পিত চরিত্র, রাজলক্ষ্মীও তাই। সুতরাং নিরুপমা দেবী যেমন বলিয়াছেন যে, 'দিদি' উপন্যাসকে যেন কেহ লেখিকার আত্মজীবনী বলিয়া মনে না করেন (জয়শ্রী, বৈ[illegible] ১৩৪০), শরৎচন্দ্র তেমনি সতর্ক করিয়া দিয়াছেন শ্রীকান্ত, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি [illegible] গড়া চরিত্র ছাড়া কিছু নয়। তবু মনে হয় এই বইতে ভাগলপুর, দেবানন্[illegible] এবং বর্মায় গ্রন্থকারের কোন কোন অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হইয়া থাকিবে। [illegible] তাই নয়, শরৎসাহিত্যের বিভিন্ন ধারা এই গ্রন্থে সম্মিলিত হইয়াছে। শিল্পকলার দিক দিয়া ইহা শরৎপ্রতিভার পরিপূর্ণ দর্পণ। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র নিবিড় ও গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারীচরিত্রের রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকান্ত যে সব নারীর সংস্পর্শে আসিয়াছে বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে তাহারা অনন্য-সাধারণ। শরৎচন্দ্র হিন্দু যৌথ পরিবারের কাহিনী রচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, অথচ 'শ্রীকান্ত' একটা ছন্নছাড়া লোকের বিশৃঙ্খল কাহিনী। এখানে স্থিতিশীল, নিয়মতান্ত্রিক যৌথ পরিবারের চিত্রের অবকাশ নাই বলিলেও চলে। তবু এই গ্রন্থের প্রথম দিকে শ্রীকান্তের পিসিমার বাড়ির যৌথ পরিবারের চিত্র সংক্ষিপ্ত হইলেও ব্যঞ্জনাময় এবং চরিত্রগুলি—মেজদা, ছোড়দা,

[illegible]দা, পিসেমশাই, রামকমল ভট্চায, দরওয়ান কিশোরী সিং—সবাই জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এমনকি এই সকল পরিবারে গৃহিণীরা অন্তরালবর্তিনী হইলেও, তাঁহাদের যে প্রখর ব্যক্তিত্ব ছিল এবং কর্তারা যে তাঁহাদিগকে সমীহ করিয়া চলিতেন ইহা একটি অসামান্য ঘটনার কৌতুককর পরিণতি হইতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার' যখন ছিনাথ বহুরূপীতে পরিণত হইল তখন পিসেমশাই ও ভট্চায তাহাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু পিসিমা খুব সময়োচিত মন্তব্য করিলেন, 'তোমাদের ভাগ্যি ভাল যে সত্যিকারের বাঘ-ভালুক বার হয় নি। যে বীরপুরুষ তোমরা, আর তোমার দরওয়ানরা।······একটা ছোট ছেলের যা সাহস, একবাড়ি লোকের তা নাই।' 'পিসেমশাই কোন কথাই শুনিলেন না, বরং পিসিমার এই অভিযোগে এমন একটা ভাব ধারণ করিলেন যে, ইচ্ছা করিলেই, তিনি এই সকল কথার যথেষ্ট সদুত্তর দিতে পারেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের কথার উত্তর দিতে যাওয়াই পুরুষ মানুষের পক্ষে অপমানকর······।' তখন আর কোন শাস্তি না দিয়া পিসেমশাই ছিনাথ বহুরূপীর রঙীন কাপড়ের লেজটা কাটিয়া ফেলিতে বলিলেন। এবং পিসিমাই এইভাবে এই অধ্যায়ের উপর যবনিকা টানিলেন; তিনি রাগ করিয়া বলিলেন, 'রেখে দাও। তোমার ওটা অনেক কাজে লাগবে।'

২

শরৎচন্দ্রের শিশুমনে প্রবেশ করিবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। সেই ক্ষমতারও উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায় এই পিসিমার পরিবারের শিশুদের চিত্রে এবং বালক শ্রীকান্তের প্রথম থিয়েটার দেখার বর্ণনায়। সর্বোপরি ইন্দ্রনাথ—সে ঠিক শিশু নয়, কিন্তু কিশোর বয়সেও শিশুর সরলতা, বিশ্বাসপ্রবণতা অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে নাই।

ইন্দ্রনাথ ডাংপিটে, দুঃসাহসী, স্নেহপ্রবণ কিশোর; সে স্কুলে পণ্ডিতমশায়ের টিকি কাটিয়াছিল; সেই অপরাধে হেডমাস্টার সাজা দিতে উদ্যত হইলে হেডমাস্টারের পিঠের উপর কি একটা করিয়া রেলিং ডিঙাইয়া স্কুল হইতে পলায়ন করিয়াছিল এবং বুঝিয়াছিল এইভাবে স্কুল হইতে পলায়ন করিলে সদর গেট দিয়া সেখানে ফিরিয়া যাওয়া সহজ হয় না। সেই চেষ্টাও সে করে নাই। তারপর

এই শক্তিমান নির্ভীক কিশোর বহু দুঃসাহসিক কর্ম করিয়াছে, কিন্তু মনে [illegible] অধিকাংশ অভিযানের মূলেই রহিয়াছে অপরের প্রতি সহানুভূতি। ই[illegible] অশিক্ষিত কিশোর ; সে কোন সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিল না, কোন [illegible] বা রাজনৈতিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই ; কিন্তু তাহার মধ্যে [illegible] মানবের দুর্জয় সাহস ও শক্তি এবং অপরাজেয় পরোপচিকীর্ষা ও মহ[illegible] পরিচয় পাওয়া যায়। 'পথের দাবী'র সব্যসাচী স্কুল পালাইয়াছিলেন কি না জানি না, তবে তিনি যে স্কুলের তথাকথিত ভাল ছেলে ছিলেন না তাহা বলা বাহুল্য। তিনি বহুশ্রুত রাজনীতিবিদ্, বিরাট কর্মযজ্ঞের ঋত্বিক, সান-ইয়াৎ-সেন প্রভৃতি প্রথিতযশা রাষ্ট্রনায়কের সহচর এবং এসিয়া ভূখণ্ড ব্যাপিয়া তাঁহার গতিবিধি। কিন্তু তিনি বজ্রাদপি কঠিন হইলেও কুসুমাদপি কোমল এবং বহুবিধ কর্মক্ষেত্রের মধ্য দিয়া সঞ্চরণ করিলেও তাঁহার আদর্শ অতিশয় স্বচ্ছ, সরল ও ঋজু। তিনি কাব্য, সাহিত্য, এবং সামাজিক সংগঠন প্রভৃতির মূল্য উপলব্ধি করেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ শুধু রাষ্ট্রবিপ্লবের উপর ; এমন কি, 'পথের দাবী' নামে যে সমিতি তাঁহারই নির্দেশে তাঁহার অনুগামীরা স্থাপন করিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কর্মপ্রণালীর সঙ্গেও তাঁহার বিশেষ পরিচয় নাই বা সেই সম্পর্কে কৌতূহল নাই। তিনি ইহার স্রষ্টা, কিন্তু তাঁহার নিজের দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ।

ইন্দ্রনাথ এবং সব্যসাচীর অন্তর্ধানের মধ্যেও খানিকটা সাদৃশ্য আছে। ইন্দ্রনাথ সম্পর্কে শ্রীকান্ত প্রথমেই বলিয়াছে, 'আজ সে বাঁচিয়া আছে কি না জানি না। কারণ বহু বৎসর পূর্বে একদিন অতি প্রত্যূষে ঘরবাড়ি, বিষয়-আশয় আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করিয়া সেই যে এক বস্ত্রে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, আর কখনও ফিরিয়া আসিল না।' প্রলয়ঙ্কর ঝড়-জলের মধ্য দিয়া একমাত্র হীরা সিংকে সঙ্গে লইয়া ডাক্তার যে সবাইকে ছাড়িয়া গেলেন সেই বর্ণনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে : 'এই ভয়ানক দুর্যোগে বাটির বাহিরে আসিয়া ইহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার মত উন্মাদ বোধ হয় পুলিসের মধ্যে কেহ ছিল না, তথাপি রাজপথ এড়াইয়া উভয়ে মাঠের দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছে। মাঝে মাঝে ঝোপঝাড় ও কাঁটাগাছের বেড়া, এই সূচীভেদ্য আঁধারে পিচ্ছিল পথহীন পথে বিপুল বোঝার ভারে একজন আনতদেহে সাবধানে অগ্রসর হইয়াছে, এবং অপরে বিরাট পাগড়ির নীচে প্রচণ্ড বারিপাত হইতে যথাসম্ভব নিজের মাথাটা বাঁচাইয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে।'

'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী'র প্রথম পর্বের প্রথমাংশ শরৎচন্দ্র [illegible] ত্যাগ করার

পূর্বেই লিখিয়াছিলেন। ইহার বছর সাতেক পরে তিনি সব্যসাচীকে [illegible] করিয়া 'পথের দাবী' উপন্যাস রচনা করেন এবং তাঁহার কর্মকেন্দ্র হয় ব্রহ্মদেশ নিকটবর্তী ভারতমহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে। সাহিত্য রচনার দিক্ হইতে বিচার করিলে মনে হয় বেপরোয়া, 'ভবঘুরে', দুঃসাহসী, পরদুঃখকাতর কিশোর বীর ইন্দ্রনাথই অমিততেজা, দেশাত্মবোধের মূর্ত প্রতীক বিপ্লবী মহানায়ক সব্যসাচীতে রূপান্তরিত [illegible]ছেন। বাহিরের দিক দিয়া বৈষম্য থাকিলেও এই দুই চরিত্রের পরিকল্পনায় মৌলিক সাদৃশ্য আছে।

৩

শরৎসাহিত্যের অন্যতম প্রধান লক্ষণ হাস্যরসের মৌলিকতা ও বৈচিত্র্য। তিনি সমস্ত রকম [illegible], স্বার্থপরতার উপর তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন, আবার যাহারা [illegible] ত্রুটিগ্রস্ত, হীন, অন্ত্যজ তাহাদের প্রতি অপরিসীম করুণা তাঁহার [illegible]বিত করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের হাস্যরসের বিভিন্ন ধারার পরিচয় 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে পাওয়া যায় এবং অনেক সময় তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ স্নিগ্ধ হাস্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন, চাতুর্বর্ণের সমস্ত অপকীর্তির সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল এবং তিনি ইহার বিরুদ্ধে তীব্র, হিংস্র বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্রূপের সঙ্গে সুমধুর কৌতুকও মিশ্রিত হইয়াছে। রাজলক্ষ্মী ও সুরলক্ষ্মীর সঙ্গে দত্তদের ভঙ্গকুলীন কিন্তু পাকা বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন পাচকের বিবাহের বর্ণনা এই সম্মিশ্রণের অপরূপ দৃষ্টান্ত। ব্রাহ্মণরা যাহাদিগকে অন্ত্যজ বলিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে তাহাদের মধ্যেও জাতিভেদ আছে, কৌলীন্যগর্ব আছে; কতকগুলি ছন্দোবদ্ধ, সমাসবদ্ধ বাক্যকে ঋষিবাক্য বা মুনিকথিত বলিয়া যুগ যুগ ধরিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা মানুষকে যদি বাঁধিয়া রাখিতে পারেন, তাহা হইলে রাখালপণ্ডিত ও শিবুপণ্ডিতের হিংটিংছট মন্ত্রপাঠ লইয়া আপত্তি করিবার কি আছে? আর অনুরূপ দাবীতেই রতন নবশাখও সগর্বে এই সব ডোম-ডোকালির বিবাহের মন্ত্রকে তাচ্ছিল্য করিয়া নিজেকে বামুন-কায়েতের সঙ্গে সমপর্যায়ে ফেলিয়া গর্ব অনুভব করিতে পারে, বিশ বৎসর কৈবর্তের ঘর করিয়া জাতবোষ্টম টগর তাহার জাত্যভিমান বজায় রাখিতে পারে এবং পাষণ্ড প্রণয়প্রার্থী মন্মথ প্রত্যাখ্যাত হইয়াও শুঁড়ির তুলনায় [illegible] শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিতে পারে।

...য়ের বিরুদ্ধে অপ্রশমনীয় ঘৃণা এবং বিচারহীন, প্রীতিহীন সমাজব্যবস্থার দ্বারা উৎপীড়িত নরনারীর প্রতি অপরিসীম স্নেহ উৎসারিত হইয়াছে বলিয়াই শরৎসাহিত্যে হাস্যরস এত বৈচিত্র্য, এত জটিলতা, এত মাধুর্য ও তীক্ষ্ণতা লাভ করিয়াছে। বিদ্রূপ ও কৌতুকের সম্মিশ্রণের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হইল চট্টগ্রামবাসী দুই ভাইয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় এক সরলা ব্রহ্মদেশীয়া রমণীর প্রবঞ্চনার দৃশ্য। ইহাদের মধ্যে অগ্রজের নির্লজ্জ আত্মপক্ষ সমর্থনের উদ্ধৃতি দিলেই যথেষ্ট হইবে: 'পুরুষবাচ্চা বিদেশ-বিভুঁয়ে এসে বয়সের দোষে না হয় একটা শখ করেই ফেলেচে। কোন্ মানুষটাই বা না করে বলুন? ·····তাই বলে বুঝি চিরকালটা এমনি করেই বেড়াতে হবে। ···· মশাই, এ বা কি! কাঁচা বয়সে কত লোক হোটেলে ঢুকে যে মুরগি পর্যন্ত খেয়ে আসে। কিন্তু বয়স পাকলে কি আর তাই করে, না করলে চলে?' গ্রন্থকার স্পষ্ট না করিলেও ইহা অনুমান করিতে পারি দুই তিন পরিচ্ছেদ ব্যবধানে বর্ণিত 'প্রাজ্ঞ' মনোহর চক্রবর্তীর মত এই চট্টগ্রামবাসী বিজ্ঞ ব্যক্তিটিও উচ্চবর্ণের হিন্দু। ইহার অপর প্রান্তে রহিয়াছে স্বামী বজ্রানন্দ; সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে সেও অভিজাত বংশের সন্তান ছিল, কিন্তু সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জাতি লুপ্ত হইয়াছে এবং লাঞ্ছিত, অবহেলিত, অন্ত্যজ লোকের দুঃখের ভাগ লইতেই সে সংসার ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু সে অনায়াসে রতনের জাত লইয়া পরিহাস করে এবং রতন তাহার গালিগালাজ শুনিয়া ফেলিলেও বজ্রানন্দ অপ্রতিভ হয় না; শুধু জিভ কাটিয়া বলে, 'রতন দোষ নিও না বাবা, আমি ভেবেছিলুম তুমি বুঝি ও পাড়ায় গেছ—ডেকে সাড়া পাই নি কি না।' এই প্রসঙ্গে সন্ন্যাসের প্রতি শরৎচন্দ্র কিরূপ সকৌতুক বিদ্রূপ করিয়াছেন তাহার একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে পারি। সন্ন্যাস অনেক সন্ন্যাসীর পক্ষেই একটা পেশায় পর্যবসিত হয় এবং ইহাদের অনেকেই মূর্খ এবং যেহেতু অলৌকিক শক্তির সাহায্যে ইহারা অপার্থিব জগতের সন্ধান দিতে পারে এই মোহই ইহাদের প্রধান বেসাতি, সেইজন্য ইহারা যেমন নিজেদিগকে এবং অন্য সবাইকে প্রবঞ্চনা করে তেমনি অপরে প্রবঞ্চনা করিলে তাহা ধরিতে পারে না। শ্রীকান্ত সহজেই এই প্রবঞ্চনা প্রপঞ্চের সন্ধান পাইয়া তাহার হবু গুরুদেবকে এই বলিয়া তুষ্ট করিল, 'বাবা, মহাভারতে লেখা আছে মহাপাপিষ্ঠ জগাই-মাধাই বশিষ্ঠ মুনির পা ধরিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন; আর আপনার পা ধরিয়া আমি মুক্তি পাইব না? নিশ্চয়ই পাইব।' সাধুজী খুশি হইয়া উত্তর দিলেন, 'বাত তেরা সাচ্চা হ্যায়।'

সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা ও সংস্কার কালক্রমে বদলায় কিন্তু সাহিত্যের

মধ্যে, বিশেষ করিয়া হাস্যরসপ্রধান সাহিত্যে তাহা অবিস্মরণীয় হইয়া থাকে। বল্লালের কৌলীন্য এখন প্রায় বিস্মৃত, বহুবিবাহ এখন শুধু অপ্রচলিত নয়, বে-আইনীও বটে, কিন্তু দীনবন্ধুর প্রতিভাগুণে নদের চাঁদ, বগী বিন্দী এবং জামাই-বারিকের মধ্য দিয়া এই সব প্রথা অমর হইয়া আছে। প্রথম এলিজাবেথের যুগের পিউরিটান সম্প্রদায় এখন লুপ্ত, ওদেশের মফস্বল আদালতের বিচারব্যবস্থার বহু পরিবর্তন হইয়াছে, এখনকার ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে তখনকার শ্রমিকসংস্থার কোন চিহ্ন নাই কিন্তু শেক্সপীয়রের নাটকের ম্যালভলিয়ো, সার্থকনামা (বিচারক) শ্যালো ও তাঁতী বটমের চিত্রে সেই যুগের এই সকল সম্প্রদায় আমাদের চিত্তে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছে। তেমনি শরৎচন্দ্র জাতিভেদের যে কড়াকড়ি দেখিয়াছিলেন তাহা এখন বিলীয়মান ; তবু টগরের শুচিতা, রতন নবশাঁখ ও দ্বাদশতিলি মন্মথ সরকারের জাত্যভিমান প্রভৃতির কৌতুকোজ্জ্বল চিত্রের মধ্য দিয়া এই অপ-প্রথা সজীব হইয়া থাকিবে।

৪

এই শ্রীকান্ত উপন্যাসেই জাতিভেদের নিষ্ঠুরতার জ্বলন্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে প্রথম পর্বে বঙ্গপ্রবাসী গৌরী তেওয়ারীর দুই মেয়ের বিবাহিত জীবনের দুর্দশার বর্ণনায় আর তৃতীয় পর্বের পতিত ব্রাহ্মণ অগ্রদানীদের জীবনের করুণ প্রতিচ্ছবিতে। শরৎচন্দ্রের বহু রচনায় ক্ষমাহীন ধর্ম ও প্রীতিহীন হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ধ্বনিত হইয়াছে। আয়তন ও পরিবেশের বিস্তৃতি সত্ত্বেও 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস প্রধানতঃ ব্যক্তিগত কাহিনী, সামাজিক চিত্র নহে। তবু যে দুই-একটি খণ্ডচিত্র পাওয়া যায় তাহা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। সবচেয়ে তীব্র আলোক বিচ্ছুরিত হইয়াছে কলঙ্কিনী বালবিধবা নিরুদিদির সূতিকাগারে মৃত্যুর বর্ণনায়। এই বিবরণের সংক্ষিপ্ত তীব্রতা বঙ্গসাহিত্যে প্রায় অতুলনীয়।

প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুসমাজে যে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত আছে তাহা কঠোর ও ক্ষমাহীন হইলেও, আধুনিক শিল্পভিত্তিক সভ্যতার মত বীভৎস নয়। এই যান্ত্রিক সভ্যতার বিভীষিকার ইঙ্গিত শরৎ-সাহিত্যে অন্যান্য গল্প-উপন্যাসেও পাওয়া যায়। কিন্তু সতীশ ভরদ্বাজের অসুস্থতার খবর পাইয়া শ্রীকান্ত যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিল তাহাতে আধুনিক সভ্যতার স্বরূপ প্রকট হইয়াছে। ইহা মানুষকে পশু করিয়া দেয়, তাহার সমস্ত

অনুভূতিকে অসাড় করিয়া ফেলে। বর্ণনার সংক্ষিপ্ততা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খতায় এই চিত্র অবিস্মরণীয়। শ্রীকান্তের ভাষায়ই বলিতে পারি, 'আধুনিক সভ্যতার বাহন তোরা—তোরা মর্। কিন্তু যে নির্মম সভ্যতা তোদের এমন ধারা করিয়াছে তাহাকে তোরা কিছুতেই ক্ষমা করিস না। যদি বহিতেই হয়, ইহাকে তোরা রসাতলে বহিয়া নিয়া যা।'

৫

এই পর্যন্ত 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের যে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা বর্ণনার উল্লেখ করা হইল তাহা রসোত্তীর্ণ হইলেও উপকাহিনীর অধিক মূল্য পাইতে পারে না। ইহা যে বিশৃঙ্খল ভ্রমণ-কাহিনী হইতে উপন্যাসের পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে তাহা বিধবা রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে শ্রীকান্তের মন দেয়া-নেয়ার বিশ্লেষণ ও বর্ণনার জন্য। ইহা মূলতঃ প্রেমের উপন্যাস এবং এই প্রেমের কাহিনীই এই আপাতবিশৃঙ্খল ঘটনা-পঞ্জীকে ঐক্য ও সজীবতা দান করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষের রচনাবলীতে শ্রীকান্ত উপন্যাসকে পুনরায় পড়িয়া জনৈক বিদগ্ধ ঐতিহাসিক মন্তব্য করিয়াছিলেন, শ্রীকান্ত যখন প্রথম বাহির হয় তখনই রাজলক্ষ্মী তাঁহার কাছে অস্বাভাবিক মনে হইয়াছিল, এখনও তাহাই মনে হইয়াছে। ১৯১৬ সালে শ্রীকান্ত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে ; তখন হইতে আজ পর্যন্ত যে প্রশ্ন বারংবার পাঠক-পাঠিকার মনে আন্দোলিত হইয়াছে, তাহা এই, রাজলক্ষ্মীর আদিরূপকে এবং বাস্তব জীবনে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কি ? স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোন যোগসূত্র নাই এই কথা বহু সমালোচক বলিয়াছেন। তবু The Dark Lady of the Sonnets-এর মত রাজলক্ষ্মী যে ভাবে পাঠকবর্গের মনে নাড়া দিয়াছে এই চিত্রের স্বাভাবিকতা ও সজীবতার তাহাই সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

শ্রীকান্ত উপন্যাসে বহু চরিত্র ও কাহিনী ভিড় করিয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে চারটি নারী চরিত্র প্রাধান্য পাইয়াছে—অন্নদা দিদি, রাজলক্ষ্মী, অভয়া ও কমললতা এবং একটি কাহিনীই ইহার মূল বিষয়বস্তু—শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর সম্পর্ক। যে চারটি রমণী এই উপন্যাসের পুরোভাগে রহিয়াছে তাহারা সবাই কুলত্যাগিনী, কিন্তু সবাই শুদ্ধান্তঃকরণশালিনী। ইহাদের মধ্যে নায়িকা রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে কমললতার সাক্ষাৎ হইয়াছে, কিন্তু সেই সাক্ষাৎ ও সংস্পর্শ

একটু আলগা ধরনের এবং এই গ্রন্থের চারটি পর্বের গঠন বিচার করিলে ইহা ত্রুটি বলিয়াও মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও এই চারটি রমণীর মধ্যে যে আত্মিক সংযোগ ও বৈষম্য রহিয়াছে তাহা এই আপাতবিশৃঙ্খল উপন্যাসকে সংহত করিতে সাহায্য করিয়াছে।

মানুষের দৈহিক প্রবৃত্তি অতি আদিম প্রোটোপ্লাজম হইতে আহৃত হইয়াছে। তাহার বুদ্ধি, নীতি এবং সমাজব্যবস্থা সেই সব প্রবৃত্তিকে বিধিনিষেধের দ্বারা সংযত করিতে চেষ্টা করিয়া তাহাকে সুসভ্য করিয়া তুলিয়াছে। তবু স্মরণ রাখিতে হইবে প্রবৃত্তির বিকাশের মধ্যেই মানুষের মনুষ্যত্ব, প্রবৃত্তির নিরোধে নয়। এই জন্যই চলমানতা জীবনের ধর্ম এবং বিদ্রোহের মধ্য দিয়া, বিপ্লবের মধ্য দিয়াই যাহা পুরাতন, যাহা জীর্ণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া মানুষ নূতন ব্যবস্থা, নূতন নিয়মতন্ত্র রচনা করে। তাহা না হইলে উপায় ও উদ্দেশ্যের মধ্যে বিভ্রমের সৃষ্টি হইবে এবং জীর্ণ পত্রকে আঁকড়াইয়া ধরিলে নূতনের অঙ্কুরকে চেনা যাইবে না। আমাদের হিন্দু সমাজ অতি প্রাচীন। ইহার মূলে রহিয়াছে বেদবাক্য যাহা অপৌরুষেয়। শ্রুতি হইতে আসিয়াছে স্মৃতি এবং তাহা হইতে আসিয়াছে আমাদের রীতিনীতি, আচার, সংস্কার এবং সামাজিক প্রথা। কিন্তু ইহাদের ব্যবহারিক উপযোগিতাকে বিচার না করিয়া যদি ইহাদিগকেই আমরা চরম ও পরম বলিয়া মনে করি তাহা হইলেই মেকি আদর্শবাদ বা শূন্যগর্ভ রোমান্টিক মনোবৃত্তির উদ্ভব হয়। এই অচল, অনড়, ক্ষতিকর আদর্শবাদ সকল দেশে, সকল সমাজে এবং সকল কালেই জগদ্দল পাথরের মত মানুষের স্বাধীন চিন্তার উপর চাপিয়া বসিয়াছে এবং মানুষই মানুষের গড় প্রীতিহীন, বিচারহীন সমাজব্যবস্থার শিকার হইয়াছে।

এই জমকালো প্রস্তাবনার পর উপস্থিত বিষয়ে ফিরিয়া আসা দরকার। যে সমস্ত আদর্শ হিন্দুসমাজ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের একটি হইল হিন্দুবিধবার নিশ্ছিদ্র ব্রহ্মচর্য। বৈধব্য দৈবপ্রেরিত বজ্রাঘাত, কিন্তু সমাজ তাহাকে অনপনেয় অপরাধরূপে গণ্য করিয়া বালবিধবার জন্যও কোন ব্যতিক্রম না করিয়া সকল বিধবাদের জন্য আজীবন নিবৃত্তিমার্গচর্চার ব্যবস্থা করিয়া দিল। সমাজের সবচেয়ে বড় পাপ—বিধবার পদস্খলন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যের পথ হইতে বিচ্যুতি। কেন? কিসের জন্য? এই প্রশ্ন শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সবচেয়ে বেশি করিয়া ধ্বনিত হইয়াছে এবং অন্যান্য লেখকদের রচনায় ইহার উল্লেখ থাকিলেও এইখানে ইহা অপরূপ শিল্পকলায় মণ্ডিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া এত

হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্বেই নিরুদিদির দুর্দশার বর্ণনা আছে। নিরুদিদি প্রত্যক্ষভাবে কাহিনীতে উপস্থিত হয়েন নাই, শুধু বালক শ্রীকান্তের স্মৃতিতে তাঁহার মৃত্যুর বিভীষিকার জাজ্বল্যমান বর্ণনা আছে। 'সকলের সর্বপ্রকার রোগে, শোকে, সম্পদে, বিপদে এতবড় সেবাপরায়ণা, নিঃস্বার্থ পরোপকারিণী রমণী পাড়ায় আর কেহ ছিল না।...একান্ত স্নিগ্ধ শান্ত স্বভাব এবং সুনির্মল চরিত্রের জন্য পাড়ার লোকও তাঁহাকে বড় কম ভালবাসিত না। কিন্তু সেই নিরুদিদির ত্রিশ বৎসর বয়সে যখন পা পিছলাইয়া গেল এবং ভগবান এই সুকঠিন [সূতিকা] ব্যাধির আঘাতে তাঁহার আজীবন উঁচু মাথাটি মাটির সঙ্গে একাকার করিয়া দিলেন,..... দোষলেশস্পর্শহীন নির্মল হিন্দুসমাজ হতভাগিনীর মুখের উপরই তাহার সমস্ত দরজা জানালা আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন।' মৃত্যুপথগামিনীর একমাত্র সঙ্গী ও শুশ্রূষাকারী ছিল কিশোর শ্রীকান্ত। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, শরৎচন্দ্র একবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই বৎসর অন্যতম পাঠ্যপুস্তক ছিল 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। একটি প্রশ্নে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, নারীত্বের দিক দিয়া রোহিণীর জীবন যে ব্যর্থ হইয়া গেল, তাহা কি অপরাধে এবং কাহার অপরাধে ?

নিরুদিদি উপন্যাসের ভিতরে আসেন নাই। কিন্তু তাঁহার নারীজীবনের ব্যর্থতা, তাঁহার মৃত্যুর ভয়ংকর চিত্র এই উপন্যাসের এক তাৎপর্যপূর্ণ পশ্চাৎপট-স্বরূপ এবং কাছে আসেন নাই বলিয়াই তিনি যেন এই বিরাট উপন্যাসকে আরও বিশালতা দিয়াছেন। নিরুদিদির শেষকৃত্য করিবার পূর্বেই শ্রীকান্তের আর একটি মহিলার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল, যাঁহার ব্যক্তিত্ব আরও বেশি বৈশিষ্ট্যময়। তিনি অন্নদাদিদি। প্রথম দর্শনেই শ্রীকান্তের মনে হইয়াছিল 'যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। যেন যুগযুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া এইমাত্র আসন হইতে উঠিলেন।' অন্নদাদিদি হিন্দুর মেয়ে, ব্রাহ্মণের মেয়ে; তিনি রাত্রিতে অন্ধকারে মুসলমান সাপুড়ে শাহ্‌জীর সঙ্গে কুলত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার সামাজিক পরিচয়। কিন্তু এই লোকটিই তাঁহার স্বামী। দিদির বিধবা বড় বোনের সঙ্গে সে অবৈধ সংস্পর্শে লিপ্ত হয় এবং তাহার ফলে বিধবার গর্ভসঞ্চার হয়। এই শ্যালিকাকে হত্যা করিয়া শাহ্‌জী পলায়ন করে এবং পরে সাপ খেলাইতে দিদিদের বাড়িতে আসে। সেই সূত্রেই দিদি তাহার সঙ্গে পলাইয়া আসেন এবং স্বামীর মৃত্যুর পরও তাঁহার একনিষ্ঠ পতিভক্তি বিন্দুমাত্র

টলে নাই। যদি তুলনামূলক সমালোচনা করা যায়, তাহা হইলে এই বিষয়ে ভ্রমরও ইঁহার তুলনায় নিকৃষ্ট, কারণ ভ্রমর পরদারনিরত হত্যাকারী গোবিন্দলালকে ক্ষমা করিতে পারে নাই।

অন্নদাদিদির কাহিনী খুব দীর্ঘ নহে, কিন্তু ইহার মধ্যে তিন রকমের শিল্পশৈলী অবলম্বিত হইয়াছে। শেষের অংশ লিরিকের ভঙ্গিতে লিখিত, যেখানে দিদি নিজেই তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। খানিকটা অংশ উপন্যাসের (বা এপিকের) রীতিতে রচিত, কারণ দ্রষ্টা গ্রন্থকার তাহার বর্ণনা দিয়াছেন, আর একটা অংশ নাটক যেখানে শাহ্‌জী, ইন্দ্রনাথ ও দিদির কথোপকথন মাধ্যম হইয়াছে এবং ইহাদের কর্ম, সংঘাত ও সহযোগিতা প্রত্যক্ষ হইয়াছে। এই আখ্যানে বহুকালসঞ্চিত হিন্দুরমণীর পাতিব্রত্যধর্ম যে বিচিত্র ও বিস্ময়কর অভিব্যক্তি পাইয়াছে তাহা তুলনাহীন। আবার নিষ্ঠুর, ধর্মহীন, বিবেকহীন পাষণ্ড স্বামী এবং ধর্মপরায়ণা সতীলক্ষ্মী স্ত্রীর বৈপরীত্য এমন তীব্রভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে যে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে কেমন করিয়া এই দুইটি বিসদৃশ চরিত্র একসঙ্গে বসবাস করিয়াছে এবং দিদি কেমন করিয়া এই ব্যবধান ঘুচাইয়া শুধু শাহ্‌জীর সাহচর্য সহ্য করেন নাই, তাহাকে ভালবাসিতে পারিয়াছেন। শাহ্‌জীর মৃত্যুতে শুধু যে একটা বন্ধন ছিন্ন হইল বা অবলম্বন সরিয়া গেল তাহা নহে, তিনি এমন একজন লোককে হারাইলেন যাহাকে তিনি কায়মনোবাক্যে ভালবাসিতেন। স্বতঃই মনে হয় এই ভালবাসিবার শক্তি তো সামাজিক বন্ধন হইতেই আসিয়াছে, সেই জন্যই কুলত্যাগিনী হইয়াও তিনি কুললক্ষ্মী হইতে পারিয়াছিলেন। অন্নদাদিদি তর্ক করেন নাই, পরিণত বয়সে জীবনস্মৃতি লিখিতে বসিয়া শ্রীকান্ত কুলত্যাগিনী নামে পরিচিতা মহীয়সী মহিলার গুণগান করিয়াছেন, কিন্তু বর্ণনাকে অতিক্রম করিয়া যে অর্থ ধ্বনিত হয় তাহার সঙ্গে এই প্রশ্ন জড়িত থাকে : অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তি ও সামাজিক বন্ধন, ইহারা কি সম্পর্কিত নয়?

বুদ্ধদেব বসু ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, মেসে যদি সাবিত্রীর মত ঝি থাকিত, তবে তাঁহারা সবাই মেসে গিয়া থাকিতেন। এই ছেলেমানুষীর উত্তরে শরৎচন্দ্র কঠোর ব্যঙ্গ করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, সাবিত্রীকে চিনিতে হইলে সতীশের চোখ থাকা চাই। ইহা যে শুধু তীক্ষ্ণ প্রত্যুত্তর তাই নয়, জীবনে ও সাহিত্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি। ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি ও নিরুদিদির সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীকান্ত উপযুক্ত চোখ অর্থাৎ উপলব্ধির শক্তি অর্জন করিয়াছিল;

তাই সে অনায়াসে পিয়ারী বাইজীর অন্তরালে রাজলক্ষ্মীকে চিনিতে পারিয়াছিল। অন্যভাবে বলা যাইতে পারে, গ্রন্থকার 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে প্রারম্ভিক অংশে যে কাহিনী রচনা করিয়াছেন তাহা রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্ত সাক্ষাতের উপযুক্ত পরিবেশ; এই পরিবেশে রাজলক্ষ্মী সম্পূর্ণ সম্ভাব্য, বিশ্বাসযোগ্য, স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে।

রাজলক্ষ্মীর বিবাহের ইতিহাস বিচিত্র; তবে সেই সময়ে অনেক কুলীন কন্যার বিবাহই বিবাহের প্রহসনে পর্যবসিত হইত। আর বালক-বালিকার মধ্যে প্রণয়ের উদ্ভব এবং বহু বিপর্যয়ের মধ্যেও তাহার অবিনশ্বরতা সাহিত্যে অপরিচিত নয়। ইউরোপীয় সাহিত্যে দান্তেকে শেক্সপীয়রের সঙ্গে তুলনা করা হয়। বালিকা বিয়াত্রিচের প্রতি বালক দান্তের প্রেমই তাঁহার অমর কাব্যের ভিত্তি। আমাদের সাহিত্যে প্রতাপ শৈবলিনীর প্রতি আসক্তি জয় করিবার জন্য রূপসীকে বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিতে পারে নাই। অমরনাথ-লবঙ্গলতার বাল্যের আসক্তি ও তাহার পরিণতির কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রেমের টানা-পোড়েনের সবচেয়ে লক্ষণীয় গুণ ইহার জটিলতা ও বৈচিত্র্য। চতুর্থ পর্বে রাজলক্ষ্মী তাহার পূর্ব ইতিহাস বিবৃত করিয়াছে এবং গ্রন্থকার সেই প্রয়োজনকেই কমললতা উপকাহিনী সংযোজনের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের এই দাবী ভিত্তিহীন নয়, কিন্তু তবু মনে হয় এই পর্বে কমললতা-উপকাহিনী এত প্রাধান্য পাইয়াছে যে রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের মূল কাহিনী কেন্দ্রচ্যুত হইয়াছে। উপকাহিনীর প্রাচুর্য সত্ত্বেও দ্বিতীয় পর্বে প্লটের ভারসাম্য অটুট রহিয়াছে।

সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মীর বিবাহ একটা প্রহসন, তাহাও ছিল অর্ধসমাপ্ত, কারণ পাচকঠাকুরের দাবী সম্পূর্ণ না মিটাইতে পারায় সেই কুলীন বর কুশণ্ডিকা না করিয়াই পলায়ন করে। সুরলক্ষ্মী লোক-লজ্জায় ও গ্লানিতে ছয় মাসের মধ্যে মারা যায়। রাজলক্ষ্মীকে লইয়া তাহার মাতা কাশীতে যান এবং সেখানে এক রাজকুমারের কাছে তাহাকে বিক্রয় করেন। এই রাজকুমার ইহাকে রক্ষিতা হিসাবেই গ্রহণ করিয়া থাকিবেন এবং রাজলক্ষ্মী যে বারবার তাহার কালিমা-লিপ্ত প্রথম জীবনের উল্লেখ করিয়াছে তাহা ইহার সঙ্গে সংস্রবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই করিয়া থাকিবে। স্বল্পকালের মধ্যেই এই রাজকুমারের মৃত্যু হইয়া থাকিবে। তাহার মৃত্যুর পর এক হাজার টাকার বিনিময়ে রাজলক্ষ্মীর মা তাহাকে দ্বিতীয় এক রাজকুমারের কাছে বিক্রয় করেন। কিন্তু রাজলক্ষ্মী তখন বড়

হইয়াছে, সে আর এই জাতীয় সম্পর্কে রাজী হইল না। সে তাহার মাকে দেশে পাঠাইয়া দিল ; টাকা লইয়া দেশে আসিয়া মা রটনা করিয়া দিলেন কাশীতে রাজলক্ষীর মৃত্যু হইয়াছে। রাজলক্ষী রাজকুমারের টাকা পরিশোধ করার ভিন্ন উপায় আবিষ্কার করে। এক বৃদ্ধ মুসলমান ওস্তাদের সস্নেহ আশ্রয়ে সে সঙ্গীত ও নৃত্যে পারদর্শী হইয়া পিয়ারা বাইজী নাম গ্রহণ করে এবং সেইভাবেই অর্থ উপার্জন করিয়া দ্বিতীয় রাজকুমারের ঋণ শোধ করে। তাঁহার তাঁবুতেই শ্রীকান্তের সঙ্গে রাজলক্ষীর সাক্ষাৎ হয় এবং অন্ততঃ আর একটি মুজরার বিবরণও আমরা দ্বিতীয় পর্বে পাই। সেই যজ্ঞের যজমান পূর্ণিয়া জেলার জমিদার রামচন্দ্র সিংহ।

সামাজিক নীতির দিক হইতে এই জীবন পঙ্কিল মনে হইলেও পিয়ারী তাহার ধর্ম রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। দুইটি পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তি তাহাকে ধর্মের পথে অবিচল রাখিয়াছিল। প্রথমতঃ সেই যে নয় বৎসর বয়সে সে শ্রীকান্তকে মাল্যদান করিয়া বরণ করিয়াছিল সেই নবীন প্রেমের দীপ সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও অম্লান ছিল এবং ইহাই তাহাকে শুচিতা রক্ষা করিতে সাহায্য করিয়াছিল। আর একটি শক্তিও তাহার সহায়ক হইয়াছিল। তাহার বিবাহ একাধারে ট্র্যাজেডি ও প্রহসন, কিন্তু যে স্বামীর সঙ্গে বিবাহই সম্পূর্ণ হয় নাই, যাহার সহিত সে কোনদিন বসবাস করে নাই তাহার সঙ্গে মন্ত্রপড়া সম্পর্ককে সে অস্বীকার করিতে পারে নাই। বিরিঞ্চি দত্তদের সেই ষাট বছরের বৃদ্ধ পাচকের মৃত্যুর পর সে নিজেকে বিধবা বলিয়া মনে করিয়াছে এবং তাহারই অন্য স্ত্রীর পুত্র বঙ্কুকে সে পুত্রবৎ পালন করিয়া সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বঙ্কুর প্রতি মাতৃস্নেহ ও সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কুর পিতার প্রতি অনুরক্তি এবং শ্রীকান্তের প্রতি আসক্তি, এই দুই সম্মিলিত শক্তি তাহাকে রাজপুত্র বা জমিদারের লালসামত্ত দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতে সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু ইহারা পরস্পরবিরোধী। রাজলক্ষী আচারপরায়ণ, ধর্মবিশ্বাসী, এমন কি মন্ত্রের উচ্চারণের শুদ্ধতার জন্য উদ্‌গ্রীব। ইহার লক্ষ্য কি? পাপ-স্খালন? না, পতিব্রতা-সতী নারীর স্বর্গলাভ? না, পরজন্মে শ্রীকান্তকে স্বামীরূপে পাওয়া? এই নানা ভাবের মিলন ও সংঘাতে এই পরমাশ্চর্য রমণীর চরিত্রের বৈচিত্র্য ও রহস্য প্রগাঢ়তা লাভ করিয়াছে।

শ্রীকান্তের সঙ্গে সে যখন বঙ্কুর পরিচয় করাইয়াছিল তখন বলিয়াছিল, 'আমার সতীন-পো। কিন্তু বঙ্কু আমার পেটের ছেলেই।' এই বঙ্কুর উপস্থিতিতে

শ্রীকান্ত বেমানান হইয়া পড়ে, এই জন্যই সে শ্রীকান্তকে দূরে সরাইয়া দিল। শরৎসাহিত্যে অনেক জায়গায়ই মাতৃস্নেহ উৎসারিত হইয়াছে অপরের গর্ভজাত সন্তানের জন্য ; এই প্রসঙ্গে বিন্দু, নারায়ণী, কুসুম, হেমাঙ্গিনী, ভবানী প্রভৃতির কথা সহজেই মনে হইবে। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর চরিত্র অনেক বেশী বৈচিত্র্যময় এবং স্ববিরোধিতার মধ্য দিয়াই সে আপন সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছে। কিছু দিন পরেই শ্রীকান্ত আবিষ্কার করিল পরের ছেলের মা হইয়া যে মাতৃত্ব লাভ করা যায় তাহা অন্ততঃ রাজলক্ষ্মীর পক্ষে যথেষ্ট নয়। বর্মা হইতে ফেরার পর তাহার আচরণ দেখিয়া শ্রীকান্ত আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছে, 'আজ পরিণত যৌবনের সুগভীর তলদেশ হইতে যে মাতৃত্ব সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে, সদ্যনিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণের মত তাহার আহার মিলিবে কোথায় ?...তাই আজ একমাত্র বঙ্কুই তাহার কাছে পর্যাপ্ত নয়, আজ দুনিয়ার যেখানে যত ছেলে আছে, সকলের সুখদুঃখই তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছে।' কিন্তু শ্রীকান্তের সান্নিধ্যেই এই আলোড়ন সঞ্চারিত হইয়াছে। নর-নারীর যে মিলনে নারী মাতৃত্ব লাভ করে ইহা সেই মিলনেরই আকাঙ্ক্ষা। আবার এত কাছে আসিয়াও শুধু শ্রীকান্তের সঙ্গে একা গাড়িতে চলিতে সে লজ্জিত বোধ করিয়াছে। প্রাচীন আলংকারিকেরা—এবং আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা—মনে করেন যে, স্ত্রীলোকের লজ্জা মন্মথ-পীড়ারই লক্ষণ। আবার ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এই সময়ই সে অভয়ার স্বামিত্যাগ পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করিতে পারে নাই, কারণ স্বামী পুরুষমানুষ, সে তো উচ্ছৃঙ্খল বা অত্যাচারী হইবেই ; তাই বলিয়া স্ত্রীর স্বামিপরিত্যাগ ক্ষমা করা যায় না। আবার ইহার পরই সে শ্রীকান্তের একমাত্র সঙ্গিনী হইয়া প্রয়াগ যাইতে চাহিয়াছে। সেইখানে বাধা দিয়াছে শ্রীকান্তের সম্ভ্রমবোধ এবং ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া সে যেন আবার বাইজী জীবন শুরু করিয়া শ্রীকান্তের মনে ঈর্ষা জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু 'আহত ফণিনী'র এই তর্জন ক্ষণেকের জন্য। একটু পরই সে আবার নতশিরে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। অবশেষে শ্রীকান্ত তাহাকে স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিলে সে সানন্দে সেই পরিচয় শিরোধার্য করিয়া গ্রামের ঠাকুর্দা ও ডাক্তারবাবুকে প্রণাম করিয়াছে।

কিন্তু এই মিলনের মধ্যেও ব্যবধান ঘুচিল না। অভয়া যে ভাবে স্বামিত্যাগ করিয়াছিল রাজলক্ষ্মী তাহা পারিল না। গঙ্গামাটিতে সুনন্দার সাহচর্যে সে এমন উগ্র ধর্মচর্চায় ব্যাপৃত হইল যে, শ্রীকান্তের প্রতিও অবহেলা হইল। এই ধর্মচর্চার মধ্যে শ্রীকান্তের কোন স্থান নাই। সুতরাং শ্রীকান্তও বর্মায় ফিরিয়া

যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। যাওয়ার সময় সে পুঁটুকে বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিতে পা বাড়াইল। কিন্তু সে পা বাড়ানো পর্যন্তই। রাজলক্ষ্মীকে এই সংবাদ দিতেই সেই রহস্যময়ী রমণীর পরিণত যৌবনের তলদেশ হইতে যে প্রেম সদ্য-নিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণের মত জাগ্রত হইল তাহাকে প্রতিহত করিবার সাধ্য শ্রীকান্তের নাই। এখন দেখা গেল বঙ্কুর মা হওয়ার প্রতিষ্ঠা আবার মাথা তুলিয়াছে; রাজলক্ষ্মী নিজেই বলিয়াছে, 'বঙ্কু বেঁচে থাক, সে বড় হয়েছে, তার বৌ এসেছে—তোমার বিবাহের পর তাদের সুমুখে আমি বার হব কোন্ মুখে?' বঙ্কুর বাবার সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর সম্পর্ককে যথোচিত মর্যাদা দেওয়ার জন্যই শ্রীকান্তকে চিরকুমার থাকিয়া রাজলক্ষ্মীর উপগ্রহের মত ঘুরিতে হইল—না পাইল কাছে যাইবার অধিকার, না পাইল দূরে যাইবার অনুমতি। এই 'বিচিত্র বৈধব্যে'র মধ্যে বঙ্কুর মূল্য ওঠানামা করে। যখন শ্রীকান্ত পুঁটুর দিকে অগ্রসর হইয়াছে তখন রাজলক্ষ্মী বঙ্কুর কথা ভাবিয়াছে; কিন্তু যখন কমললতার নিকট হইতে শ্রীকান্তকে আগলাইবার প্রয়োজন হইয়াছে তখন বঙ্কুর পিতা ও সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কু বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। শ্রীকান্তকে লইয়া সে যখন নূতন করিয়া গঙ্গামাটিতে যাইবার প্রস্তাব করিল তখন দেখা গেল যে বঙ্কুর বাবার সঙ্গে তাহার বিবাহই সম্পূর্ণ হয় নাই। তাই সে বলিল যে, বঙ্কুর সঙ্গে তাহার শুধু প্রতিপালিকার সম্পর্ক—'আর কিছু মানব না। নিকট আত্মীয় সে আমার নয়।' এই প্রসঙ্গে সে বলিয়াছে যে এবার তাহাদের পরিবেশ বদলাইবে, সে নিজে বদলাইবে এবং কমললতার নতুন গোঁসাইকে সে এমনভাবে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে যে সে আর কমললতার পথে-বিপথের সঙ্গী হইতে পারিবে না। এই পরিবর্তনের কোন পরিচয় গ্রন্থমধ্যে নাই। কিন্তু ইহা আর যাহা হউক, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ নয়। যে ব্যবধান উভয়ের মধ্যে ছিল তাহা অন্যরূপে দেখা দিবে; হয়ত শ্রীকান্ত বজ্রানন্দের সহকর্মী ও পৃষ্ঠপোষকে রূপান্তরিত হইবে। যে বেদনাবিধুর যাত্রার বর্ণনায় তৃতীয় পর্বের পরিসমাপ্তি হইয়াছে সেইখানেই রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্ত কাহিনীর যবনিকা পড়া উচিত ছিল। কমললতা-উপাখ্যানের সার্থকতা না আছে তাহা নহে, কিন্তু মনে হয় চতুর্থ পর্বে রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের একত্র বসবাসের যে ব্যবস্থা করা হইল তাহা যেন মিলনান্ত পরিণতির প্রয়োজনে শিল্পকলার আত্ম-সমর্পণ। 'দিদি' উপন্যাসে সুরমা ও অমরের এবং 'কাশীনাথ' গল্পে কাশীনাথ ও কমলার মিলনেও এইরূপ জবরদস্তির চিহ্ন আছে।

মানুষের চরিত্র অনন্ত জটিলতায় আকীর্ণ, তাহার গভীরতা অপরিমেয়। বুদ্ধি

দিয়া আমরা ইহাকে সহজ, সরল করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে ইহার দুর্বোধ্য রহস্য ও গভীরতা এবং অসঙ্গতির মধ্যে সুসঙ্গতি প্রতিফলিত হইয়া থাকে। বিশ্লেষণের মধ্য দিয়াই ইহার বিশ্লেষণাতীত জটিলতা ও মহিমা ধরা পড়ে। এই ভাবেই রাজলক্ষ্মী সমস্ত আখ্যায়িকাকে ঐক্য দান করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে অন্নদাদিদি বা অভয়ার দেখা হয় নাই, কিন্তু তাহাদের কাহিনী পাশে রাখিলেই রাজলক্ষ্মীর কাহিনী প্রকৃত তাৎপর্য লাভ করে। অন্নদাদিদি যে-ভাবে শাহ জীকে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করিয়াছিল, অথবা অভয়া যেরূপ অতি সহজে রোহিণীবাবুকে পথে বর্জন করিয়া স্বামীর সংসার করিতে গিয়াছিল আবার তেমনি স্বামীর দ্বারা নির্যাতিত হইয়া রোহিণীর প্রেমকে সার্থক করিতে আসিয়াছিল তাহা রাজলক্ষ্মীর পক্ষে সম্ভব হইত কি? রাজলক্ষ্মী পত্রযোগে অভয়াকে শতকোটি প্রণাম জানাইলেও অভয়া যত সহজে 'সতীনাম' কিনিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে রাজলক্ষ্মী তত সহজে অসতী নাম গ্রহণ করিতে রাজি হইত না। তাহার সমস্ত কার্যেই অপরিসীম আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মানবোধ এবং সকল বাধাকে তুচ্ছ করিবার শক্তি সুস্পষ্ট হইয়াছে। ইহার সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে প্রেমাতুর হৃদয়ের 'চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা'। এই সব পরস্পর-বিরোধী ভাব মিশ্রিত হইয়া এই চরিত্রকে অনন্যতা দান করিয়াছে। কমললতা কীর্তন গান করিয়া শ্রীকান্তের মনোহরণ করিয়াছে এই ধারণা করিয়া সে পাল্লা দিয়া কীর্তন গান করিয়া তাহার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিয়াছে। আবার প্রেম মানুষের মনে যে স্বচ্ছতা, সরলতা আনয়ন করে তাহার দ্বারাই কমলতা তাহার কলঙ্কিত অতীত জীবনের আবরণ উন্মোচন করিয়াছে। সেইখানেও সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া নিজের অতীত কাহিনী বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐ 'দর্পিতা'—বিশেষণটা শ্রীকান্তের দেওয়া—নারী সমস্ত খুলিয়া বলিতে পারে নাই। এখনও সে শুধু বলিতে পারিয়াছে, 'তুমি জানো ছেলেবেলায় মা আমাকে এক রাজপুত্রের হাতে বিক্রি করে দিয়েছিলেন।' এই বিক্রির তাৎপর্য সে বিশদ করিয়া বলিতে পারে নাই। সে পূর্বে দুর্দিনের রাত্রি, কালো মেঘের দ্বারা জ্যোৎস্নার আচ্ছাদন প্রভৃতি অলংকার ও শব্দচ্ছটায় তাহা ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। এখন সেই চেষ্টা করিল না, কিন্তু কমললতার মত সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেও পারিল না।

৬

কমললতা এই উপন্যাসে খানিকটা খাপছাড়াভাবে প্রবেশ করিয়াছে। হয়ত তাহার কথা আগের দিকে আসিলে ইহা ন্যায্য স্থান পাইত। কিন্তু তাহার কাহিনী ও চরিত্রও বিস্ময়কর এবং এই উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সেও রাজলক্ষ্মীর মত বিধবা ও কলঙ্কিনী এবং তাহার কলঙ্কের কাহিনী সে সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত করিতে পারিয়াছে। এক জীবনে যে সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া সে গিয়াছে আনন্দবেদনা, জুগুপ্সা ও মোহভঙ্গের প্রাবল্যে তাহা বহু জীবনের সঙ্গে তুলনীয়। সে বিধবা, ব্রহ্মচর্য তাহার ধর্ম, কিন্তু কূলপ্লাবী প্রেমের স্রোতে তাহার ব্রহ্মচর্য-ব্রত ভাসিয়া গিয়াছে। আবার ইহার পরে তাহার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহা অপ্রত্যাশিত ও হৃদয়বিদারক। জীবনে সবচেয়ে প্রিয় মনে করিয়া যাহার কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল সেই 'কৌমারহর' বরের বহিরাবরণের অন্তরালে সে এক অর্থলোলুপ, মিথ্যাবাদী পাষণ্ডকে আবিষ্কার করিল এবং তাহার মিথ্যাভাষণের বলি হইল তাহারই নিষ্পাপ ভ্রাতুষ্পুত্র। এই পাষণ্ডের সংসর্গে আসার ফলে যে সন্তান সে গর্ভে ধারণ করিয়াছিল সেও বাঁচিল না। ইহার পর কণ্ঠিবদলের বৈষ্ণব স্বামীর বিরুদ্ধে তাহার মন অপরিসীম ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার মন অভয়ার মত বিদ্রোহের পথ গ্রহণ করিল না। সে প্রকৃত বৈষ্ণবের মত নিজেকে কৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া দিয়া সমস্ত ব্যক্তিগত ভাবনা এবং সুখদুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিল। তাহার বৈষ্ণবীর জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সে যে আরও পুরুষের কামনা জাগ্রত করে নাই তাহা নহে, কিন্তু সে যেন ঐ সকল ব্যাপার হইতে ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে। অথবা মনে করা যাইতে পারে সে এখন সবার নীচে, সবার পিছে, সবহারাদের মাঝে। গহর কবির প্রবল অথচ বিশুদ্ধ অনুরাগ সে উপলব্ধি করিতে পারে এবং তাহাকে সেবা করিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছাড়িয়া গিয়াছে। গহর গোঁসাইয়ের প্রেম অথবা আশ্রমের রূঢ় বিচার তাহার মনের উপর ইহার অধিক রেখাপাত করিতে পারে নাই। তাহার প্রথম স্বামীর নাম ছিল 'শ্রীকান্ত'; এই নামটি তাহার মনে ক্ষণিক স্পন্দন জাগাইয়াছে, এবং তীক্ষ্ণধী শ্রীকান্ত তাহার মানসিক স্থৈর্য, উদারতা ও নম্রতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। ইহা দেখিয়া 'দর্পিতা', স্বাধিকার সম্পর্কে সচকিতা রাজলক্ষ্মী সন্ত্রস্ত হইয়াছে। কিন্তু কমললতা কৃষ্ণগতপ্রাণা বৈষ্ণবী, নিজের বলিয়া কোন কিছুই রাখে নাই; তাই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহার মনে বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার

করিতে পারে নাই। সে শ্রীকান্ত বা গহরকে ভালবাসিতে পারে; কিন্তু এই ভালবাসা অপেক্ষাও সত্য তাহার ঠাকুরসেবা, তাহার কৃষ্ণপ্রেম। যখন সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় এক বস্ত্রে সে বৃন্দাবনের উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল, তখন শ্রীকান্তকে বলিয়াছিল যে শ্রীকান্ত অনুরোধ করিলে সে আবার আশ্রমে আসিবে। কিন্তু ইহা কথার কথা মাত্র, কারণ সে জানে তাহাদের আর দেখা হইবে না। বিদায়ের আগে বলিয়া গেল, 'আজ বিশ্বাস করে আমাকে তুমি তাঁর পাদপদ্মে স'পে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও, নির্ভয় হও। আমার জন্য ভেবে ভেবে আর তুমি মন খারাপ করো না গোঁসাই, এই তোমার কাছে আমার শেষ প্রার্থনা।' বোধহয় ইহাই একমাত্র প্রেম যেখানে কোন ব্যবধান নাই।

তৃতীয় পর্ব - ২

'মধুর' রস ও শৃঙ্গার রস

১

শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীন' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন 'শ্রীকান্ত' লিখিবার অনেক আগে এবং 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্ব লিখিয়াছিলেন শেষ পর্যায়ে, 'দেনা-পাওনা', 'শেষ প্রশ্ন' প্রভৃতিরও পরে। তবু আলোচনার সুবিধার জন্য 'শ্রীকান্ত'কে পরিণতি পর্বের পুরোভাগে স্থাপিত করিয়াছি। মনে হয় তাহা হইলে শরৎচন্দ্রকে বোঝা সহজ হইবে।

একটা বিষয়ে 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য আছে—তাহা ইহার নামকরণ হইতেই বুঝা যায়। সাধারণ বিচারে সতীশকে 'চরিত্রহীন' বলা যাইতে পারে। সে অশিক্ষিত অথবা অল্প-শিক্ষিত, মদ্যপ, নেশাখোর, তাহার ইয়ার-বন্ধুরাও অনেকেই চরিত্রহীন। কিন্তু তাহা হইলেও হৃদয়ের প্রশস্ততায়, দৈহিক ও নৈতিক বলে এবং সৎসাহসে সে কাহারও অপেক্ষা ছোট নয়; বরং তাহার সংস্কারমুক্ত ঔদার্যের কাছে আমাদের রক্ষণশীল সমাজপতিরা মাথা হেঁট করিবেন। অথচ তাহার চরিত্রের বিভিন্ন দিক, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এমন সরলভাবে উদ্ঘাটিত হইয়াছে, উপন্যাসের প্লট খানিকটা অসংলগ্ন হইলেও কাহিনী ও চরিত্রের সুসঙ্গতি এত সহজভাবে রক্ষিত হইয়াছে যে কোথাও মনে হয় না যে গ্রন্থকার জোর করিয়া কিছু চাপাইয়া দিতেছেন। যে সতীশ বিপিনবাবুদের অভ্যাগমে আলো নিভাইয়া অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে, সাবিত্রীর আঁচল ধরিয়াছে এবং যে সতীশ থাকোবাবার প্রভাবে কারণবারি সহযোগে তান্ত্রিক সাধনায় লিপ্ত হইয়াছে, সেই সতীশই অবলীলাক্রমে আরাকান চলিয়া গিয়াছে, কোন নীতিশাস্ত্রের পরোয়া না করিয়া কিরণময়ী ও দিবাকরকে সেখানকার পঙ্কিল জীবন হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে। শ্রীকান্তের সঙ্গে সতীশের বিশেষ কোন মিল নাই, শ্রীকান্ত কখনও কোন রকমে অসংযমের পরিচয় দেয় নাই, আবার সতীশের মত কিরণময়ী-উদ্ধারের অভিযানে লিপ্ত হয় নাই। কিন্তু একটা বিষয়ে ইহাদের মিল আছে, তাহা হইল সামাজিক বিধিনিষেধের অন্তরালে মানুষের মনুষ্যত্বকে চিনিতে পারার ক্ষমতা। একটি উপন্যাসে শরৎচন্দ্র মদ্যপ সতীশকে 'চরিত্রহীন' বলিয়া স্বীকার করিয়া নায়কের

পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং অন্য উপন্যাসে তিনি মৎস্যচোর, সিদ্ধিখোর, গাঁজাখোর ইন্দ্রনাথকে মহামানবরূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

'চরিত্রহীন' ও 'শ্রীকান্ত'র মধ্যে প্রধান সাদৃশ্য পদস্খলিতা অথচ বিশুদ্ধ-চরিত্রা নায়িকা। সাবিত্রী ও রাজলক্ষ্মী উভয়েই বালবিধবা, উভয়েই পাপপথে প্রলুব্ধ হইয়াছে, কিন্তু ইহারা উভয়েই স্বকীয় মনোবলের দ্বারা নিজেদের শুচিতা রক্ষা করিয়াছে। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সাবিত্রী অবস্থাবিপর্যয়ে মেসের সাধারণ ঝির কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাকে মোক্ষদা, বিধু প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর সম্ভ্রমহীন, চরিত্রহীন মেয়েদের পরিবেশে স্থাপন করিয়া এবং বিপিন প্রভৃতি মাতাল, উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের সমাবেশ করিয়া গ্রন্থকার নোংরামি ও শুচিতার তীব্র বৈপরীত্যের চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। উপন্যাসের শেষের দিকে সঙ্কোচলেশহীন পাপীয়সী কামিনী বাড়িউলী এবং পুণ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিণী বৈদগ্ধ্যশালিনী কিরণময়ীকে পাশাপাশি বসাইয়া তিনি অনুরূপ বৈপরীত্যের আর একটি তীব্রোজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়াছেন।

সাবিত্রী রাজলক্ষ্মীর সমগোত্রীয়া হইলেও তাহার চরিত্রচিত্রণে সেই ব্যাপ্তি বা বৈচিত্র্য নাই যাহার জন্য রাজলক্ষ্মী বঙ্গসাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সে রাজলক্ষ্মীর মত ঐশ্বর্যশালিনী নয়, রাজলক্ষ্মীর মত অনন্ত শক্তিমত্তাও তাহার নাই। সেই কারণেই তাহার চরিত্র স্বচ্ছ, সরল ; সে নিজেই তাহার কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে এবং মোক্ষদাও তাহার কুলত্যাগের নিষ্পাপ ইতিহাস বিবৃত করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তাহার 'পদস্খলন' হয় নাই। তবু যে দেহের দ্বারা সে অপরকে প্রলুব্ধ করিয়াছে তাহা সে প্রেমাস্পদকে দিতে পারে না। এই কারণেই সতীশ ও তাহার মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তাহা সে ঘুচাইতে পারে নাই। বরং ইহাকে সে চিরস্থায়ী করিতে চাহিয়াছে। এইজন্য সে সতীশকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে ; সতীশ ও সরোজিনীর বিবাহে সে অন্তরায় হয় নাই। রাজলক্ষ্মীর মত প্রবল ব্যক্তিত্বের অভাবের জন্যই এই দীর্ঘ উপন্যাসের অনেক জায়গা শিথিল বলিয়া মনে হয়। 'শ্রীকান্ত' এক ভবঘুরে ছন্নছাড়া লোকের ভ্রমণ-কাহিনী, কিন্তু রাজলক্ষ্মী যেন আপন গতিবেগপ্রাবল্যে সবাইকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। অন্য সব কাহিনীই যেন তাহার অভ্যাগমের জন্য প্রস্তুতি অথবা তাহার চরিত্র ও আখ্যানের উপর আলোকসম্পাতের উপায় মাত্র। সাবিত্রীর সেই শক্তি নাই। কিরণময়ীর স্বাতন্ত্র্য এত উগ্র, তাহার চরিত্র এমন বিচিত্র যে সে কাহারও

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে এমন প্রত্যাশা করা যায় না। ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, কিরণময়ীর উপকাহিনী একান্তভাবে তাহারই কাহিনী। কিন্তু সরোজিনী-উপাখ্যানের সঙ্গেও সাবিত্রীর কোন সম্পর্ক নাই। সেই কারণেই জ্যোতিষ, শশধর প্রভৃতি যখনই প্রবেশ করিয়াছে তখনই উপন্যাসের গতি মন্থর হইয়াছে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে অন্যান্য বিষয়ের প্রাচুর্যের মত হাস্যরসও বহুল পরিমাণে উৎসারিত হইয়াছে। 'চরিত্রহীন' এই বিষয়েও 'শ্রীকান্ত' অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু উভয় উপন্যাসের রসিকতার মধ্যে নিম্নশ্রেণীর লোকের উদ্দেশে বর্ষিত প্রীতিপূর্ণ ব্যঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায়। বেহারীর মধ্যে রতনের বর্ণবৈচিত্র্য নাই, কিন্তু সেও রতনের মতই স্নেহ ও কৌতুকের পাত্র। শ্রীকান্ত মহাভারতে বশিষ্ঠ মুনির পায়ে ধরিয়া জগাই মাধাইয়ের মুক্তিলাভের কথা বলিয়া সন্ন্যাসীর কৃপা লাভ করিয়াছিল। সতীশদের মেসের পাচক চক্রবর্তী ঠাকুর নিমাইসন্ন্যাস হইতে 'মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমং' এই শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া বেহারীর কাছে তাহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছে। বেহারী ব্রাহ্মণকে দেবতার মত ভক্তি করে; সুতরাং চক্রবর্তী ঠাকুরের শাস্ত্রজ্ঞান ও ভূয়োদর্শনে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস। আর ইহাও লক্ষ্য করিবার মত যে, যে মানদণ্ডের দ্বারা চক্রবর্তী হিন্দুস্থানী ভৃত্যের বিদ্যার পরিমাপ করিয়াছে তাহা বেহারীর আয়ত্তের মধ্যে।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসের অন্যতর প্রধান নারী চরিত্র কিরণময়ীর বিষয় প্রসঙ্গান্তরে আলোচিত হইবে। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে উপেন্দ্র সতীশের পরিপূরক; ইহারা বৈপরীত্য ও সহৃদয়তার দ্বারা একে অপরকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। উপেন্দ্র উচ্চশিক্ষিত, নীতিনিষ্ঠ, চরিত্রবান্, আর সতীশ প্রায় অশিক্ষিত, উচ্ছৃঙ্খল, 'চরিত্রহীন', কিন্তু একে অপরের প্রতি অনুরক্ত। উপেন্দ্র তাহার স্ত্রীর প্রতি অত্যধিক স্নেহপরায়ণ আর সরলা সুরবালার যুক্তিতর্কের অতীত, নিশ্ছিদ্র পতিভক্তি এত গভীর ও হৃদয়স্পর্শী যে প্রখর-বুদ্ধিশালিনী, কূটতর্কে পটিয়সী, অসতী কিরণময়ী পর্যন্ত তাহার কাছে পতিভক্তি শিক্ষা করিতে চাহিয়াছে। উপেন্দ্র-সুরবালার সম্পর্ককে দাম্পত্যপ্রেমের আদর্শ বলিয়া উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। কিন্তু মনে হয় ইহার মধ্যেও ফাঁক আছে; যেন একে অপরকে বুঝিতে পারে না এবং সেই চিরপরিচয় মাঝে অপরিচয়কে ঢাকিবার জন্যই আদরযত্নের আতিশয্য করে। পরবর্তীকালে লিখিত 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের বিপ্রদাস ও সতীর সম্পর্কও এইরূপ পরিপূর্ণ এবং সর্বাঙ্গ-

সুন্দর অথচ অভ্যন্তরে ফাঁকা বলিয়া মনে হয়। সুরবালা ও সতী উভয়েই স্বল্পায়ু; উভয়েই স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া মহাপ্রয়াণ করিয়াছে। কিন্তু কেহই স্বামীকে বুঝিতে পারে নাই এবং যেখানে ইহারা স্বতন্ত্র, স্বকীয় ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন সেইখানে ইহাদের ধীমান্, কর্তব্যপরায়ণ, প্রেমপূর্ণ স্বামীরা প্রবেশ করিতেই পারে নাই। এই হিসাবে ইহাদের অপ্রত্যাশিত, অকালমৃত্যু রূপক ব্যঞ্জনা আক্ষিপ্ত করে। সমস্ত প্রেমের মধ্যেই এই চিরবিরহের বীজ রহিয়াছে এবং ইহারই কথা রবীন্দ্রনাথ 'মেঘদূত' কবিতায় এবং প্রাচীন সাহিত্যে লিখিয়া গিয়াছেন :

কে দিয়েছে হেন শাপ কেন ব্যবধান ?
কেন উর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ ?

২

'দেনাপাওনা'র নায়িকা অলকা-ষোড়শীর সঙ্গে 'শ্রীকান্ত'র নায়িকা রাজলক্ষ্মী-পিয়ারীর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই লক্ষণীয়। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে বৈঁচিমালা দিয়া বরণ করিয়াছিল ন'বছর বয়সে আর অলকাকে তাহার মা জীবানন্দের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিল ন-দশ বছর বয়সে। অল্পবয়সেই রাজলক্ষ্মী ও তাহার দিদির বিবাহ হয় দত্তদের পাচকঠাকুরের সঙ্গে। অলকা ও রাজলক্ষ্মীর বিবাহের নির্ধারিত যৌতুক ছিল একশত টাকা এবং পরে বর পঁচাত্তর টাকায় নামিয়া আসে। রাজলক্ষ্মীর অভিভাবকরা যৌতুকের সম্পূর্ণ টাকা দিতে না পারায় বিবাহ অসম্পূর্ণ রাখিয়াই বর পলায়ন করে। অলকার মা ছিল কলিকাতায় হোটেলের পাচিকা। অনেক কষ্টে সঞ্চিত পুরো একশ টাকাই সে জামাতা জীবানন্দকে যৌতুক হিসাবে দিয়াছিল। কিন্তু প্রতারক, উচ্ছৃঙ্খল জীবানন্দ বিবাহরাত্রেই পলায়ন করে। স্বামী-স্ত্রীতে আর সাক্ষাৎ হয় নাই। দত্তদের পাচকঠাকুরও কলিকাতায় হোটেলে কর্মরত অবস্থায় মারা যায়—এই সংবাদ রাজলক্ষ্মীরা পাইয়াছিল। বিবাহ অসম্পূর্ণ থাকিলেও এবং রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে স্বামীর আর সাক্ষাৎ না হইলেও সনাতন হিন্দুধর্মের অপৌরুষেয় শাস্ত্রানুসারে রাজলক্ষ্মী বিধবা।

অলকার ইতিহাস আরও বিসর্পিত। হিন্দুসমাজে এক জাতীয় স্ত্রী-

মোহান্তের ব্যবস্থা আছে যাঁহারা সধবা কিন্তু স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কহীনা। তাঁহারা দশমহাবিদ্যার নাম গ্রহণ করিবেন এবং মহাশক্তির উপাসিকা হইবেন। বলা বাহুল্য দেবীর নামে উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি বা মন্দিরের আয়ের তাঁহারাই কার্যত মালিক হইবেন। অলকার স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হওয়ায় এবং চণ্ডীগড় গ্রামে চণ্ডীর মন্দিরের ভৈরবী মাতঙ্গিনীর স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গেলে সেই স্থানে অলকার পিতা তারাদাস স্বীয় কন্যাকে ষোড়শী নামে শূন্য পদে প্রতিষ্ঠিত করে। রাজলক্ষ্মী তাহার প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে আকস্মিকভাবে এক জমিদার পুত্রের তাঁবুতে মুজরা করিতে আসিয়া। প্রথম দর্শনেই রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে চিনিতে পারিয়াছে। কিন্তু যদি বা শ্রীকান্ত বিধবা বিবাহে রাজি হইত, রাজলক্ষ্মীর পক্ষে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় নাই। যে সকল প্রবৃত্তি ও যুক্তির দ্বারা তাহার চিত্ত আন্দোলিত হইয়াছে তাহাই 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের মূল বক্তব্য বিষয়।

অলকার সমস্যা অন্য রকমের। ইহা সরল হইলেও সহজ নয়। লম্পট, মদ্যপ জমিদার জোর করিয়া তাহার নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে চায়, সেও এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে বদ্ধপরিকর। তাহার জীবনের যে পর্বে সে পহুঁছিয়াছে সেখানে সে ষোড়শী ভৈরবী, দেবীর উপাসিকা; দেবীর সম্পত্তি আগলানো, দেবোত্তর সম্পত্তির প্রজাদের রক্ষা করাই তাহার প্রধান কর্তব্য, দায়িত্ব এবং ইহাই তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে, পিতা তাহার সঙ্গে থাকিলেও তাহার নিজের সাংসারিক কোন সম্পর্ক নাই; ষোড়শীর মধ্যে অলকা নিঃশেষে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া জীবানন্দের সঙ্গে দেখা করার ফলে তাহার জীবনে আমূল পরিবর্তন আসিয়া গেল। এই অভিজ্ঞতা যুগপৎ প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত। যে জীবানন্দ কোন নিয়ম মানে না, কোন সংকোচ যাহাকে বাধা দিতে পারে না, কোন অন্যায় করিতে যে পশ্চাৎপদ হয় না, সে যে তাহারই স্বামী ইহা বুঝিতে ষোড়শীর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হইল না। ন-দশ বছরের বালিকার এইরূপ অনপনেয় স্মৃতি শুধু-ইহাই প্রমাণ করে যে অজ্ঞাতসারে ভৈরবীর হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে অলকা সঙ্গোপনে আত্মরক্ষা করিয়া ছিল। এদিকে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার ফলে জীবানন্দ কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিল। সেই মুখোমুখি সাক্ষাৎ বা সংঘর্ষের রাত্রিতে বাধ্য হইয়া জীবানন্দকে শুশ্রূষা করিতে জীবানন্দের শয়নকক্ষে ষোড়শীকে রাত্রি কাটাইতে হইয়াছিল।

করুণার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া হউক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক পরপুরুষের সঙ্গে রাত্রি যাপন করিয়া ষোড়শী সমাজের চোখে আর পূর্ব সম্ভ্রম বা মর্যাদা দাবী করিতে পারিত না। কিন্তু ষোড়শীর মন সেই সম্ভাবনার দ্বারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। তাহার সমস্যা অন্তরের সমস্যা; ইহা তাহার দেহ ও মনকে আন্দোলিত ও পর্যুদস্ত করিয়াছে। প্রথমত, সে স্বামীকে স্পর্শ করিয়াছে, ইহার পর সে আর দেবীর সেবায়েত থাকিতে পারে না, চণ্ডীগড়ের সম্পত্তির উপর তাহার আর কোন অধিকার থাকিতে পারে না। যেমন স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার পূর্ববর্তিনী মাতঙ্গিনী ভৈরবীকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তাহাকেও সেই ভাবেই চলিয়া যাইতে হইবে। অবশ্য জীবানন্দ তাহাকে চিনিতে পারে নাই, তাহার পিতা তারাদাস তাহার বিবাহের সময় উপস্থিত ছিল না, যে মাতা তাহাকে বিবাহ দিয়াছিল, সে বহুদিন পূর্বে কাশীতে দেহত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু ষোড়শী তো সাধারণ ভৈরবী বা মোহান্তের মত নয়; যে ধর্মকার্যে সে নিয়োজিত হইয়াছিল তাহাকে সে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং ধর্মজীবনের অবশ্যপালনীয় শর্ত ভঙ্গ করার পর সে আর তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহার সমস্যা ও ট্র্যাজেডি আরও গভীর এবং সেইখানেই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব।

জীবানন্দের সঙ্গে অলকার বিবাহ হইয়াছিল অনেক আগে যখন সে কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছে। কিন্তু পরশুরাম একাধিক গল্পে—'তিলোত্তমা' 'নির্মোকনৃত্য' প্রভৃতিতে যে 'নারীসত্তা'র অলীকতা লইয়া কৌতুক করিয়াছেন তাহার অর্ধেক পুরুষের কল্পনা হইলেও অপরার্ধ বাস্তব; তাহা নারীর অন্তরে বাসা বাঁধিয়া থাকে এবং তাহা অপরাজেয়, অবিনশ্বর। জীবানন্দকে স্পর্শ করিয়া, তাহাকে শুশ্রূষা করিয়া অলকা ভৈরবী জীবনের অসারতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। ইহার সমস্ত জাঁকজমক, ক্ষমতা, ধর্মীয় আকর্ষণ নারীসত্তার জাগরণে বুদ্বুদের মত শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে। সে বুঝিয়াছে ইহাই নারীর প্রকৃত ধর্ম। আর একটি ঘটনায়ও তাহার এই নবচেতনা সঞ্জীবিত হইল। চণ্ডীর মন্দিরে ছেলের মঙ্গলের জন্য পূজা দিতে আসিল গ্রামের ধনাঢ্য গৃহস্থ জনার্দন রায়ের কন্যা হৈমবতী ও তাহার স্বামী ব্যারিস্টার নির্মল। এত দিন দেবীর কাছে বহু সাংসারিক লোকের বহু প্রার্থনা সে শুনিয়াছে, বহু লোককে আশীর্বাদ করিয়াছে, কিন্তু এই সব সাংসারিক জীবনের কোন কামনা-প্রার্থনা তাহার মনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নাই; অর্থাৎ এই সব ব্যাপার

তাহাকে কখনও স্পর্শ করে নাই। কিন্তু জীবানন্দকে দেখিয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, শুশ্রূষা করিয়া সে বুঝিতে পারিল তাহার মধ্যে যে অলকা নিদ্রিত ছিল সে-ই তাহার বাস্তব, জীবন্ত সত্তা, ভৈরবী ষোড়শীর জীবন একটা মুখোশ মাত্র। এখানেও রাজলক্ষ্মীর কথা মনে হইবে। শ্রীকান্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর পিয়ারী বাইজী নিঃশেষে মরিতেছিল। এমন সময় প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকান্ত দরিদ্র বাঙালীর সন্তানপালনের বিড়ম্বনার উল্লেখ করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, বঙ্কুর বাবার সঙ্গে ঘরকন্না করিলে যদি রাজলক্ষ্মী দুই-একটি সন্তানের জননী হইত তাহা হইলে সেও এই বিড়ম্বনার মধ্যেই পড়িত। তখন রাজলক্ষ্মী তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে উত্তর দিয়াছিল, 'আমি দোর দোর ভিক্ষে করেও তাদের মানুষ করতুম। আর যাই হোক বাইউলী হওয়ার চেয়ে সে আমার ঢের ভাল হ'তো।'

ষোড়শীর জীবনে আনন্দ ও বেদনা, আকাঙ্ক্ষা ও নৈরাশ্যের যে সমন্বয় ও সংগ্রাম চলিতে লাগিল তাহা জীবানন্দের ব্যবহারে তীব্রতা লাভ করিল জীবানন্দ ছিল মদ্যপ, লম্পট, নির্মম পাষণ্ড; কোনরূপ নীতিবোধ বা সংকোচ তাহাকে নিরস্ত করে নাই। যেখানে পারিয়াছে আইনকে ফাঁকি দিয়াছে, আর যেখানে পারে নাই, জেলে গিয়াছে এবং মুক্তি পাইয়া আবার পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে। কিন্তু অলকার সংস্পর্শ ও সেবা এবং তাহার মত অকৃতজ্ঞ প্রতারক, অত্যাচারী পাষণ্ডকে রক্ষা করিতে ষোড়শীর সর্বব্যাপী তিতিক্ষা—ইহাতে জীবানন্দের জীবনের মোড় ফিরিয়া গেল। ষোড়শী যেমন জীবানন্দের সাহচর্যে ভৈরবী জীবনের অসারতা উপলব্ধি করিয়াছে, জীবানন্দও তেমনি অলকার ধীর স্থির অকুণ্ঠ নিঃস্বার্থ সেবার ও ষোড়শীর সর্বত্যাগী মহিমার প্রভাবে নূতন জগতে প্রবেশ করিল। এই দুই বিভিন্ন ধারা যেন বিপরীত দিক হইতে একই সঙ্গমে মিলিত হইতে চলিয়াছে। ইহা আকস্মিক অথচ অসম্ভাব্য নয়। এই কারণে এই কাহিনীতে একটা নিবিড়তা আছে যাহা বিস্তৃতির অভাব পূরণ করে।

কিন্তু এখানেও প্রেম নাহি পায় আপনার পথ। যে একবার ভৈরবীর জীবন ও ব্রত গ্রহণ করিয়াছে তাহার পক্ষে সাংসারিক জীবনে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব। একটি জীবন ত্যাগ করিলেই তো আর একটি জীবনে ফিরিয়া পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর শিক্ষা শ্রী রাজাকে অন্যতম রিপু বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, ইহার দ্বারা সে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অনপনেয় অনুরাগেরই উল্লেখ করিয়াছে। কিন্তু তবু সে স্বামি-সহবাস করিতে পারে নাই; জয়ন্তীর শিক্ষার

মধ্যে সীতারামের স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। ষোড়শীর সমস্যা আরও গুরুতর ; কারণ সে তো সন্ন্যাসিনীর শিষ্যামাত্র নহে, নিজেই সন্ন্যাসিনী ভৈরবী। সুতরাং ভৈরবীর জীবনে বাহিরের ঠাটপাটকে জীর্ণবস্ত্রের মত পরিত্যাগ করিলেও সন্ন্যাসিনীর ব্রহ্মচর্য তাহার অত্যাজ্য ধর্ম। তাহার নিজের হৃদয় বিমথিত হইয়াছে এবং জীবানন্দ আকুল কণ্ঠে বলিয়াছে, '·· আমি বাঁচতে চাই— · বাড়ি চাই, ঘর চাই, স্ত্রী চাই, ছেলে পুলে চাই—···আমার অনেক গেছে ···· কিন্তু আর আমি লোকসান করতে পারব না।' কিন্তু কোন আবেদনেই ভৈরবী ষোড়শী সাড়া দিতে পারে নাই। তাহাদের মধ্যকার ব্যবধান তেমনি অলঙ্ঘনীয় রহিয়া গিয়াছে।

ট্র্যাজেডি শব্দটি নাটক সম্পর্কে সমধিক প্রযোজ্য হইলেও নাটকেতর কথা-কাহিনীতেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। স্বয়ং অ্যারিস্টটল এই ব্যাপক অর্থে এই শব্দটি গ্রহণ করিয়াছেন। শরৎ-সাহিত্য ব্যবধানের ট্র্যাজেডি, কিন্তু আমাদের দেশের অলংকারশাস্ত্রের অলক্ষিত প্রভাবেই হউক আর জনপ্রিয়তার জন্যই হউক শরৎচন্দ্র মিলন ঘটাইয়া ব্যবধানের ট্র্যাজেডিকে লঘু করিয়া দিয়াছেন অথবা একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছেন। ইহার জন্যই 'কাশীনাথ' গল্পের মর্মান্তিক উপসংহার পরিবর্তিত হইয়াছে, শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর পক্ষপুটে ফিরিয়া আসিয়াছে আর এই উপন্যাসে ফকির সাহেব—এই চরিত্রে 'গোরা'র পরেশবাবুর প্রভাব থাকিতে পারে—মধ্যবর্তী হইয়া জীবানন্দ ও ষোড়শীকে আশ্রমের সেবার কাজে মিলিত করিয়াছেন। কিন্তু নটশ্রেষ্ঠ শিশিরকুমারের প্রভাবে 'দেনা-পাওনা'র নাট্যরূপ 'ষোড়শী'র উপসংহারকে বিয়োগান্ত করা হইয়াছে ; জীবনের মাঝখানে 'সূর্যাস্তের বরণ-চাতুরী' আবর্তিত হইয়াছে। দিনের দেবতাকে শেষ নমস্কার জানাইয়া জীবানন্দ মৃত্যু বরণ করিয়াছে আর মরণোন্মুখ জীবানন্দের কর্ণে অলকার শেষ আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছে—'স্বামী!'

৩

শরৎচন্দ্র দাবী করিয়াছিলেন যে, 'গৃহদাহ' উপন্যাসে কেহ খুঁত ধরিতে পারিবে না। তাঁহার এই দাবী যথার্থ, কারণ মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া এমন নিখুঁত, গঠনকৌশলে এমন নিটোল উপন্যাস যে কোন সাহিত্যে বিরল এবং ইহার ব্যঞ্জনার গভীরতা গ্রন্থকারের অভিপ্রায়কেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। কুলত্যাগিনীদের

ইতিহাস লিখিতে যাইয়া শরৎচন্দ্র দেখিয়াছিলেন যে ইহারা অনেকেই সধবা, অনেকেরই অবস্থা বিপর্যয়ে পা পিছলাইয়া গিয়াছে, কেহ বা অনেক সময় নিতান্ত তুচ্ছ কারণে ঘটনাচক্রে পরপুরুষের সঙ্গে যৌনমিলনে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে। এই রকম একটি ঘটনাকে ভিত্তি করিয়াই তিনি 'গৃহদাহ' রচনা করিয়াছিলেন, এই কথা তিনি আমাকেও বলিয়াছিলেন। আবার এই রকম একটি বিচ্ছিন্ন বাস্তব ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াই তিনি 'দেনা-পাওনা' লিখিয়াছিলেন।

হয়ত অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের ভিত্তিই এইরকম কোন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, কিন্তু বীজের আয়তন দিয়া তাহা হইতে উৎপন্ন মহীরুহের ব্যাপ্তি বা পত্রপুষ্প, শাখাপ্রশাখার ঐশ্বর্য ও জটিলতা পরিমাপ করা যায় না। মনুষ্য-জীবনের কাহিনী—তাহা বাস্তবেই হউক বা সাহিত্যেই হউক—বিচার করিতে গেলে একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। মানুষের প্রবৃত্তি বা বুদ্ধিই কি তাহার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের নিয়ামক, না, তাহার উপরে কোন দৈব বা নিয়তি আছে যাহা দুর্জ্ঞেয় কিন্তু তাহার নির্দেশনা অনস্বীকার্য? বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে [illegible]তিবিবি নিজের প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, 'আকাশে চন্দ্রসূর্য থাকিতে জল অধোগামী কেন? নিজেই উত্তরে বলিয়াছিল, 'ললাটলিখন।' পরবর্তী কালের উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সংযমের জয়গান করিয়াছেন এবং অনুশীলনতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। 'দেবী চৌধুরাণী'তে তিনি দেখাইয়াছেন যে, ঈশ্বরের অনুকম্পা বা দৈবানুগ্রহ তাহাদের উপরেই বর্ষিত হয় যাহারা সংযতচিত্ত, যাহারা সকল বৃত্তির যথাযথ অনুশীলন করিয়াছে। আমরা কিন্তু অত সহজে এই সমাধান গ্রহণ করিতে পারি না। 'সাহিত্য-কথা' প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ম্যাকবেথ ও গোবিন্দলালের চরিত্র ও পরিণতি বিশ্লেষণ করিয়া বলিতে চাহিয়াছেন ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় প্রভৃতি সহজ নীতিবাক্যের দ্বারা জীবনের পরিমাপ করা যায় না। 'শয়তানের অনুচরেরা মানুষকে সর্বদাই ঘিরিয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টায় আছে; কিন্তু হায় শয়তান যাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সেই ঠাকুরটি তখন নিজের অনুচর প্রেরণ করিয়া হতভাগ্যকে অধঃপতন হইতে রক্ষা কর্তব্য বোধ করেন না।' মানুষ নিজের অবনতির জন্য একেবারে দায়ী নহে এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু ইহাও মনে রাখা কর্তব্য যে ঘটনাপরম্পরায় বা পরিবেশের প্রভাবে সে যে দুর্বিপাকে পড়ে তাহা তাহার নিজের সৃষ্ট নহে। তাহার পরিবেষ্টনকারী সমস্ত জগৎ তাহার ভাগ্যকে গড়িয়া তুলিয়াছে ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। 'নীতিপ্রচারক ও শাস্ত্রকার ও সমাজ-

বিধাতার দল যে কথাটা গোপন করিয়া মনুষ্যসমাজের চোখে' ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিতে চাহেন মহাকবিগণ সেই কথাটাই খুলিয়া বলেন এবং সত্যবাদিতা যদি প্রশংসনীয় হয়, তবে সেই প্রশংসা এই শ্রেণীর মহাকবিগণের প্রাপ্য।'

সাহিত্য বিচারের উপরি-উদ্ধৃত মাপকাঠি সম্পর্কে আপত্তি উঠিবে বলিয়া মনে হয় না। এই মাপকাঠি দিয়া বিচার করিলে 'গৃহদাহ' মহাকবির রচনা বলিয়া স্বীকৃত হইবে। ইহা একটি বিবাহিত রমণীর পদস্খলনের কাহিনী। এই পদস্খলনে তাহার নিজের চরিত্র ও পরিবেষ্টনকারী জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিত্রিত হইয়াছে। সুরেশ ও মহিম খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কিন্তু এইরূপ দুইটি বিসদৃশ চরিত্রের এবং বিপরীত অবস্থার মানুষ কম দেখা যায়। মহিম স্থিতধী, স্বল্পভাষী, আত্মস্থ ও দরিদ্র; কলিকাতায় কলেজে পড়িলেও পল্লীগ্রামের লোক। সেখানেও সে অনেকটা একা; এই শ্রেণীর লোক সর্বত্রই নিঃসঙ্গ। অপরদিকে, সুরেশ কলিকাতাবাসী, ঐশ্বর্যশালী, উচ্ছ্বাসপ্রবণ, প্রগল্‌ভবাক্‌, চঞ্চলমতি। এইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের বন্ধুত্ব যে না হয় তাহা নহে, কিন্তু ইহার বিপদও আছে। যেমন আশা করা যাইতে পারে, এই ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের আতিশয্য আসিয়াছে সবই সুরেশের দিক হইতে আর এই নিবিড় বন্ধুত্বের মধ্যেও মহিম একাকী, প্রকাশকুণ্ঠ। কাহিনী যখন আরম্ভ হইয়াছে তখন দেখা গেল মহিম কেদার মুখোপাধ্যায় নামে জনৈক স্বল্পবিত্ত ব্রাহ্ম ভদ্রলোকের একমাত্র সন্তান অচলার সঙ্গে শুধু প্রেমে পড়ে নাই, তাহাকে বিবাহ করিবে বলিয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ। সুরেশ এই কথা জানিয়া খুব ক্ষিপ্ত হইল, কারণ সে ব্রাহ্মদিগকে ঘৃণা করিত। এই বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিবার উদ্দেশ্যে হঠাৎ গায়ে পড়িয়া সুরেশ কেদারবাবুর বাড়িতে আসিয়া অচলাকে দেখিয়া তাহার প্রতি নিজেই গভীরভাবে আকৃষ্ট হইল। কেদারবাবু যখন মহিমের আর্থিক অসচ্ছলতার কথা জানিলেন এবং কলিকাতাবাসী ঐশ্বর্যবান এক ধনী পাত্রকে হাতের কাছে পাইলেন তখন তিনি শুধু মনে মনে নয় প্রকাশ্যেই সুরেশকে ভাবী জামাতা বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইলেন এবং সুরেশও তাঁহার একটা মোটা ঋণ শোধ করিয়া দিল। কিন্তু তাহারা অচলার মন টলাইতে পারিল না। শেষ পর্যন্ত মহিম ও অচলার বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। এই টানাপোড়েনের মধ্যে অচলা সুরেশের মহানুভবতা ও নীচতা, স্বার্থপরতা এবং জীবন পণ করিয়া পরের সাহায্যে অগ্রসর হওয়ার পরিচয় পাইল। ঘটনাচক্রে এই বিবাহ ব্যাপারে অচলা এমন দুইজন পুরুষের সংস্পর্শে আসিল যাহাদের মধ্যে একজন সমুদ্রের

ঢেউয়ের মত অস্থির ও উদ্বেল আর একজন পাথরের মত শীতল ও স্থির। ইহারা বন্ধু আবার অচলার পাণিগ্রহণের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কথিত শয়তানের অনুচরদের অচলার জীবনে এই প্রথম পদক্ষেপ। অথচ ইহার জন্য তাহার না ছিল দায়িত্ব, না ছিল প্রস্তুতি।

বিবাহের পর মহিমের বাড়িতে আসিয়া সে অতিশয় প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িল। পল্লীগ্রামে বয়স্কা ব্রাহ্ম বধূ ম্লেচ্ছের সামিল এবং পল্লীসমাজের দিক দিয়া এই জাতীয় বিবাহ গর্হিত নৈতিক অপরাধ। আত্মস্থ, সহিষ্ণু, উদাসীন মহিম এই দিকটা ভাবিয়া দেখে নাই, ভাবিয়া দেখিলেও স্বল্পবাক্ স্বামী অচলাকে সব কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সে হয়ত মনে করিয়া থাকিবে সে নিজে যেমনভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাপন করিতে পারে অচলাও তাহা পারিবে। প্রতিবেশীরা যে দুই-চারিজন আসিল তাহারা মহিমের অনুপস্থিতিতে অল্পবিস্তর বিরূপ কটাক্ষ ও মন্তব্য করিয়া পল্লীগৃহের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে অচলাকে রাখিয়া চলিয়া গেল। নূতন বধূকে বরণ করিবার মত কোন বন্দোবস্ত মহিমের গৃহে ছিল না। বৌভাতে কেহ আসিল না, কারণ বৌভাত হয়ই নাই।

বাহির হইতে মহিমের সঙ্গে যে অচলাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতে আসিল সে মহিমের দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া এবং অন্তরঙ্গ বান্ধবী মৃণাল—কৌতুকময়ী, স্নেহশীলা, প্রগল্ভভাষিণী মৃণাল। এই মৃণালের সঙ্গে তাহার সেজদা মহিমের খুব সদ্ভাব ছিল এবং হয়ত তাহাদের বিবাহ হইতে পারিত, কিন্তু সামাজিক কারণে তাহা হয় নাই। মৃণাল এক প্রৌঢ়বয়স্ক গ্রাম্য ভদ্রলোকের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হইল আর মহিম বিবাহ করিয়া আনিল কলিকাতার শিক্ষিতা, পরিমার্জিতা ব্রাহ্ম যুবতী অচলাকে। মৃণালের গ্রাম্য হিন্দু সংস্কার ও অচলার শহুরে ব্রাহ্ম সংস্কৃতি—ইহাদের বৈপরীত্য এই উপন্যাসের সমস্যা ও ট্র্যাজেডির ইন্ধন যোগাইয়াছে। অনেকে মনে করেন অচলার মনোভাবের বিশ্লেষণে অচলার ধর্মমতের উপর জোর দিয়া শরৎচন্দ্র ব্রাহ্মবিদ্বেষের পরিচয় দিয়াছেন এবং ইহাতে শিল্পকলার হানি হইয়াছে। আমিও প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে লিখিয়াছিলাম অচলার চিত্তের 'যে কঠোর দ্বন্দ্ব, ইহাকে কোন একটি বিশেষ ধর্ম অথবা সামাজিক সংস্কারের দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়া দেখিলে ইহার প্রতি অবিচার করা হয়।' কিন্তু চিত্তের গভীরতম তলদেশে যে প্রবৃত্তি জন্ম নেয়, যত আদিমই হউক তাহাও তৎস্থানিক ও তৎকালিক পরিবেশের দ্বারা

নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই স্থানিক বা সাময়িক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতেই তাহার স্বরূপ ধরা পড়ে।

আজকাল হিন্দুসমাজে বিবাহবিচ্ছেদ আইন চালু হইয়াছে এবং বিবাহ অনেকটা কণ্ট্রাক্ট বা চুক্তির আকার ধারণ করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেই কিরণময়ী সতীত্ব লইয়া এক্সপেরিমেণ্ট করিয়াছে। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্মের সঙ্গে ইহার কোন সামঞ্জস্য নাই। হিন্দুসমাজে বিবাহ ধর্মীয় অনুষ্ঠান, স্বামীকে মৃণালের মত হিন্দু নারী গ্রহণ করে দেবতার দান বলিয়া। সে স্বামীকে গঞ্জনা করিতে পারে, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে একটা বিস্তৃত অংশে সুন্দরকে দেখিয়া সমবেত সীমন্তিনীরা পতিনিন্দা করিয়াছে। তাহা হইলেও সতীত্ব ইহাদের অত্যাজ্য ধর্ম, পতিনিন্দা কৌতুক মাত্র। কিন্তু অচলা মহিম এবং সুরেশের মধ্যে মহিমকে নিজে নির্বাচন করিয়াছে; তাহাদের বিবাহ হইয়াছে রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের মাধ্যমে। বিবাহের পর যখন মৃণাল সস্নেহ কৌতুকে সেজদার সঙ্গে তাঁহার নিজের বিবাহের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়া অচলার গুণগান করিল, তখন অচলা এই কৌতুক ও প্রশংসাকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না এবং মৃণালের সঙ্গে যে প্রীতির সম্পর্ক স্বামী ও স্ত্রীকে কাছে আনিতে পারিত তাহা ব্যবধানেরই সৃষ্টি করিল।

মহিমের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অপরিমেয়, তাহার যুক্তি স্বচ্ছ, স্পষ্ট; যে সিদ্ধান্তে সে পহুঁছায়, তাহা হইতে সে বিন্দুমাত্র দক্ষিণে বামে হেলে না। সর্বোপরি, সে আত্মনিষ্ঠ, অপরের বিরূপতা তাহাকে বিচলিত করে না। এই সকল কারণেই সে কলিকাতাবাসিনী ব্রাহ্মমহিলাকে লইয়া নিঃসঙ্কোচে, বিনা দ্বিধায় পল্লীগ্রামে বসবাস করিতে আসিয়াছিল। মনে করিয়াছিল তাহারা দুইজনেই তাহাদের সমাজ আর আছে মৃণাল যে তাহার একান্ত আপনার জন এবং সে অচলাকেও আপন করিয়া লইবে। এক দিকে তাহার চিন্তা ও সিদ্ধান্ত দিনের আলোর মত স্বচ্ছ, কিন্তু অপরদিকে অমাবস্যার অন্ধকার। তাহার যুক্তি যে এত স্বচ্ছ ও সিদ্ধান্ত যে এত ঋজু তাহার কারণ তাহার বুদ্ধি স্পষ্ট নির্ভুল পথে অগ্রসর হইতে পারে, কিন্তু অপরকে বুঝিতে পারে না; তাই সে সহ্য করিতে পারে কিন্তু সামঞ্জস্য করিতে পারে না। তাহার অবচেতন মনে কোন সংকোচ বা দ্বিধা হইয়াছিল কিনা বলা যায় না। তবু ইহা লক্ষ্য করিবার মত যে, বিবাহের পূর্বে অচলাকে সে পল্লীগ্রামের ও নিজের গৃহের অনেক কথাই বলিয়াছে, কিন্তু যে তাহার সবচেয়ে আপনার জন, যাহার সান্নিধ্য ও কল্যাণ

অচলার সাংসারিক জীবনে প্রধান সম্বল হইবে তাহার বিষয়ে একটি কথাও বলে নাই। জবাবদিহি করা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ; তবে প্রসঙ্গক্রমে সে অচলাকে জবাবদিহির স্বরেই বলিয়াছে, 'বুঝতে পারি, প্রথমটা তোমার নানাপ্রকার কষ্ট হবে; কিন্তু মৃণালের সঙ্গে তোমার বনিবনাও হবে না, এ আমি কিছুতেই ভাবিনি। কেন না তার সঙ্গে কোন দিন কারও ঝগড়া হয়নি।' আত্মনিবদ্ধ-দৃষ্টি এই লোকটি বুঝিতে পারে নাই যে, মৃণালই তাহাদের দাম্পত্য জীবনে কণ্টক হইতে পারে। মৃণাল সীতা-সাবিত্রীর ট্র্যাডিশানে মানুষ; সতীত্ব তাহার মজ্জাগত ধর্ম। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অচলা স্ত্রীর শ্যেনদৃষ্টি দিয়া মৃণালের হৃদয়ের গভীরতম তলদেশে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে এবং সেই দৃষ্টির দ্বারা সে দেখিতে পাইয়াছে যে, মহিমকে রাঁধিয়া খাওয়াইয়া মৃণাল অপরূপ তৃপ্তি পায়। সুতরাং তাহাকে সেই আসন হইতে সরাইয়া, সে স্ত্রীর প্রধান কর্তব্য, দায়িত্ব ও অধিকার গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইল। সে রান্নাঘরে ঢুকিতেই যে বিপর্যয় হইল তাহার জন্য অচলা প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু মহিমের কাছে ইহা অপ্রত্যাশিত নয়। মহিম অচলাকে ধীরে ধীরে বলিল, "মৃণাল যে ক'-দিন আছে ওই রাঁধুক না।" কেন যে সে (মৃণাল অচলার রান্নায়) আপত্তি করিতেছিল, মহিম তাহা জানিত। কিন্তু সে কথা ত খুলিয়া বলা চলে না।'

কিন্তু এই জাতীয় আপত্তির কথাই তো অচলাকে সর্বাগ্রে বলা উচিত ছিল; তাহা না হইলে নিজগৃহে অচলা নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করিবে কি করিয়া? মৃণালের ব্যবহার সেবাপরায়ণা পুত্রবধূর পক্ষে যোগ্য হইলেও অচলার পক্ষে যে পাড়াগাঁয়ের নিয়মানুসারেও তাহা অপমানকর ইহা মহিমও স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। আর ঠিক এই সময়ই সুরেশ আসিয়া উপস্থিত হইয়া আরও তালগোল পাকাইয়া দিল। তাহার পক্ষে কোন আজগুবি আচরণই বেমানান বা অসম্ভব নয়। সে মহিমের বিবাহ উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিল, কিন্তু বিবাহের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল না। আজ এই পরস্ত্রীলুব্ধ কামুকের আহ্বান ও আপ্যায়ন অচলার হৃদয়তন্ত্রীতে বেসুরো বাজিল না, কারণ সে পূর্বে যাহা করিয়াছে এবং এখনও যাহা করিতে লাগিল তাহা অচলার প্রতি গভীর টানের জন্যই করিয়াছে; তাহার নির্লজ্জ প্রতারণা, মহিমের সম্মুখেই অচলার সাহচর্যে মিথ্যা অভিনয়—ইহার মধ্যেও কোন ছলনা নাই। অচলাকে অপমান করিয়া মৃণাল যে ভাবে চলিয়া গেল, তাহাকে আপ্যায়ন করিতে সুরেশ যে ভাবে আসিয়া হাজির হইল আর মহিম যে ভাবে ধরা-ছোঁওয়া না দিয়া [illegible]-

টাকে এড়াইতে চেষ্টা করিল তাহা হইতে ইহাই বোঝা গেল ইহাঁদের দাম্পত্য জীবনের প্রথম সপ্তাহেই ফাটল ধরিয়াছে। এখানে কেহই ধীরোদাত্ত চরিত্রের নায়ক বা নায়িকা নাই, ইয়াগো বা গণেরিলের মত কোন মহাপাপিষ্ঠ বা পাতকিনী নাই, কিন্তু শয়তানের অনুচরেরা তাহাদের কলকাঠি নাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। সুরেশ একে কামোন্মত্ত, তাতে বেপরোয়া; তাই তাহার অনেক কাজে ও কথায় ছেলেমি থাকে যাহা কেহ বিশ্বাস করে না। কিন্তু এই উপন্যাসের প্রতি পদক্ষেপ এত সুনিয়ন্ত্রিত যে ছোটখাটো প্রত্যেক ব্যাপারের তাৎপর্যের প্রতি গ্রন্থকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অবহেলিত সুরেশ একদিন ঝোঁকের মাথায় কেদারবাবুর বাড়িতে ঘরে ঢুকিয়া অনুপস্থিত (অপরিজ্ঞাত ?) নিশীথের অসুস্থতার কথা বলিয়া ঝড় তুলিতে চেষ্টা করিলে অচলা তাচ্ছিল্যের সহিত সেই সংবাদকে উড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু মহিমের বাড়িতে সে যখন অমনি আকস্মিকভাবে কেদারবাবুর অসুস্থতার কথা ফাঁদিল তখন এই কাহিনীকে মহিম স্বভাবতঃই পাশ কাটাইয়া যাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ইহাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া অচলা মহিমের সঙ্গে অতি তিক্ত কলহে প্রবৃত্ত হইল এবং মহিম তাহার পিতাকে অবমাননা করিয়াছে এইরূপ অভিযোগ করিল। এই দুই ঘটনা পাশাপাশি রাখিলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের অধোগতি পরিমাপ করা যায়। কেদারবাবুর অসুস্থতার গল্প একেবারে মিথ্যা নয়, হয়ত সেই নিশীথও রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই জাতীয় ব্যাপার লইয়া স্বামীর সঙ্গে কলহ করিলে উপলক্ষ্য আসল বস্তুকে ছাড়াইয়া যায়।

মানুষ যখন একবার ভুল পথে অগ্রসর হইতে থাকে তখন প্রতি পদক্ষেপে সে সর্বনাশকে ডাকিয়া আনে। অচলা সুরেশকে চিনিত; সুরেশ হঠাৎ তাহার বাবার অসুখের যে কাহিনী বলিল শুধু তাহাকে ভিত্তি করিয়াই যে সে মহিমের সঙ্গে ঝগড়া করিল তাহাই নহে, সে সুরেশকে 'আপনি' ছাড়িয়া 'তুমি' সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিল, 'তোমার আমি কোন কাজেই লাগ্‌লুম না, সুরেশবাবু; কিন্তু তুমি ছাড়া আর আমাদের অসময়ের বন্ধু কেউ নেই। সুরেশবাবু, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও—যাকে ভালবাসিনে, তার ঘর করার জন্যে আমাকে তোমরা ফেলে রেখে যেও না।' ইহাদের ভাষা উদ্ধৃত করিয়াই বলা যায়, এই কথাগুলি নিতান্ত 'ঝোঁকের মাথায়' বলা, কিন্তু সুরেশকে সে খুব ভাল করিয়াই চিনিত; সুরেশের মত কামার্ত, 'প্রকৃতিকৃপণ', অগ্রপশ্চাৎবিবেচনাহীন লোকের কাছে এই প্রকাশ্য অনুরোধ বা আহ্বান নিজেরই অধঃপাতের পথ

প্রস্তুত করা। মহিমের অটল সহিষ্ণুতা এবং স্বল্পভাষিতাও এই ভাবী বিপর্যয়ের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। মৃণালের সম্পর্কে সে পূর্বে অচলাকে কিছু বলে নাই; অথচ মৃণালকে লইয়াই তাহার সমাজ। আর অচলা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে বাহিরের পরিহাস-চটুলতার অন্তরালে মৃণাল মহিমের প্রতি কত গভীরভাবে অনুরক্ত। অবশ্য ইহা হয়ত তাহার দাম্পত্য জীবনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করিত না। কিন্তু মহিমের নীরবতা, মৃণালের পল্লীগ্রামসুলভ সস্নেহ অভিযোগ— 'সেজদামশাই গো, করছ কি? পরশু থেকে তোমার পথ চেয়ে চেয়ে তোমার মৃণালের চোখদুটি ক্ষয়ে গেল যে!'—অচলার মনে এই সংশয়ই জাগ্রত করিয়া দিল, তাহার স্বামী কি অন্য নারীতে আসক্ত? মহিম যেরূপ স্থিতধী, সকল বিষয়ে সংযত প্রকৃতির লোক তাহাতে তাহার সম্পর্কে এই জাতীয় সন্দেহ যে খুব দীর্ঘস্থায়ী হইত তাহা নহে। কিন্তু আর একটি ঘটনা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান বাড়াইয়া দিল। বাড়ির মধ্যে সুরেশের অভ্যাগমের পর হইতে যে টানাপোড়েন চলিতেছিল, সেই সময় মহিম অনেক বার কোন কারণ না দেখাইয়া বাহির হইয়া যাইত এবং কথামত ফিরিয়া আসিত। সুরেশের সঙ্গে কলিকাতা যাওয়ার উদ্দেশ্যে অচলা যখন ট্রেনে উঠিয়াছে, তখন অচলা যদু চাকরের নিকট হইতে সংবাদ পাইল যে, মৃণালের স্বামী সেই দিনই মারা গিয়াছে। ট্রেন ছাড়ার পূর্বে অচলা জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রায় দশ-বারোদিন ধরে নিউমোনিয়ায় ভুগছিলেন। এ খবরটাও আমাকে দেওয়া কোন দিন তুমি আবশ্যক বোধ করোনি?' এই তাহার স্বামী!

কলিকাতা-যাত্রার পূর্ব রাত্রিতেই আগুন লাগিয়া মহিমের বাড়ি পুড়িয়া যায়। এই গৃহদাহের সাংকেতিক ব্যঞ্জনা ছাড়া আর কোন তাৎপর্য নাই; যদি থাকিত তাহা হইলে এইরূপ নিখুঁত, নিটোল উপন্যাসে গ্রন্থকার নিজেই তাহার আভাস দিতেন। অবিবেকী পরস্ত্রীলুব্ধ সুরেশের পক্ষে এইরূপ কাজ অসম্ভব নয়। কিন্তু তাহার কোন লক্ষণ বা ইঙ্গিত কোথাও নাই। বরং আগুন লাগার ঠিক আগে ও পরে অচলার দুই-একটা সাধারণ উক্তি তাহার নিজের হৃদয়-রহস্যের সংকেত দেয়। সুরেশ মহিমের বাড়ি আসিয়াও মহিমের অনুপস্থিতিতে তাহার পূর্বরাগের পুনরাবৃত্তি করিয়াছে। অচলা সেই সকল কথা শুনিতে চায় নাই, কারণ পরপুরুষের নিকট হইতে এই জাতীয় নিবেদন শোনাও পাপ। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে আবার বলিয়াছে যে সে সুরেশের আশাহত, নিঃসঙ্গ জীবনের কথা শুনিয়া দুঃখ পায়, কারণ সে তো পাষাণ নয়। এই জাতীয় স্বীকৃতি যে

সুরেশকে আরও বেশি বিচারমূঢ় করিবে ইহা কি সে বুঝিতে পারে নাই? সুরেশ তাহার দাম্পত্য জীবনকে খানিকটা উপক্রুত করিয়া চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, সে নিজেই সুরেশের জিনিসপত্র গুছাইয়া দিয়া অতিথি সৎকার সমাপ্ত করিয়াছে। এই পর্যন্ত মানিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহার পরই সে সুরেশকে বলিল, '·বাড়ি আপনার বন্ধুর একার নয়, এর ওপর আমারও কিছু অধিকার আছে। সেই জোরে আজ আমি নিমন্ত্রণ করচি, আমার অতিথি হয়ে অন্ততঃ আর কিছু দিন থাকুন।' এরকম অদ্ভুত যুক্তি অচলার দ্বিধাবিভক্ত মনেরই পরিচায়ক। সে যে অতিথিকে নিমন্ত্রণ করিল সেই অতিথি তাহার স্বামী হইতে চাহিয়াছিল এবং এখনও তাহার হৃদয়ে স্বামীর পাশে একটু জায়গা করিয়া লইতে চায়। এই জন্যই তো স্বামীর কাছ হইতে ইহাদের লজ্জা ঢাকিবার প্রয়োজন হইয়াছে এবং এই জাতীয় উক্তি হইতে মনে হইতে পারে অচলাও কেদারবাবুর অসুস্থতাকে লজ্জা ঢাকিবার আবরণ হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছে। অথচ এই বাড়ির ওপর তাহার নিজের যে কিছু স্বতন্ত্র অধিকার সে দাবী করিতেছে তাহা তো সেই স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক হইতেই পাওয়া!

যাহা হউক তাহারই অনুরোধের সুযোগ লইয়া সুরেশ কিছু দিন থাকিতে রাজি হইল। কিন্তু সুরেশকে অচলা আপনার করিয়া লইতেও পারে না। সুরেশের অবস্থান কালের মধ্যেই মহিমের বাড়িতে রাত্রিতে আগুন লাগিলে চলার বাধা অগ্রাহ্য করিয়া সেই জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া মহিম অচলার গহনার বাক্স আর অন্য কিছু মূল্যবান বস্তু রক্ষা করিতে পারিল। সেই সময় সুরেশও মহিমের সঙ্গে অগ্নিদাহের মধ্যে যাইতে চাহিলে, 'অচলা তাহার কোঁচার খুঁট ধরিয়া ফেলিয়া কঠোর কণ্ঠে কহিল, আপনি যান কোথায়? ...তিনি গেলেন তাঁর জিনিস বাঁচাতে। আপনি কে? আপনাকে যেতে আমি কোনমতেই দিব না। তাহার কণ্ঠস্বরে স্নেহের লেশমাত্র সম্পর্ক ছিল না—এ যেন সে অনধিকারীর উৎপাতকে তিরস্কার করিল।' কিন্তু মহিম যখন অগ্নিকুণ্ড হইতে বাহির হইল তখন পলকের দৃষ্টিতে দেখিল অচলার হাত সুরেশের কোঁচার খুঁট ধরিয়া আছে। অচলার তিক্ত স্বর ও কঠোর মন্তব্য কিন্তু মহিমের কানে যায় নাই। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-কথিত 'শয়তানের অনুচরেরা' প্রত্যেকটি অলিগলি দিয়া এই দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করিয়াছে।

প্রাজ্ঞ গ্রামবৃদ্ধ বাঁড়ুজ্যে মশায়ের ঘৃণ্য প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া স্ত্রীর প্রতি

তাহার অবিচলিত অনুরাগ প্রকাশ করিলেও মহিম কিন্তু বিপদের দিনেও অচলার গহনা বা টাকা গ্রহণ করিতে পারে নাই যেমন সে পূর্বে আর একজনের অযাচিত দান গ্রহণ করে নাই। সেই আর একজন সুরেশ যে তাহাকে নিজ বাড়িতে ঐশ্বর্যের মধ্যে রাখিতে চাহিয়াছিল। মহিম ধীরভাবে চিন্তা করিয়া বলিল, ঝোঁকের মাথায় দান করা যায় বা আত্মোৎসর্গ করা যায়। কিন্তু পরে সেই জন্য অনুতাপ আসিবে। সে ইঙ্গিত করিতেছে যে, অচলা ঝোঁকের মাথায় তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল এবং তাহার সম্মুখেই সুরেশকে বলিয়াছে যে, যাহাকে ভালবাসে না তাহারই ঘর করিতে সে পল্লীর কারাবাসে জীবন কাটাইতে বাধ্য হইতেছে। মহিমের চরিত্রে অনেক শ্লাঘনীয় গুণ আছে, কিন্তু পরকে বুঝিবার, উপলব্ধি করিবার শক্তি নাই। তাই সে অচলার মুখের কথা শুনিয়া তাহাকেই মানিয়া লইল কিন্তু তাহার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিল না। সুরেশের লুব্ধতা ও প্রতারণা তাহার অপরিজ্ঞাত নয় এবং পল্লীগ্রামেও সুরেশের অস্বাভাবিক ব্যবহার তাহার চক্ষু এড়ায় নাই। সে ভিখু বাঁড়ুজ্যের বর্বর প্রস্তাব রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার স্ত্রীর পাশে দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু যাহা তদধিক বিপজ্জনক, সেই সুরেশের সাহচর্য হইতে অচলাকে আত্মরক্ষা করিতে সাহায্য করে নাই এবং অচলার বিক্ষিপ্ত মনকে শান্ত করিতে বিন্দুমাত্র অগ্রসর হয় নাই।

কলিকাতায় আসিয়া অচলা তাহার পিতার আচরণে প্রথমে চকিত হইয়াছে, পরে পিতার প্রতি তাহার তথাকথিত শিক্ষিত মন বিতৃষ্ণা ও ঘৃণায় ভরিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পিতার যে অসুস্থতার জন্য সে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছিল সেই বিষয়ে একটি প্রশ্নও তাহার মনে জাগে নাই। সে ইহাও ভাবিয়া দেখে নাই যে পিতার জিজ্ঞাসার পদ্ধতি অসঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার সন্দেহ অমূলক নয়। মহিম যেমন তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারে নাই, সেও তো নিজেকে জেরা করে নাই। সুরেশ যাহাকে 'অভিনয়' বলিয়াছে তাহা যে গর্হিত পাপ এবং সে যাহাকে আতিথেয়তা মনে করিয়াছে তাহার যে অনেকখানিই আত্মপ্রবঞ্চনা ইহা সে বুঝিতে পারে নাই। এই অজ্ঞতার অন্তরালে রহিয়াছে মনুষ্যহৃদয়ের মৌলিক অসঙ্গতি, নানা প্রেরণার গোলকধাঁধা। মানুষের বুদ্ধি নানা ভাবে বিধিনিষেধের দ্বারা সরল করিয়া সহজ করিয়া প্রবৃত্তিকে আয়ত্তে আনিতে চেষ্টা করে, কিন্তু যাহা অংশত বুদ্ধির অগম্য তাহাকে বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করিবে কি করিয়া? অনাতোল ফ্রাঁসে 'তৃষ্ণার্ত দেবতা' নাম দিয়া ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে যে উপন্যাস লিখিয়াছেন তাহার অন্যতম প্রধান চরিত্র Gamelin

পেশায় চিত্রবিদ্যার ছাত্র। সেই বিপর্যয়ের দিনে সে হঠাৎ ম্যাজিস্ট্রেট বা ন্যায়াধীশ নিযুক্ত হইল, যদিও আইন সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বহুদর্শী বুড়ো Brotteaux বলিলেন যে, সে-ই এই কাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। প্রাজ্ঞ মানুষেরা বুদ্ধি দিয়া বিশ্লেষণ করিয়া নিক্তির ওজনে ন্যায়বিচার করিতে চেষ্টা করিয়া পদে পদে ভুল করে। কিন্তু যে মানুষ মূর্খ ও অজ্ঞ বলিয়া শুধু প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হইবে, সে তো কোন ভুল করিতে পারে না! প্রবৃত্তি অবিচলিতভাবে সোজা আপন পথে ধাবিত হয়। এখানে বিভ্রান্তির অবকাশ নাই। ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যার বিচার মানুষের সীমিত শক্তির অতীত।

কিন্তু বুদ্ধি যতই মোহগ্রস্ত হউক, সে একেবারে আচ্ছন্ন হয় না। মহিম অসুস্থ হইয়া সুরেশের বাড়ি আশ্রয় লওয়ায় অচলা আবার সুরেশের কবলে পড়িল। বাহির হইতে মনে হইবে, ইহা একটি আকস্মিক বিপর্যয়। কিন্তু সেই ধারণা অর্ধসত্য। সেবার মধ্য দিয়া অচলা প্রায়-হারানো স্বামীকে ফিরিয়া পাইল কিন্তু সে নূতন করিয়া সুরেশের লুব্ধতার, কামার্ততার পরিচয়ও পাইল। এই জাতীয় রক্ষক যে সুযোগ পাইলেই ভক্ষক হইয়া উঠিবে ইহা আর কেহ না হউক অচলার বুঝিতে বিলম্ব হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এই উপলব্ধির সঙ্গে তাহার নিজের অবচেতন অনুরাগও সচেতন ভূমিতে স্পষ্ট রূপ পাইয়াছে। মৃণালের সঙ্গে সে সুরেশের বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে এবং সেই অবসরে মৃণালের অত্যাজ্য সতীত্ব ধর্মের সঙ্গে নিজের অচলা পতিভক্তির কথাও জোর করিয়া প্রচার করিয়াছে। কিন্তু সুরেশের রাত্রিতে চুরি করিয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিবার পরিচয় পাইয়া এই কুৎসিত আচরণকে সে যতই নিন্দনীয় বলিয়া মনে করুক, 'তাহার সমস্ত মনটা যে এই অভিযোগে সায় দিতেছে না ইহাও তাহার অগোচর রহিল না।' ইহার পরে যে সব নাটকীয় ঘটনা ঘটিল তাহার মধ্যে সুরেশের লজ্জাহীন উন্মত্ত কামনা, রাক্ষুসী ও রামবাবুর আন্তরিক স্নেহের চোরাবালি, পিতৃগৃহে, স্বামিগৃহে, সমাজে সর্বত্র তাহার ফিরিয়া যাওয়ার অসম্ভাব্যতা, এমন কি বহিঃপ্রকৃতির ঝড়-ঝঞ্ঝা সবই ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু ইহাও মানিতে হইবে সুরেশকে সে সমস্ত মন দিয়া ঘৃণা করিতেও পারে নাই এবং বোধ হয় সেই ঘোর বিপর্যয়ের মধ্যে সুরেশের উদ্বেল প্রণয়ই ছিল তাহার একমাত্র সম্বল ও সম্পদ, যদিও সমস্ত শক্তি দিয়া এই প্রণয়কে সে প্রতিহত করিয়াছে।

কিরণময়ীর মত প্রখর বুদ্ধি বা প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অথবা রাজলক্ষ্মীর মত প্রবল ইচ্ছাশক্তি অচলার ছিল না। কিন্তু সেও শিক্ষিতা এবং সে শুধু পরকে বিচার

করে নাই, নিজেকেও বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। তবু প্রতিপদে ভুল করিয়াছে, কারণ এই স্ববিরোধিতা মানবচরিত্রের অলঙ্ঘনীয় অভিশাপ। তাহাদের জব্বলপুর যাত্রার প্রাক্কালে সুরেশ তাহার প্রতি উদাসীন হইয়াছে এই কথা মনে করিয়া সে শূন্যতা অনুভব করিয়াছে ; এমন কি এই শূন্যতাবোধের অন্তরালে তাহার হৃদয়ে গোপনে সুরেশের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছে এই 'সংশয়' তাহার মনে উঁকিঝুঁকি দিয়াছে। বোধ হয় এই সংশয়কে চাপা দেওয়ার জন্যই অন্ধ অবচেতন কামনা তাহাকে সুরেশকে তাহাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে প্রণোদিত করিল। কিন্তু এই নিগূঢ় এষণা যে প্রলয় ডাকিয়া আনিল সেখানেও সমস্ত প্রতিকূলতা ও সম্পূর্ণ নৈরাশ্যের মধ্যে মহিমের প্রতি অনুরাগই তাহাকে আত্মরক্ষা করিতে সাহায্য করিয়াছে। ইহা বুঝিতে তাহার অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, স্বামীর গৃহে, এমন কি পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাওয়ার দরজা তাহার কাছে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত সে যে নিজেকে চরম অধঃপাত হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছে, মহিমের প্রতি অনুরক্তিই তাহার প্রধান কারণ। অভয়া বলিয়াছিল যে, রোহিণীবাবুর প্রেমকে ব্যর্থ করিয়া সে সতী নাম কিনিতে চায় না। অচলার অবস্থা আর অভয়ার অবস্থা এক নহে; তবু সে যে বিপর্যয় ডাকিয়া আনিয়াছে, যেখানে সতী নাম সে কখনও রক্ষা করিতে পারিবে না, সেখানেও মহিমের সঙ্গে ভগ্ন কিন্তু অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের জন্যই সে সুরেশের প্রেমকে ব্যর্থ করিয়াছে। সুরেশের মৃত্যুর পর অচলা যখন বলিয়াছিল,—'মুখাগ্নির আবশ্যক হয়ত আমি করতে পারি। হিন্দুধর্মে এর যদি কোন সত্যকার ফল থাকে, তা আমি ব্যর্থ করতে চাই নে। আমি তাঁর স্ত্রী নই।'—তখন এই কঠোর স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়াও সে আপন সত্তাকে ঠিক চিনিতে পারে নাই। সুরেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইহা সে কখনও ভুলিতে পারে না যে মহিম তাহার স্বামী এবং সেই স্বামীকে সে যে শুধু ভালবাসিয়া নির্বাচন করিয়াছিল তাহাই নহে, সেই স্বামীর প্রতি তাহার অনুরাগ শেষ পর্যন্ত অটুট রহিয়াছে।

অচলার চরিত্রের বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, সত্য যেমন চিরচলমান এবং সেইজন্য তাহাকে কোথাও ধরিয়া রাখা যায় না, আমাদের অন্তরাত্মাও তেমনি একটা ঘূর্ণ্যমান আবর্ত যাহার মধ্যে কোন স্থির বিন্দু খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। মানুষের হৃদয়ের রহস্য শুধু যে বাহিরে প্রকাশ করা যায় না, তাহা নহে, নিজেও তাহা উপলব্ধি করা যায় না। বিজ্ঞান জড়জগতের বহির্দেশের ক্রিয়া-

প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে আয়ত্তের মধ্যে আনিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহার স্বরূপ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। আজ যাহা নিশ্চিত জ্ঞান মনে হইতেছে, কালই তাহা পল্লবগ্রাহিতা বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। অণুর মধ্যে পরমাণুর সমবায় দেখিতে পাইয়া তাহাকেই মৌল পদার্থ বলিয়া মনে করিয়া সে কিছু দিন নিশ্চিন্ত ছিল, কিন্তু তাহার পরেই বিস্ময়ের সহিত আবিষ্কার করিল যে পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন প্রভৃতি সূক্ষ্মতর বস্তু চলাফেরা করিতেছে এবং ইহাদের মধ্যেও আরও কত কি আছে কে বলিবে? এমনও হইতে পারে যে, সৃষ্টির আদিম উৎস শুধু চলমান শক্তি, কোন বস্তু বা পদার্থ নয়। যদি জড়-জগতের রহস্যই বিশ্লেষণাতীত হয়, তাহা হইলে মানুষের মন, যাহা নানা চিন্তা, অনুভূতি ও প্রেরণার লীলাভূমি, যেখানে সচেতন বুদ্ধির ব্যবস্থাপনা মগ্নচৈতন্যের স্পন্দনে আন্দোলিত, বিপর্যস্ত হইতেছে তাহা আরও কত গভীর, সূক্ষ্ম ও জটিল! শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের কৃতিত্ব এই যে তাহা এই রহস্যকে সরল করিতে চেষ্টা করে না, দর্শন ও বিজ্ঞানের মত ইহার সূত্র বাহির করিতে অগ্রসর হয় না, কিন্তু যতদূর সম্ভব ইহার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি আঁকিতে পারে। 'গৃহদাহ' এই শ্রেণীর সাহিত্য।

তৃতীয় পর্ব—৩

বিবিধ

১

শরৎচন্দ্র বাঙালীর সমাজের ও পরিবারের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যকে কেন্দ্র করিয়া অনেকগুলি ছোট-বড় সার্থক গল্প লিখিয়াছেন। এই সকল রচনা বিশ্লেষণ করিলে সংক্ষিপ্ত, সংহত, ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ সৃষ্টির রস উপলব্ধি করা যায়। জনৈক প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়াছেন, ক্লাসিক আর্টের ধর্মই হইল অল্প কথার মধ্য দিয়া বিস্তৃতি ও গভীরতার আভাস দেওয়া। প্রথমে যৌথ পরিবারের কাহিনীর কথাই ধরা যাইতে পারে। 'বিন্দুর ছেলে' প্রথম দিকের রচনা; ইহার কাহিনী ও চরিত্র উভয়ই উল্লেখযোগ্য এবং ইহার সংঘাত ও মিলনের মধ্য দিয়া যৌথ পরিবারের ধারণাও স্পষ্ট হইয়া উঠে। আয়তনে 'নিষ্কৃতি' 'বিন্দুর ছেলে'র সমান। কিন্তু ইহার মধ্যে যৌথ পরিবারের বিস্তৃতি ও জটিলতার যে চিত্র পাই তাহার তুলনায় 'বিন্দুর ছেলে'র বর্ণনা নিতান্তই আটপৌরে।

নানা কারণে যৌথ পরিবার এখন ভাঙিয়া গিয়াছে। তবে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ইহার অবিনশ্বর রূপ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। যৌথ একান্নবর্তী পরিবারে নানা লোকে—সহোদর ভাই, জাঠতুত খুড়তুত ভাই, সময় সময় ভাগ্নে ভাগ্নী কি আর একটু দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়—একত্র হইয়া এক সংসারের অঙ্গ হিসাবে বসবাস করিত। কেহ বেশি কেহ কম উপার্জন করিত, আবার কেহ বা কিছুই উপার্জন করিত না। কিন্তু অশনবসনে মোটামুটি সাম্য রক্ষা করিবার চেষ্টা হইত, বাড়ির যিনি কর্ত্রী তিনি সকলকে সমানভাবে দেখিবেন, বিমাতা নিজের পুত্র ও মাতৃহীন সপত্নী-পুত্রের মধ্যে পার্থক্য করিবেন না ইহাই প্রত্যাশা করা হইত। খানিকটা স্বার্থত্যাগ বা উদারতা ও সহিষ্ণুতা না থাকিলে এই জাতীয় ব্যবস্থা চলিতেই পারিত না। তবু ইহাও মানিতে হইবে যে ইহার মধ্যে স্বার্থবুদ্ধিও ক্রিয়াশীল ছিল। সহিষ্ণুতার সঙ্গে ক্রোধ ও দ্বেষ, উদারতার সঙ্গে নীচতা, শান্তিপ্রিয়তার সঙ্গে কলহপরায়ণতা পাশাপাশি থাকিত এবং একই চরিত্রে বিরোধী প্রবৃত্তির সন্নিবেশ ঝলমল করিত। এই সকল কারণে যৌথ পরিবারে কেহ বেশি জায়গা জুড়িয়া বসিত না আবার ক্ষণেকের বিদ্যুদ্দীপ্তির মত বিচিত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হঠাৎ ফুটিয়া উঠিত।

'নিষ্কৃতি'তে তিনটি পরিবারের একান্নবর্তিতার চিত্র আছে—গিরিশ ও হরিশ দুই সহোদর এবং খুড়তুত ভাই রমেশ। গিরিশ প্রচুর অর্থোপার্জন করেন; হরিশ মোটামুটি উপার্জনশীল এবং রমেশ বেকার। ইহাদের সকলের সন্তান-সন্ততি এই গল্পে ভিড় করিয়াছে। রমেশের আবার দুই সংসার; প্রথম পক্ষের ছেলে মাতৃহীন কানাই এবং দ্বিতীয় পক্ষের পটল। তিন গিন্নী—সিদ্ধেশ্বরী, নয়নতারা ও শৈল। প্রত্যেকটি চরিত্র জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং সবচেয়ে জীবন্ত হইয়াছে অধুনা বিলীয়মান বাঙালী হিন্দুর যৌথ পরিবার। কোথাও কোথাও একটু আতিশয্য আছে, কিন্তু তাহা আর্টের সীমা লঙ্ঘন করে নাই। এই সীমা অ্যারিস্টটল অতি সরলভাবে নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। অতিরঞ্জন মানুষের মজ্জাগত ধর্ম; আমরা সবাই কোন কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া যখন অপরের কাছে তাহার বিবরণ দিই তখন চমৎকার উৎপাদনের জন্য একটু বাড়াইয়া বলি। কিন্তু সেই বিবরণের মধ্যে বস্তুর স্বরূপ ঢাকা পড়িলে চলিবে না।

'নিষ্কৃতি'তে কর্তা গিরিশ হইতে কনিষ্ঠ শ্রীমান ক্ষুদে, রাত্রিবেলায় অপকর্ম করিয়া ফেলার জন্য যাহাকে অয়েলক্লথে শুইতে হয়, সবাই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, বড়দের স্বার্থের সংঘাত আর ছেলেদের মারামারি, প্রাজ্ঞ হরিশের ষড়যন্ত্র আর কিশোর হরির পাঠ্যপুস্তকের আড়ালে লুকাইয়া 'আনন্দমঠ' পড়া—সবই সমানভাবে, অনেক সময় তুচ্ছ দুই-একটি রেখার টানে, আপন স্বাতন্ত্র্যে চিত্রিত হইয়াছে আর ইহাদের মধ্য দিয়া সবচেয়ে বেশি ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া বা অমূর্ত ভাব যাহা যৌথ পরিবারের প্রাণকেন্দ্র। তাহা হইল অবিনাভাব বা অভিন্নতাবোধ। সমস্ত সংঘাত ও ষড়যন্ত্র এবং উদারতা ও সহিষ্ণুতার মধ্যে এই বোধ ক্রিয়াশীল ছিল যে, যাহারা এক পংক্তিতে আহার করিতেছে তাহারা একই দেহের অঙ্গ এবং এই সামগ্রিকতা অলঙ্ঘনীয়। এই ছোট উপন্যাসে এই ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে অতি বিস্ময়কর-ভাবে অথচ সেই বিস্ময়কর পরিণতিতে বিন্দুমাত্র অসঙ্গতি নাই। গিরিশ বড় উকিল, কিন্তু অন্যমনস্ক আত্মভোলা লোক; সংসারের কোন ব্যাপারেই তিনি থাকেন না। অংশত তাঁহার স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরীকে হাত করিয়া মেজ ভাই হরিশ খুড়তুত ভাই নিষ্কর্মা রমেশ, তাহার স্ত্রী শৈলজা ও দুই পুত্রকে পৃথক করিয়া দিল এবং তাহাদিগকে পারিবারিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য মামলা রুজু করিয়া দিল। সিদ্ধেশ্বরী হরিশের কথায় কান দিলেও কখনও রমেশের পুত্র

কানাই পটলের মায়া কাটাইতে পারেন না। তিনি ধনী লোকের গৃহিণী কিন্তু পঞ্চাশ গুণিতে পারেন না এবং রমেশকে পৃথক করিয়া দেওয়া এবং রমেশের ছেলেদের জন্য মমত্ববোধ যে পরস্পরবিরোধী ইহাও বুঝিতে পারেন না। আর তাঁহার স্বামী শুনিয়াছেন ও দেখিয়াছেন যে, খুড়তুত ভাই কিছু না করিয়া সপরিবারে অন্নধ্বংস করিতেছে এবং সেই কারণেই তাহার অপচয় হইতে চাটুয্যেবাড়ির সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইবে। তাই চাটুয্যেবাড়ির অভিন্নতা-বোধের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া দেশের সমস্ত সম্পত্তি তিনি ছোট বৌ অর্থাৎ রমেশের স্ত্রী শৈলর নামে লিখিয়া দিয়া তাঁহার বিষয়বুদ্ধি ও ব্যবহারজীবী কৌশল দেখাইয়া দিলেন।

যৌথ পরিবারের এই অভিন্নতাবোধই বিস্ময়কর কিন্তু সম্পূর্ণ সম্ভাব্য অভিব্যক্তি পাইয়াছে ভিন্ন পরিবেশে 'মামলার ফল' গল্পে। ইহার পরিসর ছোট, 'নিষ্কৃতি'র এক-চতুর্থাংশ। চরিত্রের সংখ্যাও কম। শিবু সামন্ত ও শম্ভু সামন্ত এবং বড় বৌ ও ছোট বৌ। শিবুব কোন সন্তানের উল্লেখ নাই। শম্ভুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর এক ছেলের উল্লেখ আছে কিন্তু সে কখনও কাহিনীতে উপস্থিত হয় নাই। ইহারা খুব সাধারণ চাষী। পিতার মৃত্যুর পর জমিদারকে সালিশ মানিয়া দুই ভাই পৃথক হইল। ঘর বাড়ি জমি জিনিসপত্র সবই ভাগ হইল কেবল একটি বস্তু যৌথ রহিয়া গেল—একটি বাঁশঝাড় কারণ দুই ভাই-ই সমস্বরে বলিল বাঁশঝাড় না হইলে তাহার চলিবে না।

এই বাঁশঝাড়ের মালিকানা ও ব্যবহার লইয়া দুই ভাই ও দুই জায়ে নিত্য কলহ হইত এবং সেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কোন পক্ষই পশ্চাৎপদ ছিল না। অবিভক্ত আর একটি বস্তুও রহিয়া গেল ; সে বস্তু—ছোট ভাই শম্ভুর মাতৃহীন ছেলে গয়ারাম। তাহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই গল্প জমিয়া উঠিয়াছে এবং এই অবাধ্য ছেলেই গল্পটিকে দৃঢ় সংসক্তি দান করিয়াছে। এই মাতৃহীন কিশোর জ্যাঠাইমার কাছেই মানুষ হইয়াছে, বিমাতা তাহার প্রতি বিরূপ আর সেও; বিমাতাকে গ্রাহ্য করে না। জ্যাঠাইমার কাছে সে মানুষ হইয়াছে, দৌরাত্ম্য করিয়াছে ; কাজেই আইনত সে পিতার ভাগে পড়িলেও প্রকৃতপক্ষে সে জ্যাঠাইমার অংশেই রহিল। একদিন শিবুর অংশে ঢুকিয়া জিনিসপত্র ভাংচুর করিয়া জ্যাঠাইমাকে এক ঘা দিয়া সে তুলকালাম কাণ্ড বাধাইল। এবার জ্যাঠার সঙ্গে জ্যাঠাইমাও রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। শিবুর শ্যালক

পাঁচু কিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানিত। সুতরাং সে বুঝাইয়া দিল উপযুক্ত তদ্বিরাদি করিলে শম্ভু ও গয়ারাম উভয়কেই এই সুযোগে জেলে দেওয়া যাইবে। পাঁচুর চেষ্টায় দারোগাবাবু হাজির হইলেন, তিনি শম্ভুর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাইলেন না, তবে গয়ারামকে চালান দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিলেন। কিন্তু গয়ারাম ফেরার! তাহার পরেই দেখা গেল শিবুর স্ত্রীও বাড়ি নাই এবং বহু চেষ্টা করিয়াও শিবু তাহার সন্ধান পাইল না। ইহাতে তাহার যুদ্ধোদ্যম স্তিমিত হইয়া আসিল। কিন্তু পাঁচু বহু অনুসন্ধান করিয়া সংবাদ পাইল যে, নিকটবর্তী পাঁচলা গ্রামে যে পুল নির্মিত হইতেছে সেইখানে গয়ারাম নাম ভাঁড়াইয়া কাজে লাগিয়া গিয়াছে। সরকারি পেয়াদা সমভিব্যাহারে পাঁচু ও শিবু যখন গয়ার কুটীরে উপস্থিত হইল তখন শ্যালক ও ভগিনীপতি নির্বাক বিস্ময়ের সহিত দেখিল যে গয়ারাম আহারে বসিয়াছে এবং তাহার জ্যাঠাইমা পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতেছে। মনে হয় ইহার পর যুযুৎসু পাঁচুও নিরস্ত হইয়া ভগিনীর আমন্ত্রণে গয়ারামের কুটীরে আহারে বসিয়া গেল। জ্যাঠাইমার এই যে অভিন্নতাবোধ যাহা ক্ষণিক ক্রোধে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল ইহাই সর্বত্র শত বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যেও বাঙ্গালীর যৌথ পরিবারকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল।

২

'ছবি' ও 'দত্তা' যৌথ পরিবারের কাহিনী নয়। উভয় গল্পই সার্থক, মিলনাত্মক প্রেমের কাহিনী এবং উভয় গল্পেই একাধিক পরিবারের সম্মিলন দেখা যায়। আবার উভয় গল্পেই নায়িকা অর্থশালিনী এবং নায়ক দরিদ্র কিন্তু সংস্কৃতিসম্পন্ন; উভয়ত্র নায়কের পিতা বন্ধুর কাছে ঋণ রাখিয়া মারা গিয়াছেন এবং উত্তমর্ণ নায়িকারই পিতা। গল্প যখন আরম্ভ হইয়াছে তখন মূল উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ মৃত; কিন্তু উত্তমর্ণ এই স্থির বিশ্বাস লইয়া মারা গিয়াছেন যে বন্ধুপুত্রই তাঁহার ভাবী জামাতা।

ইহা ছাড়া একজন প্রতিনায়ক আছে; প্রতিনায়কের বৈশিষ্ট্যের জন্যই দুই গল্পে পার্থক্য এবং সেইখানেই 'দত্তা'র শ্রেষ্ঠত্ব। 'ছবি'তে প্রতিনায়ক অন্য গ্রামের বাসিন্দা, অসমসাহসী বলিষ্ঠ বীর যুবক পো-থিন। 'ছবি' অনেক আগে লিখিত 'কোয়েল' গল্পের সংশোধিত সংস্করণ। উত্তর কালে লিখিত 'দত্তা'য় শরৎচন্দ্রের শিল্পনৈপুণ্য অনেক বেশি অগ্রসর হইয়াছে এবং এই অগ্রগতি

প্রধানত প্রতিনায়কের পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হইয়াছে। 'দত্তা'য় দুই বন্ধুর সঙ্গে তৃতীয় এক বন্ধুকে যোগ করা হইয়াছে এবং তিনিই গ্রন্থে জটিলতা ও সংঘাতের অবতারণা করিয়াছেন। এই বন্ধু—রাসবিহারী—জীবিত এবং তিনি নায়িকার অভিভাবক। এই কুচক্রী চরিত্র শরৎচন্দ্রের অন্যতম প্রধান সৃষ্টি। তাঁহার পুত্র বিলাসবিহারীর বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় সে দর্পী ও অবিবেকী, চলতি কথায় যাহাকে বলে 'বলবন্ত মূর্খ'। শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসে একটি প্রতিনায়িকা, ব্রাহ্মসমাজের আচার্য দয়ালের ভাগ্নী, নলিনীকে আনিয়া প্লটে জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছেন। নলিনী সম্পর্কে নায়িকা বিজয়ার ঈর্ষা একেবারে অমূলক, কিন্তু অমূলক বলিয়াই ইহা গল্পকে শুধু পরিণতির দিকে অগ্রসর করিয়াছে, বিন্দুমাত্র তিক্ততার সঞ্চার করে নাই।

শরৎচন্দ্রের রচনায় বহু দুর্বৃত্তের সন্ধান পাওয়া যায়। এক হিসাবে 'দত্তা'র রাসবিহারী অনন্য, কারণ তিনি মিষ্টভাষী, সুকৌশলী; তিনি প্রতিকূল অবস্থার দ্বারা বিচলিত না হইয়া ধীর স্থির পদক্ষেপে আপন লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন। তিনি বিজয়ার মৃত পিতা, তাঁহার বাল্যসুহৃদের শেষ ইচ্ছাকে নিজের সুবিধামত বিকৃত করিয়া পুত্র বিলাসের সঙ্গে বিজয়ার বিবাহ দিয়া বিজয়ার সম্পত্তি হস্তগত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিপক্ষ, মৃত বন্ধু জগদীশের পুত্র নরেন সহায়সম্বলহীন এবং উচ্চশিক্ষিত হইলেও নিজ স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন। এইরূপ নায়ক তাঁহার কাছে পরাজিত হইবে ইহাই প্রত্যাশিত ছিল। বিশেষত নরেন আবার এমন আপনভোলা যে তীক্ষ্ণধী হইলেও সে বিজয়ার মনের কথা বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু এই অন্যমনস্ক ব্যক্তির কাছেই চক্রী হার মানিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছেন, যেমন কাণ্ডজ্ঞানহীন গিরিশের নির্বুদ্ধিতা হরিশের সমস্ত পরিকল্পনা ও আয়োজনকে ব্যর্থ করিয়াছে, যেমন অল্পবুদ্ধি গোকুলের কাছে প্রাজ্ঞ নিমাই রায় নতশির হইয়াছেন। এই জাতীয় পরিণতি শরৎচন্দ্রের প্রতিভার সঙ্গে সুসঙ্গত, কারণ তিনি বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা অপেক্ষা হৃদয়ের প্রশস্ততাকে অধিক মূল্য দিয়াছেন।

৩

শুধু একটি উপন্যাসে আত্মভোলা, ছিটগ্রস্ত কিন্তু সদাশয় ব্যক্তি কুচক্রী দুর্বৃত্তের কাছে হার মানিয়া নির্বাসিত হইয়াছেন। তিনি 'বামুনের মেয়ে'র

প্রিয়নাথ ডাক্তার। কিন্তু 'বামুনের মেয়ে' অন্য ধরনের উপন্যাস, শরৎপ্রতিভার অন্য একটি দিকের প্রকাশ। শরৎচন্দ্র অনেক গল্প উপন্যাসেই প্রীতিহীন সমাজ ও ক্ষমাহীন ধর্মের চিত্র আঁকিয়াছেন বা পরোক্ষ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি কাহিনীতে সামাজিক ও ধর্মীয় অন্যায়ের বর্ণনাই প্রাধান্য পাইয়াছে। 'বামুনের মেয়ে' সেই শ্রেণীতে পড়ে। ইহার মধ্যে প্রিয়নাথ ডাক্তারের করুণ মধুর কৌতুকস্নিগ্ধ চরিত্র খানিকটা আমাদের উপরি-পাওনা।

'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে কৌলীন্যপ্রথার বিকৃতি, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দুর দুর্গতি এবং শক্তিমান ও ধনবান হৃদয়হীন জমিদারের উৎপীড়নের তীব্রোজ্জ্বল বর্ণনা আছে। শরচৎন্দ্র নিজেই আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি শুনিয়াছিলেন যে, আমাদের একজন সর্বজনপূজ্য সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক 'বামুনের মেয়ে' একখণ্ড কিনিয়া নিষ্ঠাবান, তাঁহারই মত সর্বজনপূজ্য সাহিত্যিক অধ্যাপককে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তারপর একদিন 'বসুমতী' পত্রিকার অফিসে ইঁহাদের সাক্ষাৎ হইলে তর্কাতর্কি হাতাহাতিতে পরিণত হয়। আবার শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, যে কৌলীন্য ও কদর্য বহুবিবাহ প্রথার বিকৃতির চিত্র এখানে আঁকা হইয়াছে তাহা তো বিদ্যাসাগরের আমলেই প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্য তিনি সামাজিক চিত্র হিসাবে 'বামুনের মেয়ে' অপেক্ষা 'পল্লীসমাজ'কে প্রাধান্য দিয়াছেন।

বিষয়টিকে অন্যভাবেও দেখা যাইতে পারে। তাহা হইলে সামাজিক, রাজনৈতিক সাহিত্যের মূল্যায়ন অন্য রকমের হইবে এবং হয়ত একদা জনপ্রিয় 'পল্লীসমাজ' অপেক্ষা 'বামুনের মেয়ে' 'অরক্ষণীয়া' প্রভৃতি আর্ট হিসাবেও শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারিবে। মানুষ জীর্ণবাসের মত পুরাতন সামাজিক প্রথা বর্জন করে এবং এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়া তাহার মনুষ্যত্বও ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার চরিত্রের মধ্যে যাহা চিরন্তন তাহাও অবিনশ্বর থাকিয়া যায়। এই সহিতত্বই ধরা পড়ে কবির কাব্যে, ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে। এই জন্যই পুরাকালের কাহিনীও 'শাশ্বতভাবে আধুনিক'। বাল্মীকি ইক্ষ্বাকু বংশের গৌরব মহামানব রামচন্দ্রের মহিমার অংশ হিসাবে সীতার বনবাসের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ইহার কয়েক শতব্দী পর ভবভূতি এই কাহিনীকে অন্যভাবে দেখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'তিনি সীতাকে দাঁড় করিয়াছেন রামচন্দ্রের প্রতি প্রবল গঞ্জনারূপে।' আমরা বাল্মীকি ও ভবভূতির কাল হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছি। কিন্তু তবু উভয় কাব্যের মধ্যেই আধুনিক মানবের

আস্বাদযোগ্য রস পাইয়া থাকি। দৈবাদেশে এবং বৃহত্তর সামাজিক কর্তব্যের প্রেরণায় ট্রয়যুদ্ধের প্রাক্কালে রাজা অ্যাগামেম্‌নন্ তাঁহার কন্যা আইফিগেনিয়াকে হত্যা করিয়াছিলেন। ইহার বহু শতাব্দী পরে ইউরিপিদিস আইফিগেনিয়ার কাহিনী লিখিয়াছেন এবং সেই নাটকে দেবতার অনুগ্রহে আইফিগেনিয়া রক্ষা পাইয়া প্রবাসে তাঁহার আশাভঙ্গ ও ব্যর্থ যৌবনের যে বিলাপ করিয়াছেন তাহা অপরূপ কাব্যগুণসম্পন্ন এবং সেই হিসাবে শাশ্বতভাবে আধুনিক। ইউ-রিপিদিসের সেই বিখ্যাত নাটকের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের এই উপন্যাসের তুলনা করা হয়ত পরিমাণবোধের অভাবের ইঙ্গিত দিবে। কিন্তু তবু বলিব কৌলীন্য বা বহু-বিবাহ উঠিয়া গেলেও সন্ধ্যার জীবনের ব্যর্থতা, নির্দোষ প্রিয়নাথ ডাক্তারের অপমানের ট্র্যাজেডির আবেদন দেশকাল-অনালিঙ্গিত। সেই দিক্ হইতে বিচার করিলে গোলোক চাটুয্যে রাসমণি প্রভৃতির ভণ্ডামি ও নিষ্ঠুরতার তাৎপর্যও অবিনশ্বর।

এই উপন্যাসের বিভিন্ন অংশ এমন সুসংহত যে মনে হয় কোথাও কোন ফাঁক নাই। প্রধান চরিত্র এক দুর্বৃত্ত, ভণ্ড জমিদার, যিনি শ্রেষ্ঠ কুলীন এবং সেই কারণেই কুলীন কন্যার মান রক্ষার জন্য নাত্‌নীর সমান মেয়েকে বিবাহ করিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব, কিন্তু গোপনে ছাগল ভেঁড়া (এবং প্রয়োজন হইলে গোরু ?) চালান দেন, এবং তিনি সুদে টাকা ধার দেন বলিয়া তাঁহার কাছে বহু লোক বিক্রীত ও তাঁহার আজ্ঞাবহ। সনাতন হিন্দুধর্মরক্ষার জন্য তিনি বিলাতফেরত ব্রাহ্মণকে এবং অসহায় দুলে বাগ্দীকে ব্রাহ্মণের গ্রামছাড়া করেন এবং তাঁহার অনুচরদের মারফতে অন্য কুলীনের বংশে কোথায় ছিদ্র আছে তাহারও তথ্য-সংগ্রহ করিয়া রাখেন যাহাতে প্রয়োজন হইলে তাহাদের জাতি মারিতে পারেন। ইহা এক-রঙা ; কিন্তু একটির পর একটি ঘটনা এমন সুসমঞ্জস এবং প্রত্যেকটি চিত্রেই সমাজপতি ও তদধীন সমাজের বীভৎস কালিমা এমন তীব্রভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে মিল্টনের নরকবর্ণনা স্মরণ করিয়া বলা যায় —এখানে আলো নাই শুধু চোখ ঝলসানো অন্ধকার ! সনাতন হিন্দু সমাজের চূড়ামণি গোলোক চাটুয্যের সবচেয়ে গর্হিত অপকীর্তি বিধবা শ্যালিকা জ্ঞানদার সর্বনাশসাধন। নিজের মাতৃহীন সন্তানের প্রতি করুণার উদ্রেক করিয়া তিনি এই বালবিধবাকে নিজের শ্বশুরগৃহে ফিরিতে দেন নাই, তারপর তাহাকে (বোধহয় বিবাহের কথা বলিয়া) প্রলুব্ধ করিয়া তাহার সতীত্ব নাশ করিয়াছেন এবং সে অন্তঃসত্ত্বা হইলে প্রথমে তাহাকে বুড়ো শ্বশুরের ঘাড়ে

চাপাইতে চাহিয়াছেন এবং জ্ঞানদা এই প্রবঞ্চনার উপর প্রবঞ্চনার শিকার হইতে অস্বীকার করিলে পঞ্চাশটি টাকা দিয়া তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। পূর্বে বলিয়াছি প্রিয়নাথ ডাক্তারের ডাক্তারি বাতিক, সরলতা ও অন্যমনস্কতা আমাদের উপরি-পাওনা। কিন্তু ইহাও গ্রন্থের সঙ্গে, গোলোক চাটুয্যের পাষণ্ডতার সঙ্গে, অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। প্রিয়নাথ ডাক্তারের মত সাধু-লোক ছাড়া আর কাহারও কাছে জ্ঞানদা ওষুধ খাইবে না বা তাহার কাছে ছাড়া তাহার অসুখের কথা অন্য লোককে বলা যায় না বা রাত্রিতে ঘরে ডাকা যায় না। আর তিনি যে গর্ভপাত করিতে রাজি হইবেন না ইহাও জানা কথা। সুতরাং প্রয়োজন হইলে তাঁহার মত সরল, কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকের উপর সহজেই জ্ঞানদার কলঙ্কের দায়িত্ব চাপাইয়া এই অনাথাকে গৃহের বাহির করিয়া দেওয়া যায়। এই পরম আশ্চর্য অথচ পরম সরল লোকটির একটি উক্তি এই বেদনাদায়ক কাহিনীর উপর করুণমধুর যবনিকা দিয়াছে। অপমানিত লাঞ্ছিত প্রিয়নাথ দেশত্যাগ করিবার পূর্বে তাঁহার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বইগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী বিপিনকে দান করিয়া গেলেন কারণ 'সে বেচারা গরীব, বই কিনিতে পারে না বলেই কিছু শিখতে পারে না।' অন্তরে বাহিরে এই উদার লোকটির শেষ সম্বল তাঁহার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসানৈপুণ্যের অভিমান চরম দুর্যোগেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই।*

'অরক্ষণীয়া' কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দারিদ্র্য-নিপীড়িত, রোগজীর্ণ পল্লীসমাজের আর একটি তীব্রোজ্জ্বল চিত্র। ইহাও বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের কাহিনী; তবে এখানে কৌলীন্যের উল্লেখ নাই। যে পরিবারের কাহিনী এখানে প্রধান তাহা পৃথকও বটে আবার একান্নবর্তীও বটে এবং এখানে যৌথ পরিবারের মাধুর্য অপেক্ষা হীনবল পরনির্ভর অংশের দুর্দশার চিত্রই প্রাধান্য পাইয়াছে; এমন কি যেখানে উচ্চ আদর্শের প্রত্যাশা ছিল তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে। তবু মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রিতে তড়িৎরেখার মত অপ্রত্যাশিতভাবে নীচতার মধ্যে উদারতাও কখনও কখনও স্ফুরিত হইয়া মানুষের মনুষ্যত্ব সম্পর্কে আস্থা ফিরাইয়া আনিয়াছে।

---

* শোনা যায় শরৎচন্দ্র ডিকেন্সের উপন্যাস পড়িতে ভালবাসিতেন। এই উপন্যাসে 'A Tale of Two Cities-এর ছায়া লক্ষণীয়। উভয়ত্র উৎপীড়ক জমিদার, নির্যাতিত নারী এবং একমাত্র কন্যার পিতা সৎসাহসী, কিন্তু ছিটগ্রস্ত (বা বিকারগ্রস্ত) ডাক্তারের সাক্ষাৎ পাই।

প্রিয়নাথ ও অনাথনাথ দুই ভাই একান্নবর্তী পরিবারেই ছিলেন, সঙ্গে ছিলেন জ্যেষ্ঠ গোলোকনাথের বিধবা পত্নী স্বর্ণমঞ্জরী। তিনি সমধিক উপার্জনশীল অনাথনাথেরই আশ্রিত এবং তাঁহারই বিষের জ্বালায় প্রিয়নাথ বিবাদ করিয়া স্ত্রী দুর্গামণি ও অনূঢ়া কন্যা জ্ঞানদাকে লইয়া পৃথক্ সংসার পাতিয়াছিলেন। এই বড় গল্প বা ছোট উপন্যাস প্রধানতঃ জ্ঞানদারই কাহিনীএবংঅনতিসুদূর অতীতের (অনেকটা এখনকারও) বাঙালী সমাজে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার এবং অরক্ষণীয়া কন্যার দুর্দশার চিত্র। সেই চিত্র এত কঠোর, এত করুণ যে অবস্থার পরিবর্তন হইলেও সেই বিপন্ন বিধবা মাতা ও তাহার ততোধিক বিপন্ন কন্যার বেদনা এবং সংকট হইতে নিস্তার পাওয়ার মধ্য দিয়া সনাতন মানবাত্মার অভ্রভেদী আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়াছে। অরক্ষণীয়া জ্ঞানদা দারিদ্র্যের নিপীড়ন এবং স্বর্ণমঞ্জরীর নির্যাতন অনেকটা সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে, তাহার দুর্দশা চরমে পহুঁছিয়াছে যখন তাহার প্রণয়ী অতুল শুধু বিশ্বাসভঙ্গই করে নাই, স্বর্ণমঞ্জরীর নির্যাতনেও অংশ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ইহা একেবারে অসহ্য হইয়াছে তখনই যখন তাহার মুমূর্ষু মাতার স্নেহও বিকৃত হইয়া গিয়াছে এবং এই নিগ্রহের ফলে মায়ের মৃত্যুর পূর্বে তাঁহাকে শেষ সান্ত্বনা দিতে ও নিজের নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করিতে যে অজ্ঞাতসারে নিজেকে সং সাজাইয়া বসিয়াছে। এইভাবে সে নিজেই নিজের পরম দুর্গতির ব্যবস্থা করিয়াছে।

এই গল্পের কতকগুলি ছোট ছোট উক্তি ও দুই-একটি ছোট ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমেই উল্লেখ করিতে হইবে অতুলের শেষ মুহূর্তে মত পরিবর্তনের। স্বর্ণমঞ্জরীর খপ্পরে পড়িয়া, রূপ ও ধনের লোভে সে জ্ঞানদার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, কিন্তু জ্ঞানদার চরম দুর্দশার দিনে তাহার সুপ্ত চৈতন্য আবার জাগ্রত হইয়াছে। তাহার দ্বিতীয় মত পরিবর্তন তাহার চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন নয় এবং দুঃখদুর্দশার বর্ণনা সত্ত্বেও এই পরিবর্তন গল্পটিকে মিলনান্ত রোমান্সের পর্যায়ে আনিয়াছে। এই ক্ষেত্রে এই পরিণতিই সুসঙ্গত। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য স্বর্ণমঞ্জরী ও দুর্গামণির ছোট জা—মাধুরীর মা। যে আরামপ্রিয়, কর্মকুণ্ঠ স্ত্রীলোক পরিশ্রম করিয়া নিজের কাজ করে না বা স্বার্থ দেখে না সে অপরের সুখ-সুবিধা দেখিবে এইরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু বোধ হয় স্বার্থ ও পরার্থ কোনটাই দেখে না বলিয়া সে স্বচ্ছদৃষ্টি। মাধুরীকে বিবাহ করিতে প্রলুব্ধ হইয়া অতুল প্রকাশ্যে জ্ঞানদাকে ব্যঙ্গ করিলে, জ্ঞানদার যে পূর্বরাগকে স্বর্ণমঞ্জরী বেহায়াপনা বলিয়া মনে করিতেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া

তিনি 'খন্‌খন্‌ করিয়া বলিলেন, এক ফোঁটা মেয়ে—একি ঘোর কলি!' উত্তরে ছোট বৌ (অর্থাৎ মাধুরীর মা) একটু হাসিয়া কহিল, 'ঘোর কলি বলেই বাঁচোয়া দিদি আর কোন কাল হলে, মা বসুন্ধরা লজ্জায় দু ফাঁক হয়ে যেতেন অতুল।' কিন্তু একটা কথা বলা প্রয়োজন। এই অনুকাহিনীতে গ্রন্থকার একটু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন। মাধুরীর মা বাপের বাড়ি যাওয়ার আগে নিজের মেয়ে ও জ্ঞানদার তুলনা করিয়া অতুলকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিয়াছিল, 'অতুল হীরা ফেলে যে কাঁচ আঁচলে বাঁধে, তাহার মনস্তাপের অবধি থাকে না।' একে তো এইরূপ উক্তি তাহার স্বার্থের পরিপন্থী, কারণ মাধুরী তাহারই মেয়ে। তারপর এইরূপ সক্রিয় মহানুভবতা তাহার মত অলস চরিত্রের লোকের পক্ষে বেমানান। শুধু পূর্বোল্লিখিত স্বতঃস্ফূর্ত ব্যঙ্গোক্তিটুকু স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এই গ্রন্থের একটি স্মরণীয় অধ্যায় দুর্গামণি ও জ্ঞানদার হরিপাল বাসের বর্ণনা। জঙ্গলাকীর্ণ, রোগজর্জর পল্লীবঙ্গ যে কিরূপ ভয়াবহ খুব অল্প কথায় শরৎচন্দ্র তাহার জলন্ত বর্ণনা দিয়াছেন। ইহার সবচেয়ে স্মরণীয় অংশ জ্ঞানদার মামী ভামিনীর একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য : 'বাছা! পল্লীগ্রামে সাপের কামড়ে আর কটা লোক মরে, মরে যা তা ঐ ম্যালোয়ারিতে।' আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার বলে ম্যালেরিয়া নির্মূল হইতে পারে, কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার তাৎপর্যের তীক্ষ্ণতা তখনও ম্লান হইবে না। ভামিনী রূপে 'পোড়াকাঠ'; রোগজীর্ণ, হতশ্রী পল্লীবাংলার উপযুক্ত প্রতীক। কিন্তু এই বঙ্গের বধূর যে বুকভরা মধু তাহারও পরিচয় এই রূপহীনা, রূঢ়ভাষিণী মহিলার ব্যবহারে পাওয়া যায় এবং তাহা এই শোকদুঃখের কাহিনীকে অপরূপ মাধুর্য দান করিয়াছে। তাহার স্বামী বিধবা ভগিনীর কোন খোঁজ নেয় নাই এবং যখন দুর্গামণি জ্ঞানদাকে লইয়া ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে তখন সে অর্থলোভে শ্যালক নবীনের সঙ্গে জ্ঞানদার বিবাহ দিতে ব্যগ্র হইল। এই সময় ভামিনীই স্বামী ও দাদার গুণকীর্তন করিয়া বলিল, 'নবীনের সঙ্গে বিয়ে দেব! তা হলে একশ' টাকা সুদে আসলে শোধ যায়, না? ... 'আমার নিজের দাদা, আমি জানিনে? তাড়ি গাঁজা খেয়ে পাঁচ ছেলের মা বৌটাকে আট মাস পেটের ওপর লাথি মেরে মেরে ফেল্লে কিনা—তাই এমন সুপাত্তর আর নেই?...আঁশবঁটিটা আমার দেখে রেখো। শালা-ভগ্নীপোতের একসঙ্গে নাক-কান কেটে তবে ছাড়ব।' জ্ঞানদা জরে শয্যাগত হইলে অর্থাভাবের অজুহাতে মামা তাহার চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত করে নাই, কিন্তু জ্ঞানদা

পাচন খাইতে অপারগ দেখিয়া মামী এই বাবু মেয়েকে তিক্ত ভাষায় গঞ্জনা করিলেও নিজের একমাত্র গহনা রূপার গোট বন্ধক দিয়া তাহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়াছে।

৪

উপরি-উল্লিখিত উপন্যাস দুইটিতে যে অত্যাচারের চিত্র আঁকা হইয়াছে তাহা উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের। 'বামুনের মেয়ে'তে অতি দরিদ্র অস্পৃশ্য দুলেদের কথা আছে, কিন্তু তাহারা প্রান্তিক চরিত্র, বামুনরা সবাই সচ্ছল আর দুর্গামণি দারিদ্র্য অপেক্ষা কুসংস্কারের দ্বারাই সমধিক নিপীড়িত হইয়াছে। 'অভাগীর স্বর্গ' ও 'বিলাসী' একটু অন্য রকমের। অভাগী দরিদ্র ও অন্ত্যজ এবং বিলাসীর স্বামী মৃত্যুঞ্জয় সম্পন্ন কায়স্থ সন্তান হইলেও গল্পটি অস্পৃশ্য মাল গৃহস্থের কথা, যাহাদের জাতিগত পেশা সাপ ধরা। 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের শিরোনামেই ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ইহা একটানা দুঃখদারিদ্র্য ও নিম্নবর্ণের উপর উচ্চবর্ণের নিপীড়নের কাহিনী। শৈশবে মাতৃহীন দুলে জাতীয়া অভাগীর বিবাহ হইল রসিক বাঘের সঙ্গে; পুত্র কাঙালীর জন্মের পরই রসিক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী সহ কিছুদূরে চলিয়া গেল। অনশন অর্ধাশনে জীবন যাপন করিতে করিতে অভাগীর মন একদিন এক অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। প্রতিবেশিনী মুখুয্যে গিন্নিকে তাহার ছেলে মুখাগ্নি করার পর ঊর্ধ্বমুখী চিতাগ্নি দেখিয়া তাহার মনে হইল সেও কাঙালীর হাতের আগুন পাইয়া একদিন স্বর্গে গমন করিবে। এইভাবে মর্ত্যে প্রবঞ্চিতা এই জন্মদুঃখিনীও মুখুয্যে গৃহিণীর মত সৌভাগ্যবতী হইবে। এই জন্য যখন রোগে পড়িল তখন সে নির্ভয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। শেষ সময় আসন্ন দেখিয়া যে স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল তাহাকে সংবাদ দিল, যাহাতে পুত্রের মুখাগ্নির সঙ্গে স্বামীর পদধূলি লইয়া সে স্বর্গের পথ প্রশস্ত করিতে পারে। কিন্তু রসিক যখন আসিল তখন তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইয়াছে, কাজেই মর্ত্যের সম্বল সজ্ঞানে গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহার মৃতদেহ দাহ করিবার জন্য তাহার নিজের হাতে পোঁতা গাছ কাটা গেল না, কারণ জমিদারের গোমস্তা বাধা দিয়া বলিল যে গাছটা জমিদারের সম্পত্তি, কাঙালী পাঁচ টাকা দিতে পারিলে তবে গাছ কাটিতে পারিবে। আর দুলে বাগ্দীদের মৃতদেহ মাটিতে পোঁতা হয়, দাহ করার গৌরব

পায় উচ্চবর্ণের লোকের মৃতদেহ। তারপর মৃতদেহ মাটিতে পুঁতিয়া একটি পাট কাঠি জ্বালাইয়া কাঙালী অভাগীর স্বর্গ-প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিল!

'বামুনের মেয়ে' 'অরক্ষণীয়া' 'অভাগীর স্বর্গ' দুঃখ ও নিগ্রহের কাহিনী। ইহাদের মধ্যে করুণরস থাকিলেও ট্র্যাজেডির মহিমা নাই। নিছক দুঃখকষ্টের কথা কাব্যের উপযুক্ত বিষয় নয়, ইহা ম্যাথু আর্নল্ড, ইয়েটস প্রভৃতি কবি সমালোচকেরা বলিয়াছেন। অন্য সমালোচকেরা বলিবেন, ইহা কাব্যের বিষয় হইলেও, ট্র্যাজেডির বিষয় হইতে পারে না। ট্র্যাজেডিতে মানুষ পরাস্ত হয়, কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়া মানবাত্মার অপরাজেয় শক্তি ও ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সা ধ্বনিত হয়। যে প্রতিকূল শক্তি তাহাকে অভিভূত করে সেই শক্তিও তাহার কাছে হতবাক্ হইয়া পড়ে। ইয়াগো পরিশেষে বলিয়াছিল—'Demand me nothing. What you know, you know.' এই উক্তির মধ্য দিয়া শয়তানের অনুচর শয়তানের প্রতিদ্বন্দ্বীকে তাহার শেষ নমস্কার জানাইয়া দিয়াছে।

এই দিক দিয়া বিচার করিলে 'বিলাসী' প্রভৃতি গল্প শিল্পকর্ম হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে। 'বিলাসী' ডায়েরির আকারে লিখিত; ডায়েরি লেখক ন্যাড়া—শরৎচন্দ্রের নিজের ডাকনাম—গল্পের অন্যতম চরিত্র। ইহাতে গল্পে খানিকটা প্রত্যক্ষতা আসিয়াছে; ডায়েরি লেখকের মন্তব্যের আতিশয্যের জন্য স্বল্পপরিসর কাহিনী আরও ক্ষীণ হইয়াছে এইরূপও মনে হয় না। ইহার কারণ বক্তা কাহিনীর অন্তর্গত এবং তাহার মন্তব্য কাহিনীর মধ্যে মিশিয়া গিয়া প্লট ও চরিত্রকে সঞ্জীবিত করিয়াছে। ইহা দুঃখকষ্টের গল্প এবং ইহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে নায়ক ও নায়িকার মৃত্যু ও আত্মহত্যায়, কিন্তু ইহাদের নিঃসঙ্গ একঘরে জীবন ও তাহার করুণ উপসংহারের মধ্য দিয়া মানুষের মনুষ্যত্বের জয় ঘোষিত হইয়াছে। মৃত্যুঞ্জয় থার্ড ক্লাসেই এত বৎসর পড়িয়াছিল যে সে কবে ফোর্থ ক্লাসে পড়িয়াছিল তাহা কেহ স্মরণ করিতে পারিত না, সে তাড়ি গুলি খাইত এবং শেষে সাপুড়ের সাকরেদ হইয়া মাল মেয়েকে বিবাহ করিয়া এই কুলীন কায়স্থ সন্তান ভগবদ্দত্ত ভদ্র চেহারা পর্যন্ত পাল্টাইয়া ফেলিয়াছিল। সে সাপ ধরিতে শিখিয়াছিল এবং বাপ-মায়ের দেওয়া 'মৃত্যুঞ্জয়' নাম ব্যর্থ করিয়া অল্প বয়সেই সর্পাঘাতে মারা গেল। কিন্তু সামাজিক মর্যাদাকে তুচ্ছ করিয়া এবং সামাজিক গ্লানিকে উপেক্ষা করিয়া সে যে বিলাসীর সেবা ও প্রেমকে স্বীকৃতি দিতে

পারিয়াছে ইহার মধ্য দিয়াই সে পিতৃদত্ত নামকে সার্থক করিতে পারিয়াছে। বিলাসী নিজে সাপুড়ের মেয়ে ; সে সাপুড়েদের মন্ত্রতন্ত্র শিকড় প্রভৃতির অসারতা জানিত এবং তাই যে পেশার মোহে স্বামী প্রলুব্ধ হইয়াছিল তাহার বিপদ হইতে সে স্বামীকে আগলাইতে চাহিত। এইজন্য সাপ ধরার অভিযানে সে কখনও স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ করে নাই। আর সেই স্বামীকে যখন রক্ষা করিতে পারিল না তখন বিষপানে আত্মহত্যা করিয়া সে মৃত্যুকে জয় করিল।

'একাদশী বৈরাগী' আর একটি সার্থক গল্প। ইহাকে ট্র্যাজেডি বলা যায় না কারণ গল্পের পরিণতিতে প্রধান প্রতিপক্ষ অপূর্ব নির্যাতিত একাদশী ও তাহার দুর্ভাগিনী বৈমাত্র বোন গৌরীর কাছে নতিস্বীকার করিয়াছে। অথচ ইহা কমেডিও নহে, কারণ ইহাও সামাজিক নিপীড়নের কাহিনী এবং ইহার মধ্যে বিশুদ্ধ হাস্যরসের উপাদান খুব কমই আছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা এক নূতন ধরনের সৃষ্টি যাহা বিষাদান্তও নহে আবার হাস্যরসেরও সঞ্চার করে না। ইহার বিষয় একাদশীর সঙ্গে সমাজনেতাদের সংঘর্ষ। প্রথম দৃষ্টিতে একাদশীর মধ্যে নায়কোচিত গুণের একান্ত অভাবই পরিলক্ষিত হয়। সে ধীর হইলেও উদাত্ত নহে, আবার গ্রন্থকার কৌশলে ধাপে ধাপে তাহার বীরোচিত গুণ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। সে সংকীর্ণ কুশীদজীবী, তাহার মধ্যে উদারতার বিন্দুমাত্র পরিচয় নাই ; অথচ তাহার বিস্ময়কার সততায় তাহার গোমস্তা পর্যন্ত বিড়ম্বিত ও হাস্যাস্পদ হইয়াছে। শেক্সপীয়র হীন কুশীদজীবী শাইলককে প্রায় ট্র্যাজেডির পর্যায়ে তুলিয়াছিলেন। অবশেষে আবার তাহাকে জব্দ করিয়া ব্যঙ্গকৌতুকের স্তরে নামাইয়া আনিয়াছেন। একাদশী বৈরাগীর চরিত্রে সেই জটিলতা নাই ; সে কখনও নিপীড়িত জাতির প্রতিনিধিত্ব দাবী করে নাই। সে ট্র্যাজেডির নায়কের শিখরে উন্নীত হয় নাই ; আবার প্রহসনের সানুদেশেও অবতরণ করে নাই।

একাদশী বৈরাগীর কাহিনীর পরিমণ্ডল সীমিত ; ইহা শুধু দুইটি লোকের ইতিহাস। কিন্তু ইহার মধ্যে একাদশীর চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা লক্ষণীয় ও স্মরণীয় এবং ইহার অভিব্যক্তিও ব্যঞ্জনাময়। তাহার আসল নাম কি আমরা জানি না ; অতিশয় কৃপণ ও কঞ্জুষ বলিয়াই তাহাকে একাদশী বলা হইত। কিন্তু ব্যয়কুণ্ঠতা বা অনুদারতা তাহার চরিত্রের মৌলিক লক্ষণ এমন কোন ইঙ্গিত গ্রন্থমধ্যে নাই। সে জাতিতে সদ্গোপ এবং সম্পন্ন গৃহস্থ। সে পিতৃমাতৃহীন বৈমাত্র ছোট বোন গৌরীকে বহু আদরে মানুষ করিয়াছিল।

গৌরী বিধবা হইয়া তাহার গৃহেই ফিরিয়া আসিয়াছিল এবং সেইখানেই তাহার 'পদস্খলন' হয়। এই ভগিনীকে গ্রহণ করিবার জন্যই তাহাকে অনেক উৎপাত সহ্য করিতে হইয়াছে। সে জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহাকে গ্রামছাড়া করা হইয়াছে, কিন্তু সে মাথা হেঁট করে নাই, নিজের নির্বাচিত পথ হইতে দক্ষিণে বামে বিন্দুমাত্র হেলে নাই। কিন্তু এই ক্ষমাহীন ধর্ম ও প্রীতিহীন সমাজকে সে ক্ষমাও করে নাই—ইহাই গল্পের ব্যঞ্জনা। সে অর্থগৃধ্নু এবং তাহার গ্রামের ভিটা তাহার কাছে অকেজো হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা প্রতিবেশী স্মৃতিরত্নের কাছে বিক্রয় করিলে সে উপযুক্ত মূল্য পাইত। কিন্তু সে এই বলিয়া স্মৃতিরত্নের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল, 'এমন অনুমতি করবেন না ঠাকুরমশাই, ঐ এক কোঁটা জমির বদলে ব্রাহ্মণের কাছে দাম নিতে আমি কিছুতেই পারিব না। ব্রাহ্মণের সেবায় লাগবে এ ত আমার সাত পুরুষের ভাগ্য। ··কিন্তু···বাবা মরণকালে মাথার দিব্যি দিয়ে বলে গিয়েছিলেন, খেতেও যদি না পাস বাবা বাস্তভিটে কখনও ছাড়িস নে।' এই ছদ্ম বিনয় এবং নিগূঢ় অথচ স্পষ্টগ্রাহ্য ব্যঙ্গ কাহারও দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। এইরূপ বিনয় ও বিদ্রূপের সুরেই সে নিজের অসাধু ব্রাহ্মণ গোমস্তার স্বল্পদৃষ্টির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সে যে কোন অধমর্ণের কাছে প্রাপ্য টাকার এক পয়সা ছাড়িয়া দেয় না, কি কোন কাজে দয়াদাক্ষিণ্য দেখায় না—ইহাও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদেরই অঙ্গ। যে সমাজ তাহার স্নেহের মর্যাদা দেয় না তাহার প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র মায়া নাই অথবা সেখানকার পোশাকী সৎকাজের প্রতি তাহার কোন সহানুভূতি নাই। সে যে কাহাকেও এক পয়সা ঠকায় না, যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিয়া দেয়, তাহাও বিদ্রোহীর আত্মসম্মানের অঙ্গ। ইহার সঙ্গে তুলনা করুন স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে যিনি অন্য লোকের সঙ্গে একত্র হইয়া তাহাকে গ্রামছাড়া করিয়া আবার তাহারই আপাত-উদার প্রস্তাবে প্রলুব্ধ হইয়া তাহার দেবদ্বিজে ভক্তিতে পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ গোমস্তাকে যে সম্মুখে প্রভু ও তাহার ভগিনীর তোষামোদ করিয়া আড়ালে তাহাদের কুৎসা রটনায় ও অভিসম্পাতে মুখর হইয়া উঠে।

'হরিলক্ষ্মী' গল্পটি আর্থিক বৈষম্যের ফলে ধনী জ্ঞাতি প্রতিবেশীর দ্বারা নির্ধনের অপমানের কাহিনী। এখানে সমাজ বা ধর্মের কোন প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু স্বল্পপরিসরের মধ্যে বর্ণবৈচিত্র্য, মনস্তাত্ত্বিক ঘাতপ্রতিঘাত এবং বিপরীত-লক্ষণা

বা ironyর প্রাচুর্য ইহাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। বড় তরফের জমিদার শিবচন্দ্র ধনী, প্রতাপশালী গ্রাম্য জমিদার ; কিন্তু তাঁহার শিক্ষার বালাই নাই এবং সহজাত সংস্কৃতিও নাই। গ্রামের সীমিত পরিবেশে চাটুকারদের তোষামোদের ফলে তিনি ক্ষমতা ও সম্পদের আস্ফালনের দ্বারা দরিদ্র অসহায় বান্ধবকে অপমান করাকেই সবচেয়ে গৌরবের কাজ মনে করেন। তিনি সাড়ে পনেরো আনার মালিক ; বাকি আধ আনার মালিক জ্ঞাতিভ্রাতা নিরীহ বিপিন ; সে গল্পে উল্লিখিত হইয়াছে, উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী 'মেজবৌ' কমলা গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র। সেও পল্লীগ্রামের মেয়ে, দরিদ্র পিতার সন্তান ; স্কুলের শিক্ষা পায় নাই এবং অল্প বয়সেই তাহার বিবাহ হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাহার সহজাত বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, রুচি মার্জিত, সৌজন্য অপরাজেয় আর আত্মসম্মানবোধ অনমনীয়। এই পরিবেশের মধ্যে আসিয়া পড়িল বড় কর্তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হরিলক্ষ্মী—সে শিক্ষিতা, একটু অভিমানিনী এবং তাহার অভিমানকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য তাহার বর্বর স্বামী সদাই প্রস্তুত ও তাহার কুরুচিকে প্রশ্রয় দেওয়ার লোকেরও অভাব নাই। কিন্তু তাহার যাহা প্রধান গুণ—শিক্ষা ও সংস্কৃতি—তাহাই তাহার সুখের পথে প্রধান অন্তরায় হইল। তাহার শুধু যে পুঁথিগত কিছু বিদ্যাই আছে তাহাই নহে, তাহার রুচিও খানিকটা মার্জিত। যে উপায়ে তাহার স্বামীর দম্ভ স্ফীত হয় তাহার কদর্যতা তাহার মনকে কাঁটার মত বিদ্ধ করে। অথচ মেজবৌয়ের অলঙ্ঘনীয় দূরত্ব তাহাকে ব্যথিত করে এবং মেজবৌয়ের অশিক্ষিতপটুত্ব, কণ্ঠস্বরের সহজাত মাধুর্য, রুচির শুচিতার কাছে তাহার শহুরে বইয়ে পড়া শিক্ষাদীক্ষা আপনিই নতিস্বীকার করিয়াছে এবং স্বামীর কদর্য বিজিগীষা তাহার সমস্ত জীবনের উপর পরাজয়ের কালিমা লেপিয়া দিয়াছে। তাহার মধ্যে যেন দুইটি সত্তা ছিল—একটি দাম্ভিক শিবচরণের স্ত্রী আর একটি মেজবৌয়ের গুণমুগ্ধা আত্মীয়া যে কাছে আসিতে যাইয়া দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে, জয়ের সম্পূর্ণতার মধ্যে পরাজয়ের তিক্ত আস্বাদ পাইয়াছে।

'একাদশী বৈরাগী' 'হরিলক্ষ্মী' প্রভৃতি এক ধরনের ট্র্যাজি-কমেডি। ইউরোপীয় সাহিত্যে ট্র্যাজি-কমেডি শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যে সমস্ত নাটকে—তথা গল্প-উপন্যাসে—নায়ক নানা বিপদ অতিক্রম করিয়া সুখের সন্ধান পায় অথবা যেখানে বাধা-বিচ্ছেদ পার হইয়া নায়ক ও নায়িকা মিলিত হয়, তাহাদিগকেই ট্র্যাজি-কমেডি বলা হয়। কিন্তু 'একাদশী বৈরাগী' বা

'হরিলক্ষ্মী' সেই ধরনের ট্র্যাজি-কমেডি নহে। ইহাদের মধ্যে দুই বিরোধী পক্ষের সংঘর্ষের কথা আছে, কিন্তু সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে পরিসমাপ্তির উল্লেখ নাই। বরং দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে জয়পরাজয়ের নিষ্পত্তিই হয় নাই। কেহ কেহ বলেন যে অবশেষে হরিলক্ষ্মী মেজবৌ কমলাকে নিজের আশ্রয়ে টানিয়া লইয়া তাহার সকল ভার গ্রহণ করিল। কিন্তু গল্পের পরিণতিতে শুধু অশ্রু মুছাইয়া দেওয়ার কথা আছে। হরিলক্ষ্মী ভার গ্রহণ করিলেও কমলা দান গ্রহণ করিবে এইরূপ মনে করার সঙ্গত ইঙ্গিত গল্পের মধ্যে আছে বলিয়া মনে হয় না।

দারিদ্র্য ও সামাজিক নিপীড়ন অবলম্বন করিয়া শরৎচন্দ্র যে সকল গল্প লিখিয়াছেন তন্মধ্যে 'মহেশ' সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত, সংহত এবং রসঘন। ইহা একটি ছোট গল্প, কিন্তু ইহার মধ্যে বিভিন্ন অংশের সংসক্তি, ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে ব্যাপ্তি এবং প্রারম্ভ হইতে উপসংহার পর্যন্ত অবিচলিত অগ্রগতি ইহাকে অনন্যতা দান করিয়াছে। এই গল্পের আর একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ এই যে, ইহার প্রধান চরিত্র একটি মূক প্রাণী। সে গল্পের প্রতি পর্বে ও পর্বাঙ্গে উপস্থিত আছে এবং কথা বলিতে না পারিলেও তাহাকে লইয়াই যাহা কিছু ঘটিবার ঘটিতেছে, তাহার ও তাহার কার্যের মধ্য দিয়াই অন্য সকল চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে ; মনে হয় সেই যেন সকল ঘটনার প্রবর্তক এবং সকল চরিত্রের চালক। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাহার অনশন ও অর্ধাশন সমগ্র পল্লীসমাজকে প্রতিবিম্বিত করিতেছে। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন তিনি গুণ ও কর্মের বিভাগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ছোট গল্পে ব্রাহ্মণ জমিদার ও বঙ্কিমচন্দ্র যাঁহাদিগকে বলিয়াছেন 'ব্রাহ্মণপণ্ডিত' তাঁহাদের প্রতিনিধি তর্করত্ন মহাশয়, উচ্চবর্ণের হিন্দু মাণিক ঘোষ উপস্থিত আছেন আর আছে নীচাদপি নীচঃ—হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্য এবং জাতিহীন মুসলমান সমাজের অন্ত্যজ গফুর জোলা। সাহিত্য নিরপেক্ষ ইতিহাস নহে, পক্ষপাতিত্ব তাহার ধর্ম ; একদেশদর্শিতার দ্বারা সে জীবন্ত হয় এবং এই সজীবতাই তাহাকে সর্বজনীন করিয়া তোলে।

আধুনিক দিক হইতে বিচার করিলেও দেখা যায় যে, একদিকে রহিয়াছে সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি জমিদার এবং তাঁহার আশ্রিত ও অনুচর যাজক স্মৃতিরত্ন এবং পরশ্রমজীবী মাণিক ঘোষ, পিয়াদা, খোঁয়াড়ের রক্ষক প্রভৃতি আর অপর দিকে রহিয়াছে শোষিত চাষী, তাহার কন্যা ও তাহার গরু যাহাদের শ্রমের

দ্বারা শোষক শ্রেণীর সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়, কিন্তু যাহারা নিজেরা অর্ধাশনে অনশনে কালাতিপাত করে, যাহারা ভাতের ফেনটুকু ছাড়িতে পারে না, তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য হিন্দুগ্রামে ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজ বলিয়া যাহারা তৃষ্ণার জলেরও উপযুক্ত ভাগ পায় না। এই শোষিত চাষীর বাড়ির 'মাটির প্রাচীর পড়িয়া গিয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া পথে মিশিয়াছে এবং অন্তঃপুরের লজ্জাসম্ভ্রম পথিকের করুণায় আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছে।' ইহা ছাড়া আর একটি বৈপরীত্য তীব্র আলোক ফেলিয়া চোখ ঝলসাইয়া দেয়। একদিকে রহিয়াছে হিন্দু, বিশেষ করিয়া উচ্চবর্ণের হিন্দু, গো যাহাদের মাতা, দেবতা আর একদিকে রহিয়াছে মুসলমান গফুর গরুর কোরবানি যাহার ধর্মের অঙ্গ। ইহাদের মাঝখানে রহিয়াছে মূক মহেশ; মনে হয় তাহার প্রতি মমতা ও নির্মমতায় উভয় সম্প্রদায়ের প্রকৃত চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই চিত্র পক্ষপাতশূন্য নয়, কিন্তু সত্য। এই বৈপরীত্যকে তীব্রতর ও পূর্ণতর করিবার জন্য গ্রন্থকার মহেশের প্রতিপালক গফুর এবং যে কসাই তাহাকে কাটিয়া বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে তাহার চামড়া ও মাংসের মূল্য নির্ধারণ করিয়া গফুরকে শিহরিত করিয়াছে তাহাদের পার্থক্যের বর্ণনারও সন্নিবেশ করিয়াছেন।

গফুরের মধ্যে ট্র্যাজেডির নায়কের লক্ষণ বর্তমান। সে প্রতিপদে পরাভূত হইয়াছে, যে মহেশকে সে প্রাণ দিয়া বাঁচাইতে চাহিয়াছে তাহার প্রাণ সে নিজেই লইয়াছে। কিন্তু এই শোষিত কৃষক কঠোর সহিষ্ণুতার সহিত সমস্ত দুর্বিপাক অত্যাচার সহ্য করিলেও নির্বিকার নহে। তাহার অর্ধ-উচ্চারিত বিদ্রোহ-বাক্যের মধ্য দিয়াই কৃষিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নিশ্চিত ধ্বংসের পূর্বাভাস ধ্বনিত হইয়াছে। সে গোহত্যা করিয়া হিন্দুশাস্ত্রমতে গোহত্যার প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাহার অকিঞ্চিৎকর সম্বল রাখিয়া গিয়াছে এবং নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে চাহিয়া আল্লার কাছে এই অভিসম্পাত জানাইয়া গিয়াছে, 'মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখে নি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর যেন কখনো মাপ করোনা।' এই কথা বলিয়া সে মেয়েকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গিয়াছে ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করিতে যেখানে 'ধর্ম থাকে না, মেয়েদের ইজ্জৎ-আব্রু থাকে না' বলিয়া সে পূর্বে কখনও যাইতে চায় নাই। তাহার কাহিনীর সঙ্গে সফোক্লিস-বর্ণিত রাজা ঈদিপাসের কাহিনীর কোন সাদৃশ্য নাই। তবু আমিনার সঙ্গে তাহার ফুলবেড়ের চটকলে যাত্রা থীবস্ নগরী হইতে মেয়ে

অ্যান্টিগোনের হাত ধরিয়া অন্ধ ঈদিপাসের নিক্রমণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অন্যভাবে দেখিলে, এই চটকল হইল ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতীক, যে ব্যবস্থায় ধর্ম থাকে না, মেয়েদের ইজ্জৎ-আব্রু থাকে না। শরৎচন্দ্র সেই বিভীষিকার বীভৎস চিত্র আঁকিয়াছেন 'শ্রীকান্ত'র তৃতীয় পর্বে—সতীশ ভরদ্বাজের মৃত্যুকালীন পরিবেশের বর্ণনার উপলক্ষে। এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে যে এই উভয় চিত্রই তিনি আঁকিয়াছেন প্রায় একই সময়ে—বিশের দশকের প্রথম দিকে। রবীন্দ্রনাথের দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গের ছেদ টানিব, কারণ তাহার মধ্যেই এই দুই কাহিনীর ব্যঞ্জনা বিধৃত হইয়াছে:

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।

৫

সতীত্ব সকল ধর্মেই ও সমাজেই স্ত্রীলোকের অবশ্য পালনীয় ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। যে সকল সমাজে বিবাহবিচ্ছেদ প্রথা আছে এবং বিধবা-বিবাহ প্রবর্তিত হইয়াছে সেইখানেও বিবাহিতা রমণী স্বামীর সঙ্গে থাকাকালে অন্যপুরুষে আসক্ত হইবে না ইহা শিরোধার্য করা হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে সতীত্ব লইয়া বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে। পুরুষের বহুবিবাহ অপ্রচলিত হইয়া আসিলেও হিন্দুসমাজ নারীর পদস্খলনকে ক্ষমা করে নাই। অথচ পদস্খলিতা নারীর অন্য সব রকম গুণ থাকিতে পারে; মনুষ্যত্বের দিক দিয়া শ্রীকান্তের নিরুদিদি হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশী বৈরাগীর বোন গৌরী সতী-সাধ্বী দিগম্বরী, ('বামুনের মেয়ে'র) রাসমণি, স্বর্ণমঞ্জরী প্রভৃতি অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এই সত্য বারংবার প্রকট হইয়া উঠিয়াছে যে, নারীত্ব আর সতীত্ব এক বস্তু নয়।

অবিমিশ্র সতীত্ব যে কত কৌতুককর হইতে পারে, স্বামীর পক্ষে কত বিড়ম্বনার কারণ হইতে পারে তাহার অপরূপ চিত্র আঁকা হইয়াছে 'সতী' গল্পে। সন্দিগ্ধস্বভাব স্বামীকে লইয়া ইউরোপীয় সাহিত্যে বহু কমেডি রচিত হইয়াছে। কিন্তু সন্দেহপরায়ণ সতী স্ত্রী যে সংসারজীবনকে কত বিষময় করিয়া তুলিতে পারে এই গল্পে শরৎচন্দ্র তাহার অতুলনীয় চিত্র আঁকিয়াছেন এবং এই জাতীয়

গল্প শরৎপ্রতিভার পক্ষে খুব মানানসই। ভক্ত বীরেন বা কন্যাদায়গ্রস্ত তারিণী মুখুয্যের মত দুই-একটি অপ্রধান চরিত্র কৌতুক রস সৃষ্টি করে, কিন্তু তাহারা অবান্তর না হইলেও কাহিনীর সঙ্গে তাহাদের সংযোগ নাই। প্রধান চরিত্র স্ত্রী নির্মলা এবং স্বামী হরিশ—ইহারা কেহই হাস্যাস্পদ নহে। নির্মলার সতীত্ব উগ্র এবং এই সতীত্বের দৃপ্ত তেজ ও কঠোর তপশ্চর্যা প্রখর সূর্যতাপের মত দহন করে, স্নিগ্ধ কৌতুকের সৃষ্টি করে না। কিন্তু ঘটনাপরম্পরা এমন নিখুঁতভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে যে, সমগ্র গল্পটি হাস্যরসে ভরপুর হইয়াছে। শুধু ঘটনাবিন্যাস বা চরিত্রচিত্রণ নয়; ইহার ভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ধ্বনি থাকায় ইহার কৌতুকময় ব্যঞ্জনা প্রগাঢ়তা লাভ করিয়াছে। রাম সীতাগতপ্রাণ, তিনি সীতা ছাড়া অন্য কোন রমণীর কথা চিন্তা করেন নাই; কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে সীতা দেবী বসুমতীকে দ্বিধাবিভক্ত হইতে প্রার্থনা করিয়াছেন। স্ত্রীর একনিষ্ঠ প্রেমে উৎপীড়িত হইয়া বেচারী হরিশ একাধিকবার কামনা করিয়াছে ধরণী দ্বিধা হইয়া তাহাকে আশ্রয় দিক। হরিশের বসন্ত হইলে নির্মলা শীতলার মন্দিরে সাতদিন হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিল; যাওয়ার আগে বলিয়া গিয়াছিল সে যদি সতী মায়ের সতী মেয়ে হইয়া থাকে, তাহা হইলে হরিশের জীবন রক্ষা পাইবে। হরিশ আরোগ্য লাভ করিল এবং নির্মলার সতীত্বের জয় বিঘোষিত হইল। এখানে ভ্রমরের একটি উক্তির ধ্বনি আছে। সে বলিয়াছিল যে, সে যদি কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করিয়া থাকে, তাহা হইলে গোবিন্দলাল আবার আসিবে, আবার তাহাকে ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল না করিয়া ভ্রমর প্রাণত্যাগ করে নাই। উপসংহারের ধ্বনিটি আরও ব্যঞ্জনাময়। বৈষ্ণবসাহিত্যে ও কিংবদন্তীতে প্রচলিত আছে যে, কংসবধের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরায় আসিতে হইয়াছিল। নির্মলার সতীত্বের নাগপাশে আবদ্ধ হরিশ বুঝিয়াছে যে, কংসটংস কিছু নয়; শ্রীরাধার 'একনিষ্ঠ প্রেম' হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই ব্রজনাথ বৃন্দাবন হইতে লুকাইয়াছিলেন এবং একশ বছর আর বৃন্দাবনে যান নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করিয়া 'ভুক্তভোগী' হরিশ তাহার ভাগ্যবিপর্যয়ে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিল। সাহিত্যে অ্যান্টি-ক্লাইমেক্স বা 'ভাবাবরোহ' অলংকারের এমন চাতুর্যময় প্রয়োগ ক্বচিৎ দেখা যায়।

চতুর্থ পর্ব

আদর্শের বিরোধ

১

শরৎচন্দ্র প্রথম জীবনে যে সকল গল্প উপন্যাস লিখিয়াছেন—যেমন 'অনুপমার প্রেম', 'আলো ও ছায়া', 'দেবদাস', 'বড়দিদি'—তাহাদের মধ্যেও কাহিনী ও চরিত্রসৃষ্টির মধ্য দিয়া কিছু কিছু সামাজিক প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন করার প্রবৃত্তি উগ্র প্রকটতা লাভ করিয়াছে 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে কিরণময়ীর চরিত্রচিত্রণে। এই উপন্যাসের শিরোনামায়ই বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। তবু সতীশ সরল, সাদাসিধা ধরনের লোক। সে যাহা করিয়াছে সহজ স্বাভাবিকভাবে করিয়া গিয়াছে, সমাজ ধর্ম বা নীতি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলে নাই।

এই গ্রন্থে সবচেয়ে বিতর্কিত চরিত্র কিরণময়ী; তাহার চরিত্রে ও ব্যবহারে সব কিছুই অনন্যসাধারণ, তর্কসংকুল। সে পরের আশ্রয়ে মানুষ হইয়াছে, কিন্তু তাহার রূপ হেলেনের রূপের মত, তাহা মুগ্ধও করে আবার দগ্ধও করে। তাহার বিবাহ হইল এমন জায়গায় যেখানে এই চোখধাঁধানো রূপ একেবারেই বেমানান। স্বামী হারাণবাবু গ্রন্থকীট; স্ত্রীর রূপ ও যৌবন তাঁহার মনে বিন্দু-মাত্র রেখাপাত করিল না। তিনি স্বল্পবিত্ত মানুষ; অন্ধকার গলির মধ্যে ততোধিক অন্ধকারাচ্ছন্ন, জীর্ণ স্যাঁতসেঁতে বাড়িতে তাঁহার বাস। তিনি স্ত্রীকে তাঁহার ছাত্রী করিয়া লইলেন, তাহাকে ভালবাসিবার কথা তাঁহার নিজের মনে কখনও জাগে নাই; স্ত্রীর ভালবাসার দাবী থাকিতে পারে তাহাও তিনি ভাবেন নাই। বাড়ির তৃতীয় বাসিন্দা কিরণময়ীর শাশুড়ী যিনি বধূকে খাটাইয়া এবং তাহার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াই খুশি থাকিতেন, তাহাকে স্নেহের দ্বারা, মমতার দ্বারা আপনার করিয়া লইতে কখনও চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু হারাণের ছাত্রী হওয়ায় কিরণময়ীর মনের একটা দিক বিকাশ লাভ করিয়াছে। সে স্বভাবতই খুব বুদ্ধিমতী; নানা বিষয় অধ্যয়ন করিয়া তাহার বুদ্ধি আরও তীক্ষ্ণতা লাভ করিয়াছে এবং বিদ্যা ও বুদ্ধি একে অপরকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। বিদ্যা ও বুদ্ধি কিন্তু হৃদয়ের বুভুক্ষা অর্থাৎ প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে প্রশমিত করিতে পারে নাই। রসহীন প্রীতিহীন পরিবেশে আবদ্ধ থাকার ফলে সমাজের

বিরুদ্ধে, ধর্ম ও নীতির বিরুদ্ধে তাহার মনে তীব্র বিতৃষ্ণা, বিদ্বেষ ও বিদ্রোহ সঞ্চারিত হইয়াছে। প্রথম পরিচয়েই দেখি, যে উপেন্দ্র তাহার মরণোন্মুখ স্বামীর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে ও তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে আসিয়াছে সে তাহার সঙ্গেই কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

এই কলহপরায়ণতা ও বাকপটুতার সঙ্গে যুক্ত হইয়া আছে ভোগাকাঙ্ক্ষা যাহা কোনকালেই তৃপ্ত হয় নাই বলিয়া এখন পাত্রাপাত্র বিচার করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন যে, রোহিণী যোগ্য পুরুষের অভাবে বিড়ালের উপর কটাক্ষ বর্ষণ করিয়া দেখিতেছিল সে শরবিদ্ধ হয় কিনা। কিরণময়ীও ঘৃণ্যচরিত্র অনঙ্গ ডাক্তারের সঙ্গে অনঙ্গরসে প্রবৃত্ত হইল—এ যেন নর্দমার জল দিয়া পিপাসা নিবারণ করিবার চেষ্টা। ইহার পরেই বিদ্বান, চরিত্রবান, সুরুচিসম্পন্ন, সব দিক দিয়া লোভনীয় পুরুষ উপেন্দ্রকে দেখিয়া সে মুগ্ধ হইল এবং ঘৃণ্য অনঙ্গ ডাক্তারকে বিতাড়িত করিল। উপেন্দ্র যে বিবাহিত এবং সেই হিসাবে উপেন্দ্রের সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হওয়া যে দ্বিবিধ পাপ—এই প্রশ্ন তাহার মনে জাগিল না। কিন্তু উপেন্দ্র ও তাহার স্ত্রী সুরবালার সুখী দাম্পত্যজীবনের প্রতি তাহার ঈর্ষা জন্মিল এবং সে এই প্রথম ও শেষবারের মত স্বামীর প্রতি অনুরক্ত হইল। তাহার স্বামী তাহাকে সেই সুযোগ দিলেন না, তিনি অচিরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। উপেন্দ্র তাহার কনিষ্ঠ (মামাত) ভ্রাতা দিবাকরকে কিরণময়ীর আশ্রয়ে রাখিয়া গেল। এই দিবাকর অপরিণত যুবক, কলেজের ছাত্র, কিরণময়ীর কনিষ্ঠ সহোদরের মত। কিন্তু খানিকটা অজ্ঞাতসারেই কিরণময়ী ইহার সঙ্গেও যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিতে লাগিল তাহা পাপের পর্যায়ে না পড়িলেও সুরুচির সীমা যে লঙ্ঘন করিতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে রমণী কোন দিন নীতিকে মানে ন্াই সে এই রুচির প্রশ্নকেও এড়াইয়া গিয়াছে। এই ঘনিষ্ঠতার বিবরণ একটু অতিরঞ্জিত হইয়াই উপেন্দ্রের কাছে পহুঁছিলে সে তাহাকে তিরস্কার করিল। এই তিরস্কার, কিরণের মতে অসঙ্গত; স্বভাবতঃই ইহা তাহার মনে প্রতিহিংসাবৃত্তি জাগ্রত করিল এবং মুহূর্তের মধ্যে মন স্থির করিয়া উপেন্দ্রকে জব্দ করিবার জন্যই সে দিবাকরকে ফুস্‌লাইয়া লইয়া গিয়া আরাকান পাড়ি দিল। এই ভাবে দিবাকরকে প্রলুব্ধ করিয়া সে এই যুবকের হৃদয়ে যে কামনার আগুন জ্বালাইয়া দিল তাহার বিভীষিকা হইতে সে পথ খুঁজিতে গিয়া বিমূঢ়, বিভ্রান্ত হইল। নীতিহীন বুদ্ধির এই পরিণাম।

হৃদয়ের উদ্দাম কিন্তু অসঙ্গত প্রবৃত্তির সমর্থনে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোরমা বলিয়াছিল যে ইহা অনিবার্য ; ইহাকে প্রতিরোধ করিতে যাওয়া বাতুলতা। কিন্তু যে প্রশ্ন মনোরমা তুলিয়াছিল, গ্রন্থকার মনোরমাকেই কেশবের কন্যা হৈমবতী এবং পশুপতির হারানো স্ত্রীরূপে পরিচিত করাইয়া সেই নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নকে এড়াইয়া গিয়াছেন। কিরণময়ীর যুক্তি ও কর্মপদ্ধতি অন্যরকমের, কিন্তু সেও মৌলিক প্রশ্নকে এড়াইয়া গিয়া তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। সে প্রবৃত্তিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, যেন জড় পদার্থের মতই তাহা সুনীতি-দুর্নীতির এক্তিয়ারের বাহিরে। তাহার নিজের কথাই উদ্ধৃত করা যাইতে পারে : 'মানুষের প্রবৃত্তি জিনিসটা যুক্তি নয় ···। যাকে ঘৃণিত [প্রেম] বলচ, সেটা আসলে সুবুদ্ধির অভাব। অর্থাৎ যাকে ভালবাসা উচিত ছিল না, তাকেই ভালবাসা। অসাবধানে গাছ থেকে পড়ে হাত-পা ভাঙ্গার অপরাধ মাধ্যাকর্ষণের উপরে চাপান, আর প্রেমকে কুৎসিত ঘৃণিত বলা সমান কথা।......তাৎপর্য না বুঝতে পেরেই হতবুদ্ধি বিজ্ঞের দল একে ঘৃণিত বলে, বীভৎস বলে সান্ত্বনা লাভ করে। কিন্তু····· এত বড় আকর্ষণ কোন মতেই অমন হেয়, অমন ছোট হতে পারে না।·····কোন প্রেমই কোন ঘৃণার বস্তু হতে পারে না।'

শরৎচন্দ্র এখানে মনস্তত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া কাহিনী ও চরিত্র হইতে প্রশ্ন-প্রধান উপন্যাসে পদার্পণ করিয়াছেন, যদিও সত্যকার শিল্পীর মতই তিনি কাহিনী ও চরিত্রের মধ্য দিয়াই নৈতিক প্রশ্নকে জীবন্ত করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্লেষণ ও বিচার সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক ; একটি প্রায়-অবিশ্বাস্য কাহিনী সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্ভাব্য ও অনিবার্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিদ্রোহিণী কিরণময়ী স্বামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিয়াছে যে তিনি তাহার যৌবনের কোন মর্যাদা দেন নাই ; কিন্তু সেও তো ভালবাসার দ্বারা, সেবার দ্বারা, সহানুভূতির দ্বারা স্বামীর হৃদয়কে স্পন্দিত করিতে পারে নাই অথবা সেই চেষ্টা কখনও করিয়াছে এমন কথা সে নিজেও দাবী করে নাই। তাহার নিজের ভাষা উদ্ধার করিয়া বলিতে পারি, তাহার দেহের প্রতি রক্তকণায় উৎকৃষ্টতর পরিণতির জন্য যে বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা এত বিপথগামী যে সে অনঙ্গ ডাক্তারের প্রতি প্রধাবিত হইয়াছে এবং ইহার পর সুখী বিবাহিত পরিবারকে ভাঙ্গিয়া স্বামী ও স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উপেন্দ্রকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। আবার সেই প্রেমাস্পদের স্ত্রীর প্রেম দেখিয়া সে নিজের স্বামীকে

ভালবাসিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু ইহার পূর্বে সে এই চেষ্টা করে নাই। তাহার ভাষায়ই বলা যায় যেন মাধ্যাকর্ষণশক্তি অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়ম হঠাৎ থামিয়া গিয়াছিল। ইহার পর প্রেমাস্পদ উপেন্দ্রের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া সে ঝোঁকের মাথায় উপেন্দ্রের বিরুদ্ধে উৎকট প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে গিয়া উদ্ভট আচরণ করিয়াছে এবং ইহার শিকার হইয়াছে অসহায় যুবক দিবাকর। আরাকান যাত্রার পথেই দেখা যায় যেন এই 'বিপ্লবের তাণ্ডব' তাহাকেও বিভ্রান্ত করিতে শুরু করিয়াছে এবং আরাকানে তাহার যে চিত্র পাই তাহাতে দেখি সে বিধ্বস্ত, বিমূঢ়—নিজের বিষের প্রতিক্রিয়ায় নিজেই জর্জরিত। ইহার পর সে যে উন্মাদগ্রস্ত হইবে এবং সেই মতিচ্ছন্নতার অবসাদ হইতে উপেন্দ্রের মৃত্যুতে পর্যন্ত উদাসীন থাকিবে ইহা স্বাভাবিক ও সঙ্গত। মেটারলিঙ্ক Justice বা ন্যায়-বিচারের রহস্য বিশ্লেষণ করিতে করিতে যাইয়া এই সিদ্ধান্তে পহুঁছিয়াছেন যে ইহার বীজ নিহিত রহিয়াছে আমাদের অন্তরাত্মার মধ্যেই। এই সিদ্ধান্ত কিরণময়ীর সম্পর্কে সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। যে 'উৎকৃষ্টতর পরিণতি'র আকাঙ্ক্ষার সে জয়গান করিয়াছে তাহাই তাহাকে অধঃপাতের গভীরতম পঙ্কে নিমজ্জিত করিয়াছে।

এই পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের যে সকল উপন্যাস আলোচনা করা হইয়াছে, সমাজ ও ধর্মের অনুশাসন কেমন করিয়া নরনারীর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত, উৎপীড়িত করে ইহাদের মধ্যে তাহাই প্রাধান্য পাইয়াছে। কিন্তু কিরণময়ীর কাহিনীর বিষয় এবং প্রকাশভঙ্গি একটু পৃথক্। শুধু যে মনস্তত্ত্বকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে তাহাই নহে, ব্যক্তির কাহিনী ও চরিত্র হইতে কতকগুলি নৈতিক, দার্শনিক প্রশ্ন স্বতন্ত্র হইয়া পাঠকের চিত্তকে স্পন্দিত করিয়াছে। এই প্রশ্নগুলি কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে; তবু মনে হয় ইহারাই যেন কাহিনী ও চরিত্রকে প্রাণদান করিয়াছে। কিরণময়ী বলিয়াছে, কুবুদ্ধি ও সুবুদ্ধি বলিয়া দুইটি সূত্র থাকিতে পারে, কিন্তু কুপ্রবৃত্তি বা সুপ্রবৃত্তি বলিয়া কোন ভেদরেখা টানা যাইতে পারা যায় না। এই দাবী কি সত্য? বুদ্ধি যদি প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত না করে, তবে সে তো প্রবৃত্তির দাস হইয়া কিরণময়ীর মত প্রখর বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাবতী রমণীকে অধঃপাতের পথে চালিত করিবে। আবার বুদ্ধির অচল কর্তৃত্ব মানিলে মানুষের জীবন শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হইবে। এই সকল প্রশ্নকে উপজীব্য করিয়াই শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী', 'শেষ প্রশ্ন' ও 'বিপ্রদাস' উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।

২

কিরণময়ী যে প্রশ্ন তুলিয়াছে তাহার উত্তর দিয়াছেন 'পথের দাবী'র নায়ক সব্যসাচী বা ডাক্তার। তাঁহার উত্তরই এই প্রশ্নের শেষ মীমাংসা এমন কথা বলিব না। তবে তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি কর্মবীর; তাঁহার উত্তরও কর্মবীরের যোগ্য। তিনি মনে করেন, হৃদয়াবেগ শ্লাঘ্য, কিন্তু সে যখন চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে, তখন মানুষের সে সবচেয়ে বড় শত্রু। শশী উন্মাদ, শশী কবি, শশী মাতাল। সে নবতারাকে খুব ভালবাসিত, কিন্তু শশী যখন বিবাহের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়াছে তখন দেখা গেল নবতারা অন্য একটি ছেলেকে বিবাহ করিয়াছে। শশী এত পাগল যে এই মর্মান্তিক বিশ্বাসঘাতকতায় সে কতটা অভিভূত হইল তাহার ঠিক পরিমাপ করা যায় না। ডাক্তার এই আশাভঙ্গকে অনেকটা কৌতুকের সহিত গ্রহণ করিলেন। ইহার কারণ কোন অনুভূতি বা কোন পরাজয়ই এই মাতাল অধোন্মাদ কবির হৃদয়ে দাগ কাটিতে পারিবে না। সংসারে শশী ব্যতিক্রম; তাহাকে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা যায় না। অপূর্ব ও ভারতী পরস্পরের প্রতি আসক্ত। উভয়েই 'পথের দাবী'র সভ্য, ভারতী তো উহার সেক্রেটারী। কিন্তু অনেকটা অপূর্বর পুলিসের কাছে স্বীকারোক্তির ফলেই এই গুপ্ত সমিতির সংবাদ ফাঁস হইয়া গেল এবং ডাক্তারই যে বিপ্লবী নায়ক সব্যসাচী ইহাও প্রকাশিত হইয়া গেল। এই-রূপ বিশ্বাসঘাতকতার চরম শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এবং 'পথের দাবী'র গোপন সভায় সেই দণ্ডই অপূর্বকে দেওয়া হইল। কিন্তু সর্বাধিনায়ক সব্যসাচী veto দেওয়ায় অপূর্ব রক্ষা পাইল এবং এইভাবে তিনি ভারতী ও অপূর্বর মিলনের পথ সুগম করিয়া দিলেন। এইখানে তিনি হৃদয়াবেগকে প্রশ্রয় দিলেন, কারণ তিনি দেখিয়াছেন নবাগত অপূর্ব 'পথের দাবী'র সভ্য হওয়ার অযোগ্য এবং ভারতীর প্রতি তাঁহার খুব স্নেহ থাকিলেও তিনি ইহাও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সশস্ত্র বিপ্লবের মত ও পথ তাহার মজ্জাগত শিক্ষাদীক্ষার পরিপন্থী। সুতরাং তিনি ইহাদের হৃদয়াবেগকে তুচ্ছ করিলেন না।

'পথের দাবী'র প্রেসিডেণ্ট সুমিত্রার প্রশ্ন স্বতন্ত্র। সে ডাক্তারের কাছে কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাঁহার জন্য তাহার একুশ বছরের সংস্কার মুছিয়া ফেলিয়া তাঁহার কর্মসঙ্গিনী হইতে চাহিয়াছে। কিন্তু ডাক্তার জানেন এই পরমাশ্চর্য মহিলা যতই বিশ্বস্ত ও দক্ষ হউক না কেন সেও হৃদয়াবেগের দ্বারাই প্রণোদিত হইয়াছে। সশস্ত্র বিপ্লবীর পক্ষে এইরূপ কমরেড শেষ

পর্যন্ত বোঝা হইয়া দাঁড়াইবে। তাহাকে বর্মায় খানিকটা কাজের ভার দিয়াছিলেন, পরেও হয়ত দিতে পারেন, নাও পারেন এবং জীবনে তাহার সঙ্গে আর দেখা নাও হইতে পারে, কিন্তু কোন অবস্থায়ই এই রমণীর হৃদয়াবেগের প্রতিদান দেওয়ার মত অবকাশ তাঁহার হইবে না। সুতরাং সুমিত্রার হৃদয়াবেগের মর্যাদা তিনি দিতে পারেন নাই। সুমিত্রা প্রথমে ছিল আফিঙের চোরাই ব্যবসায়ের কর্মী। তারপর সেই জীবন নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিয়া ডাক্তারের অনুগামিনী হইয়াছিল, কিন্তু ডাক্তার তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া তাঁহার স্থির লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া হীরা সিংকে সঙ্গে করিয়া অনিশ্চিত পথে বাহির হইয়া গেলেন।

সেই অনিশ্চিত পথে একটা নিশ্চিত কাজ আছে এইখানে তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিপ্লবের পথের কয়েকজন পথিকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইয়াছে—পূর্বোল্লিখিত হীরা সিং, স্বল্পভাষী কৃষ্ণ আইয়ার, সাহসী সহিষ্ণু তলওয়ারকর আর ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ ব্রজেন্দ্র। ব্রজেন্দ্র তাঁহার দলের কর্মী, সেই হিসাবে তাঁহার অনুচর, আবার এক দিক দিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী। সে সুমিত্রার প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ী এবং সেইখানে ডাক্তারের প্রতি সুমিত্রার অনুরক্তি তাহার পথের কাঁটা। এইজন্য সে একাধিকবার ডাক্তারের শত্রুতা সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এক্ষেত্রে হৃদয়াবেগ তাহার চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করিয়াছে এবং ব্যর্থ প্রণয়ের জ্বালায় সে বিপ্লবকে পর্যন্ত ব্যর্থ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। ডাক্তারের বিরুদ্ধে পূর্বে সে যে 'অ্যাটেম্‌ট' একাধিকবার করিয়াছে, তাহাকে ডাক্তার অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অপূর্বর স্বীকারোক্তির পরেও হয়ত ভাঙা 'পথের দাবী'কে গড়া যাইত, কিন্তু আহত অবস্থায় তলওয়ারকর ধরা পড়ার পর ডাক্তার অন্য প্রশ্ন না তুলিয়া সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ব্রজেন্দ্র কোথায়? তারপর সংবাদ আসিয়াছে ডাক্তারের প্রস্তাবিত কর্মক্ষেত্র চীনদেশেও সরকার সব তচনচ করিয়া দিয়াছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ব্রজেন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই এই বিপর্যয় সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং ইহাও বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, ব্রজেন্দ্র যেখানেই আত্মগোপন করুক, যাহার চৈতন্য এইভাবে হৃদয়াবেগের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে, ডাক্তার জীবিত থাকিলে তাহার নিস্তার নাই।

'পথের দাবী' বিপ্লবাত্মক উপন্যাস এবং ইহার প্রধান চরিত্র বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবপ্রচেষ্টার মহানায়ক ডাক্তার ওরফে সব্যসাচী। কিন্তু এই গ্রন্থের রচনাভঙ্গি একটু খাপছাড়া ধরনের। বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ কাহিনীতে প্রাধান্য পায় নাই; তাহার প্রত্যক্ষ বর্ণনা

প্রায় অনুপস্থিত। প্রথমদিকে সব্যসাচীর গিরিশ মহাপাত্ররূপে পুলিসের চোখে ধূলি দিয়া ব্রহ্মদেশে প্রবেশ এবং উপসংহারে হীরা সিংকে সঙ্গে করিয়া প্রবল দুর্যোগের দিনে ব্রহ্মদেশ হইতে অন্তর্ধান। ইহা ছাড়া ডাক্তারের নিজের কাজের প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই বলিলেই চলে। প্লটের পুরোভাগে রহিয়াছে অপূর্ব-ভারতীর অনুকাহিনী আর শশী-নবতারার বিবাহের ট্র্যাজি-কমেডি। অথচ ডাক্তার সব জায়গায়ই আছেন এবং শশীর ভাষায়ই বলা যাইতে পারে যে, ডাক্তার না থাকিলে সবই যেন ফাঁকা, শূন্য বলিয়া মনে হয়। এইভাবেই বিপ্লবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সংস্কৃত আলংকারিকেরা শব্দের অভিধা বা প্রাথমিক অর্থ ও তদ্দ্বারা আক্ষিপ্ত দ্বিতীয়প্রতীয়মান অর্থ বা ব্যঞ্জনার মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন। এই পার্থক্য অর্থাৎ একের মাধ্যমে অপরের দ্যোতনা কাহিনী সম্পর্কেও প্রযোজ্য। একটু আগেই ভারতী, সুমিত্রা ও ব্রজেন্দ্রের যে তিনটি অনুকাহিনীর কথা বলা হইয়াছে তাহাদের দ্বারা বিপ্লবীর জীবনদর্শন, একনিষ্ঠতা, হৃদয়-বৃত্তি সম্পর্কে উপলব্ধি ও ঔদাসীন্য, বিপ্লবের আদর্শ ও প্রয়োজনের কাছে অন্য সকল প্রকার আবেদন ও যুক্তিকে অবলীলাক্রমে অগ্রাহ্য করার শক্তি প্রকটিত হইয়াছে।

গ্রন্থের শিরোনামা এবং 'পথের দাবী' সমিতির কার্যকলাপের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাও এইভাবেই তাৎপর্যময় হইয়া উঠে। ডাক্তার প্রথম দিকে 'পথের দাবী'র সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্বীকার করিতেই চাহেন নাই। তিনি মনে করেন যে, ইহা মেয়েদের একটা প্রতিষ্ঠান; ইহারা যে সব সংস্কারমূলক কাজ করে তাহা তিনি ভাল বোঝেন না এবং তাহা তাঁহার কর্মধারার সঙ্গে যুক্তও নহে। আমরা দেখিতে পাই, সমিতির সভ্যরা স্কুল করিয়া শিক্ষা দান করে এবং শ্রমিকদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন করিতে চায় অর্থাৎ যাহাকে আমরা ট্রেড য়ুনিয়ন আন্দোলন বলি তাহাই তাহাদের প্রধান রাজনৈতিক কার্য। ডাক্তার ইহার সঙ্গে যুক্ত নহেন। অথচ পরে তিনি 'পথের দাবী'কে তাঁহারই সৃষ্টি বলিয়া দাবী করিয়াছেন এবং কৃষ্ণ আইয়ার, সুমিত্রা, এমন কি ব্রজেন্দ্র পর্যন্ত তাঁহারই নির্দিষ্ট কাজ করিতে রেঙ্গুনে হাজির হইয়াছে। এই সকল সংগঠনমূলক কাজ সহকর্মীদের উপর ন্যস্ত এবং ইহার সঙ্গে তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগ নাই। কিন্তু এখানেও অন্তরীক্ষ হইতে তাঁহার সজাগ দৃষ্টি ক্রিয়াশীল—ইহার মধ্য দিয়া তাঁহার আদর্শ ও কর্মধারা স্পষ্ট হইয়া উঠে। তাঁহার উদ্দেশ্য—জীবনের পথে চলিতে মানুষকে যেন পদে পদে

ব্যাহত হইতে না হয়, সে যেন স্বাধীন স্বচ্ছন্দ গতিতে আপনার পথে অগ্রসর হইতে পারে। ইহাই পথের দাবী। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ এই দাবীরই কণ্ঠরোধ করিয়াছে, সুতরাং সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা এই সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করিতে হইবে। একমাত্র রাজনৈতিক বিপ্লবই মানুষকে পথের দাবী আদায় করিতে সক্ষম করিবে। কাজেই নবতারা বা ভারতীর সামাজিক স্বাধীনতা বা শ্রমিকের স্বীয় প্রাপ্য আদায় করা—ইহা রাজনৈতিক বিপ্লবের চরম লক্ষ্য ; আবার যেদিন রাজনৈতিক বিপ্লব আসিবে সেইদিন ইহারাই—কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, গৃহস্থ, গৃহিণী—তাহার প্রথম বলি হইবে, ইহাদের রক্তস্রোতের মধ্য দিয়াই রাজনৈতিক বিপ্লব সফল হইবে এবং এই সব সমিতির আড়ালেই রাজনৈতিক গুপ্ত সমিতি তাহার আপন কাজ করিয়া যাইবে। এই জন্যই রাজনৈতিক বিপ্লব নির্মম ; ইহার নায়ক শ্রমিকের রক্তগঙ্গার পরোয়া করেন না, আর তলওয়ার-করের মত একান্ত অনুগত, একনিষ্ঠ কর্মীর মৃত্যু হইলে তাহার অসহায় বিধবা পত্নী শিশু সন্তানের দিকেও ফিরিয়া চাহেন না। ইহার আহার নাই, বিশ্রাম নাই, সর্বোপরি নৈরাশ্য নাই। ইহার সবচেয়ে শান্তিময় আশ্রয় এবং সেখানকার আহার্যের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা একেবারে প্রত্যক্ষ, সেখানে ব্যঞ্জনা বা সাংকেতিকতার অবকাশ নাই। বারবার দল ভাঙ্গিবার পর আবার সিঙ্গাপুরে যাইয়া সেই ছিন্ন সূত্রের যোজনা করিতেই প্রলয়ংকর দুর্যোগের মধ্যে এক হীরা সিংকে সঙ্গে লইয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। এই বর্ণনার প্রত্যক্ষতা ও রূপক ব্যঞ্জনা উভয়ই স্মরণীয়। এইরূপ ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়াই বিপ্লবী নায়ক সহস্র বিপদ উপেক্ষা করিয়া অনিশ্চিত পথে নিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। সেই নিশ্চিত লক্ষ্য হইল সমাজের আমূল পরিবর্তন যাহা রাজনৈতিক স্বাধীনতার দ্বারাই লভ্য।

ডাক্তারের বিপ্লবী কর্মের বিবরণ উপন্যাসে নাই। কারণ এই উপন্যাসে প্লট ও চরিত্রচিত্রণ থাকিলেও ইহা আইডিয়া-প্রধান উপন্যাস এবং ইহার প্রকাশের মাধ্যম ব্যঞ্জনা। ডাক্তারের কর্মের সময়সীমা ও বিস্তৃত পরিধি কতকগুলি উল্লেখের দ্বারা আভাসিত হইয়াছে। তিনি উনিশ শতকের প্রথম দিকে ভারতের পূর্ব দিকে বর্মা, সিঙ্গাপুর, সুমাত্রা, জাভা, জাপান প্রভৃতি দেশে এবং উত্তরে চীনে ও দক্ষিণে সিংহলে গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন এবং সর্বত্র সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থন করিতেন। তাঁহার চরম লক্ষ্য ছিল এই সব বিপ্লবী সংগঠনের সাহায্যে ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য ধ্বংস করা। ভারতের বাহিরে এই

সকল সংগঠন-কার্যে লিপ্ত হওয়ার একটি কারণ তিনি বলিয়াছেন যে এই সকল দেশে মেয়েরা অনেকটা স্বাধীন। এই কারণটি খুব স্পষ্ট নয়; হয়ত মেয়েরা সঙ্গে থাকিলে গুপ্ত সমিতির কাজকর্ম গোপন রাখা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। তবে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করার মত। খুব সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিলে সব্যসাচীর মত নামজাদা বিপ্লবী এই সব দেশে অনেকটা অবাধে চলাফেরা করিতে পারেন। আর বাহির হইতে বিদেশী শক্তির সাহায্যে ইংরেজ শক্তিকে যে আঘাত করা যায় পরবর্তী ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিয়াছে। দেশের সঙ্গেও যে তাঁহার যোগাযোগ ছিল তাহারও বহু ইঙ্গিত গ্রন্থমধ্যে ছড়াইয়া আছে। তাঁহার প্রতিপক্ষের প্রতিনিধি অপূর্বর নিমাই কাকার আনাগোনা ইহার অন্যতম প্রমাণ। তাঁহার অধিকাংশ ঘনিষ্ঠ কর্মীই ভারতীয়—আহমদ তুরাণী, ফয়জাবাদের মথুরা দুবে, মাদ্রাজি কৃষ্ণ আইয়ার, মারাঠি নীলকান্ত যোশী ও রামদাস তলওয়ারকর আর ব্রজেন্দ্র—তাহাকে আরাকানি মগ মনে হইলেও তাহার ভাষা হইতে প্রতীয়মান হয় যে সে চট্টগ্রামী বাঙ্গালী। ভারতবর্ষের মধ্যে তিনি যে একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছিলেন তাহারও উল্লেখ আছে —ভারতবর্ষীয় সিপাহীদিগকে ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া বিপ্লবের কাজে নিযুক্ত করা। এই চেষ্টা মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু করিয়াছিলেন, তিনি জাপানে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীর সাহায্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বা বাঘা যতীনও করিয়াছিলেন। নানা প্রদেশ ঘুরিয়া বিপ্লবী সংগঠন গড়িয়া তোলা, দল ভাঙিয়া গেলে তাহা পুনরুজ্জীবিত করা, নৈরাশ্যের মধ্যেও অকুতোভয়ে রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়িয়া যাওয়া—সব্যসাচীর চরিত্রের এই সকল লক্ষণ ব্যাঘ্রহন্তা যতীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং গিরিশ মহাপাত্রের বেশে তাঁহার নিষ্ক্রমণের সঙ্গে My Brother's Face গ্রন্থে যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের হাওড়া স্টেশনে পুলিসকে ফাঁকি দেওয়ার বর্ণনার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে—এইসব দিক বিচার করিলে এই গ্রন্থকে ঐতিহাসিক উপন্যাসও বলা যাইতে পারে।

রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশ সত্ত্বেও এবং সব্যসাচীর চরিত্রমাহাত্ম্য মানিয়া লইলেও 'পথের দাবী' উপন্যাসে পথের দাবী আইডিয়াটাই বড় কথা; যেমন 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সত্যানন্দ অপেক্ষা আনন্দমঠ-সংগঠন এবং বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত অনেক বড়। এই পথেই বিপ্লব বহু পরাজয়ের

মধ্য দিয়া বহু শহীদের রক্তে রঙীন হইয়া স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়াছে।

তবু প্রশ্ন জাগে, এই পথই কি একমাত্র পথ, মানুষের জানার ও সন্ধানের পরিণতি কি এই যে, সে চরম অশান্তি ও অকল্যাণের মধ্য দিয়া কল্যাণকে খুঁজিয়া পাইবে? ডাক্তার বলিয়াছেন, সত্য স্থাণু পদার্থ নয়, তাহাও মানুষই সৃষ্টি করে এবং তিনিও প্রয়োজনমত, পরিবর্তমান অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নূতন সত্য সৃষ্টি করেন। যদি তাই হয়, তাহা হইলে তাঁহার সহিংস, নির্মম, রক্তাক্ত পথই যে একমাত্র পথ তাহাই বা কেমন করিয়া মানিয়া লওয়া যায়? গ্রন্থকার এই বিপরীত মতের আবেগময় অভিব্যক্তি দিয়াছেন ডাক্তারের একান্ত ভক্তিমতী শিষ্যা ভারতীর মাধ্যমে, যে ভারতী অপূর্বকে বলিয়াছিল, 'তিনি (ডাক্তার) চলে গেলে মনে হয় পথের ধুলোয় পড়ে থাকি, তিনি বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যান। মনে হয় তবুও আশা মেটে না, অপূর্ববাবু।' আমাদের মনে হয়, যে আকর্ষণ ডাক্তারকে ভারতীর দিকে টানিয়া আনিয়াছে, তাহা ভক্তি নয়, ইহাদের মতের মৌলিক বিরোধিতা। খ্রীষ্টানদের ইতিহাসে মারামারি কাটা-কাটির দৃষ্টান্তের অভাব নাই, তবু খ্রীষ্টধর্মের মূল কথা, শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি মমত্ববোধ। ভারতী বিদেশে খ্রীষ্টান পাদরীদের সাহচর্যে মানুষ হইয়াছে। প্রীতি ও পরোপচিকীর্ষার দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই সে 'পথের দাবী' নামক কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করিয়াছে, যে প্রতিষ্ঠানের সভানেত্রী এক অসামান্যা রমণী সুমিত্রা। কিন্তু অতি অল্পদিনের মধ্যে সে 'পথের দাবী'র যে দিকটার সঙ্গে পরিচিত হইল তাহা তাহার মনে বিভীষিকারই সৃষ্টি করিল। অপূর্ব তাহার প্রেমাস্পদ; সে দুর্বলচিত্ত বলিয়াই পুলিসের কাছে স্বীকারোক্তি করিয়াছে। এইজন্য সে হয়ত শাস্তি পাইতে পারে; কিন্তু যে ভাবে ভুলাইয়া অপূর্বকে 'পথের দাবী'র গুপ্ত সভায় আনা হইল এবং যে ভাবে বিনা দ্বিধায় অবলীলাক্রমে অপূর্বর বন্ধু তলওয়ারকর, এবং 'পথের দাবী'র প্রেসিডেণ্ট, ভারতীর বান্ধবী, এই কঠোর শাস্তিবিধান করিল তাহার নির্মমতায় ভারতী অভিভূত হইল এবং ব্রজেন্দ্রের ব্যবহার তাহার মনে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করিল। 'পথের দাবী' উপন্যাস, প্রবন্ধ-পুস্তক বা সংবাদপত্র নহে। সুতরাং বিভিন্ন মতের যে দ্বন্দ্ব ইহার অন্যতম বিষয়, তাহা কাহিনী ও চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে। তারপর ডাক্তার যেরূপ অনাসক্তভাবে নীলকান্ত যোশী প্রভৃতি অনুরক্ত শিষ্যদের মৃত্যুর কথা বলিয়াছেন, শ্রমিকদের রক্ত দিয়া

বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করার রূপরেখা আঁকিয়াছেন, ঘোর রাত্রিতে সুমিত্রাকে যাহারা অপহরণ করিতে আসিয়াছিল তাহাদের পরিণতির বর্ণনা দিয়াছেন, বা ব্রজেন্দ্রের গতিবিধির অনুসন্ধান করিয়াছন তাহাই ভারতীর প্রতিবাদকে মুখর ও সজীব করিয়াছে। মনে হয় এই একাগ্র, একনিষ্ঠ, অমিততেজা, দৃঢ়-সংকল্প বিপ্লবীও ভারতীর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর খুঁজিয়া পাইতেছেন না এবং এই পরস্পরবিরোধী মতবাদের সংঘর্ষ শুধু এই উপন্যাসকেই মৌলিকতা দান করে নাই, হিংসাত্মক বিপ্লবের নৈতিকতা বনাম অহিংস আন্দোলনের কার্যকারিতার সংঘাতকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে।

৩

'শেষ প্রশ্ন' শরৎচন্দ্রের অন্তিম পর্বের রচনা। ইহা যে তাঁহার অন্যান্য উপন্যাস হইতে পৃথক্ সেই সম্পর্কে তিনি নিজেও সচেতন ছিলেন এবং ইহার নামকরণ হইতেই বোঝা যায় যে, এই উপন্যাসের প্রধান বস্তু কাহিনী বা চরিত্র নয়, জীবন সম্পর্কে একটি মৌলিক, চরম প্রশ্ন। এই উপন্যাসের সার্থকতা লইয়া বহু বাদানুবাদ হইয়াছে; কেহ কেহ বলিয়াছেন ইহা যুগান্তকারী সৃষ্টি, আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন যে ইহা উপন্যাসই নয়। দুইজন মনীষীর পরস্পর-বিরোধী উক্তি উদ্ধৃত করিলেই এই মতপার্থক্যের তীব্রতা স্পষ্ট হইবে। বহুশ্রুত বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় বলিয়াছেন, 'Personally I would place "Sesh Prasna" above Gitanjali ···, "Sesh Prasna" is really a landmark in Indian Renaissance.' অপর দিকে বিদগ্ধ সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন, 'কমলের জন্ম যেন সোভিয়েট রুশদেশে ·····ইহার যেন কোথাও কোন নাড়ীর সম্পর্ক নাই, ছোট বড় কোন টানই ইহাকে বেদনায় ব্যথিত করে না·····। ·····কমল একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য মতবাদের সুস্পষ্ট ও জোরাল অভিব্যক্তি মাত্র, জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ নহে; একটা ইঞ্জিনের বাঁশি, হৃদয়-স্পন্দন নহে।'

প্রথমেই বলা দরকার শরৎচন্দ্র কমলের জন্মের খুব স্পষ্ট বর্ণনা দিয়াছেন। তাহার পিতা ইংরেজ এবং মা বাঙালী বিধবা। মায়ের পূর্বেও একটা বদনাম ছিল এবং কমল তাহার জারজ সন্তান। কেহ কেহ মনে করেন এইরূপ পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র প্রভাব আছে। গোরা পুরোপুরি সাহেব;

তাহার পিতা ও মাতা উভয়েই ইউরোপীয়। মাতা জন্ম দিয়াই প্রাণত্যাগ করে বলিয়া আনন্দময়ী তাহাকে প্রতিপালন করেন এবং সে আনন্দময়ীকেই মা বলিয়া জানে। তাহার উগ্র হিন্দুয়ানী এবং ধর্মভিত্তিক স্বাদেশিকতার সঙ্গে তাহার জন্মের কোন সম্পর্ক নাই। বরং কাহিনীর উপান্তে আসার আগে সে এই জন্মবৃত্তান্ত জানিতেই পারে নাই। ইহা জানিবার পর আনন্দময়ীর পালিত পুত্র গোরা পরেশবাবুর পালিতা কন্যা সুচরিতার সঙ্গে সহজেই মিলিত হইতে পারিয়াছে। এইভাবে গোরার সাম্প্রদায়িক আচার-নিষ্ঠা বৃহত্তর ধর্মবোধে উত্তরণ করিয়াছে এবং তাহার সংকীর্ণ স্বদেশপ্রীতি বিশ্বপ্রেমের অঙ্গীভূত হইয়াছে। এই উপন্যাসকে ঠিক আইডিয়া-ভিত্তিক, যুক্তিপ্রধান উপন্যাস বলা যায় কিনা সন্দেহ। গ্রন্থমধ্যে যে সকল যুক্তিতর্ক আছে গ্রন্থের উপসংহার তাহাদের অলীকতাই প্রমাণ করে। এই কারণে ইহাকে তর্কপ্রধান, সমস্যামূলক উপন্যাস বলিতে দ্বিধা হয়। গোরার তর্কের রীতিও এই সংশয়ের সমর্থন করে; তাহার যুক্তি উপমাবহুল এবং অলংকার-ভিত্তিক; ইহা শুধু তাহার আবেগদৃপ্ত চরিত্রেরই সাক্ষ্য দেয়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে যুক্তিতর্ক জায়গা জুড়িয়াছে না জায়গা পাইয়াছে তাহার বিচার করিতে হইবে। ইহার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন দাবী আছে তাহাও অবান্তর। গোরা যদি মহিমের মত কৃষ্ণদয়ালের ঔরসজাত এবং ব্রাহ্মণমাতার গর্ভস্থ সন্তান হইত তাহা হইলেই ইহা আইডিয়া-ভিত্তিক উপন্যাস হইত এবং তাহার জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া তাহার তর্কের বিচার হইত। কিন্তু গোরা যে মতামত প্রকাশ করিয়াছে তাহার জায়গা পাওয়া বা জায়গা জুড়িবার প্রশ্নই উঠে না, কারণ ঔপন্যাসিক পূর্ব হইতেই অপর দিকের পাল্লা ভারী করিয়া রাখিয়াছেন; গোরা হিন্দুই নয়।

'শেষ প্রশ্ন' অন্য শ্রেণীর উপন্যাস এবং প্রকৃত তর্কপ্রধান উপন্যাস। কমল জারজ সন্তান, অসবর্ণ, শাস্ত্রবহির্ভূত যৌনমিলনের ফল। প্রথম হইতেই এই সত্যকে সে স্পষ্ট করিয়া দেখিয়াছে, কোন রকমের সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন করে নাই। সাহেবদের চা-বাগানে এইরূপ যৌনমিলন ছিল সুপরিচিত ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট রুশবিপ্লবকে টানিয়া আনার দরকার নাই। অসাধারণ যদি কিছু থাকে তবে তাহা কমলের বাবার ব্যক্তিত্ব ও নৈতিক সাহস এবং সেইরূপ নৈতিক শিক্ষাই তিনি তাঁহার মেয়েকে দিতে পারিয়াছিলেন। কমল জীবনের প্রথম উনিশ বছর তাহার বাবার কাছেই কাটাইয়াছিল এবং

তাঁহার দেওয়া শিক্ষাকে সে খুব সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা দিয়াছে : 'এ জীবনে কখনো কোনো কারণেই যেন মিথ্যা চিন্তা, মিথ্যা অভিমান, মিথ্যা বাক্যের আশ্রয় না নিই, বাবা এই শিক্ষাই আমাকে বার বার দিয়ে গেছেন।' তাহার রূপসী মায়ের সংযমের অভাব ছিল ইহা কমল অসংকোচে স্বীকার করিয়াছে। কমল মানুষের প্রবৃত্তিকে সহজভাবে গ্রহণ করিয়াছে, সে ইহাকে 'মিথ্যা অভিমান' দিয়া আবৃত করিতে চাহে নাই। সুতরাং সে মায়ের অসংযত আচরণকে রুচির ভ্রান্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। ইহাকে প্রচলিত নীতির মাপকাঠিতে বিচার করিতে চেষ্টা করে নাই। আর মনে হয় আধুনিক কালে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে আমরা 'permissive society' বলি, কমলের বাবা তাহারই অগ্রদূত।

কমলের সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় হয় তখন দেখিতে পাই, সে একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া জীবনকে বিচার করে এবং সেই নিজস্ব মতবাদ দিয়া নিজের জীবনকেও চালিত করে। আমাদের চিরাচরিত নীতি ও প্রথার মধ্যে তাহার সমস্ত মন্তব্যই যেন বেমানান ঠেকে। তাজমহলে আমরা সকলেই সম্রাট শাজাহানের 'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া' বাণীর মর্মর প্রতীক দেখিতে পাই। কিন্তু কমলের বিশ্লেষণ ভিন্ন রকমের। প্রথমতঃ সম্রাট শাজাহানের অন্য বেগমও ছিলেন; সুতরাং ইহাকে একনিষ্ঠ বা অবিস্মরণীয় প্রেমের প্রতিমূর্তি এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। সম্রাটের প্রচুর ঐশ্বর্য ছিল এবং উচ্চাঙ্গের সৌন্দর্যবোধ ছিল। তাজমহল তাহারই সাক্ষ্য বহন করে, ইহার সমস্ত মাহাত্ম্য শিল্পের মাহাত্ম্য। স্ত্রীর মৃত্যু একটা গৌণ উপলক্ষ্য মাত্র, তিনি একটা বড় যুদ্ধজয়ের পরও এইরূপ মর্মরমূর্তি গড়িতে পারিতেন। দ্বিতীয়তঃ একনিষ্ঠ প্রেম জীবধর্মের বিরোধী। জড় পদার্থ অচল অনড়; প্রাণের ধর্মই গতিশীলতা, সে কোন এক জাগায় স্থির হইয়া থাকে না; যদি থাকে, তবে সেই স্থিতিশীলতা মৃত্যুরই সামিল।

গতিশীলতাই কমলের জীবনের মূলসূত্র। সেইজন্য শিবনাথের সঙ্গে তাহার যখন বিবাহ হয় তখন অন্য সবাই বলিল, অনুষ্ঠান কিছুই হইল না; বিবাহ একেবারেই ফাঁকি। কিন্তু কমলের মনে কোন দ্বিধা জাগে নাই। যদি তাহাদের মনের মিলেই ভাঙন ধরে, তাহা হইলে কি শুধু অনুষ্ঠানের জোরে একে অপরকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে? ইহা অপেক্ষা আত্মহত্যা অনেক ভাল। কমলের

জীবনদর্শনকে ক্ষণবাদ বলা যাইতে পারে। এই শব্দটি বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এইখানেই বলিয়া রাখা ভাল, সেইরূপ কোন তাৎপর্য বর্তমান আলোচনায় অভীপ্সিত নয়। কমল মনে করে, মানুষের মন গতিশীল এবং প্রত্যেক মানুষেরই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে। যখন যেরূপ অভিরুচি বা প্রবৃত্তি হইবে সেই অনুসারে সে চলিবে। সকল কাল, সকল দেশ বা সকল মানুষের জন্য কোন রীতিনীতি বা শাস্ত্র খাড়া করিলে এবং তাহার দ্বারা হৃদয় ও মনের নিত্য গতিশীল প্রবৃত্তিকে বাঁধিতে গেলে জীবনের বৈশিষ্ট্যই লুপ্ত হইবে।

কমলের বাক্য ও যুক্তির মধ্যে তাহার চিন্তার ঋজুতা, স্বচ্ছতা এবং অলংকারের আবরণের অন্তরালে সত্যের স্বরূপ আবিষ্কারের জন্য অবিচলিত নিষ্ঠা দেখা যায়। এইখানেও রবীন্দ্রনাথের গোরার সঙ্গে তাহার তুলনা করিলে গোরা ও কমলের চরিত্রের এবং যুক্তিতর্কের প্রণালীর পার্থক্য স্পষ্ট হইবে। সমাজকে সব বিষয়ে নির্বিচারে মানিয়া চলার সপক্ষে গোরা যুক্তি দিয়াছেঃ 'না মানলে সমাজকে ভাঙতে হবে।' বরদাসুন্দরী যখন প্রশ্ন করিলেন, 'ভাঙলে দোষ কি?' তখন গোরা উপমার সাহায্যে পাল্টা প্রশ্ন করিল, 'যে ডালে সকলে মিলে বসে আছি সে ডাল কাটলেই বা দোষ কি?' ইহা যুক্তি নয়, উপমা এবং উপমার সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হইলেই গোরার চিন্তার অস্পষ্টতা ধরা পড়ে। যে ডাল জীর্ণ হইয়া গিয়াছে সেই ডালে সকলে মিলিয়া বসিয়া থাকিলে সকলেরই প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকে এবং মাঝে মাঝে শুষ্ক, রোগাক্রান্ত ডাল কাটিয়া ফেলা গাছের স্বাস্থ্যের পক্ষেই প্রয়োজনীয়। ইহার পাশে কমলের চিন্তার ধারা ও প্রকাশভঙ্গি উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। অজিত কমলকে বলিয়াছিল, 'নারীর ভালবাসায় যেমন হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে, তার রূপের মোহও বুদ্ধিকে তেমনি অচেতন করে।..... এ শুধু ক্ষণিকের মোহ।·...কমল, কুহেলিকা যত বড় ঘটা করেই সূর্যালোক ঢেকে দিক তবু সে-ই মিথ্যে। সূর্য্যই ধ্রুব।' লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে যে, ক্ষণিকতার কথা বাদ দিলে এই যুক্তির সঙ্গে সব্যসাচীর যুক্তির সাদৃশ্য আছে। ক্ষণবাদিনী কমল উপমার অলংকরণ অতিক্রম করিয়া নির্ভেজাল সত্যে পহুঁছিতে চেষ্টা করে। তাহার চিন্তা স্বচ্ছ; তাই তাহার ভাষাও স্পষ্ট এবং জোরাল। সে শান্তকণ্ঠে কহিল, 'ওটা কবির উপমা অজিতবাবু, যুক্তি নয়। সত্যও নয়। কোন্ আদিমকালে কুহেলিকার সৃষ্টি হয়েছিল, আজও সে তেমনি বিদ্যমান আছে।..... তেমনি

হোক মোহ ক্ষণিকের, কিন্তু ক্ষণও তো মিথ্যে নয়। ক্ষণকালের আনন্দ নিয়ে সে বার বার ফিরে আসে।'

গোরার যে পরিবর্তন আসিয়াছে, তাহা আকস্মিক আবিষ্কারের মধ্য দিয়া; ইহা প্রধানতঃ প্লটের ব্যাপার, অনেকটা deus ex machina-র মত, যদিও ইহাও মানিতে হইবে যে সুচরিতা ও পরেশবাবুর সান্নিধ্যে আসার ফলে তাহার সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার ভিত্তি খানিকটা নড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহার মাকেও সে নূতন করিয়া চিনিতে শিখিয়াছে। তবু এই উপন্যাসের পরিণতিতে আকস্মিক আবিষ্কারই প্রধান ব্যাপার। কমল তাহার জীবনদর্শনকে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া যাচাই করিতে যাইয়া ক্ষণবাদের ক্ষণভঙ্গুরতাকেও উপলব্ধি করিয়াছে। 'গুণী' শিবনাথের স্বরূপ পূর্বতন সহকর্মী অবিনাশবাবু খানিকটা জানিতেন। তাই শৈববিবাহের বর্ণনা শুনিয়া তিনি খুব সঙ্গত সংশয় প্রকাশ করিলেন, 'শৈববিবাহ ত এখন আর আমাদের সমাজে চলে না কিনা, তাই কোনদিন যদি উনি হয়নি বলে উড়িয়ে দিতে চান ত সত্যি বলে প্রমাণ করবার তোমার কিছুই নেই কমল।' এই মন্তব্যে কমলের প্রথম যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া হইল তাহা খুব সূক্ষ্ম ও লক্ষণীয়। সে একান্ত ভরসার সহিত শিবনাথের প্রতি চাহিয়া কহিল, 'হাঁ গা, করবে নাকি তুমি কোন দিন এই রকম?' ইহার ব্যঞ্জনা স্পষ্ট। অনেক দুঃখকষ্ট অতিক্রম করিয়া সে যাহাকে বরণ করিয়াছে, তাহার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সে প্রস্তুত হয় নাই। ইহার পরে অবশ্য সে অন্য সুরে দৃপ্ত কণ্ঠে বলিয়াছে, 'সত্য যাবে ডুবে, আর যে অনুষ্ঠানকে মানিনে তারই দড়ি দিয়ে ওঁকে রাখবো বেঁধে? আমি? আমি করব এই কাজ?' ইহা সহজেই অনুমান করা যায়, নবীন প্রণয়ের উচ্ছ্বাসে সে ইহাই আশা করিতেছে যে বাঁধিয়া রাখিবার প্রয়োজনই হইবে না; মধুচন্দ্রের মাধুর্য্য অটুট থাকিবে। তার পর সত্যই যখন শিবনাথ তাহাকে পরিত্যাগ করিল, তখন সে 'হাসিমুখে' শান্ত কণ্ঠে অজিতকে জানাইয়া দিল, 'আপনাদের ভয় নেই, তিনি এখানে আর আসেন না। শৈব বিবাহের শিবানীর মোহ বোধ হয় তাঁর কেটেছে।' গ্রন্থকার নিজেই মন্তব্য করিয়াছেন, 'অজিত তাহার লণ্ঠনের আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল এ হাসির জাতই আলাদা। তাহার পূর্বেকার হাসির সহিত কোথাও ইহার কোন অংশেই সাদৃশ্য নাই।' সে শিবনাথকে ধরিয়া রাখিতে চাহে নাই। কিন্তু ইহার পরে দুই-একবার শিবনাথের যে উল্লেখ করিয়াছে সেই উল্লেখের মধ্যে মোহভঙ্গের বেদনা ও এইরূপ নীচপ্রকৃতির লোকের

প্রতি একদিন যে সে আসক্ত হইয়াছিল তাহার তিক্ততা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার ভাষা উদ্ধৃত করিয়াই বলিতে পারি, এই অন্তর্দাহ বিগত সুখের শিশিরবিন্দুগুলিকে নিঃশেষে শুষিয়া ফেলিয়াছে।

নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়িয়া দিলেও কমল আগ্রায় এমন তুইটি লোকের সংস্পর্শে আসিল যাহাদের জীবনদর্শনের কাছে তাহার ক্ষণবাদ সংকীর্ণ ও তুচ্ছ বলিয়া মনে হয় এবং পরোক্ষভাবে সেও এই পার্থক্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। একজন আশুবাবু, যিনি বয়সে পিতৃতুল্য, যিনি শিক্ষায় সংস্কৃতিতে তাহার পিতার অপেক্ষা ন্যূন নহেন এবং যিনি সাহেব না হইলেও সুদীর্ঘকাল বিলাতে কাটাইয়াছেন এবং সেইখানেই জীবনের শেষ কয়েক বৎসর কাটাইবার সংকল্প করিয়াছেন। 'রক্ষণশীল' শব্দটি বিশেষ অর্থে এত প্রযুক্ত হইয়াছে যে ইহা উচ্চারণ করিলেই অনুদার গোঁড়ামির কথা মনে হয়। অথচ আশুবাবুকে গোঁড়া হিন্দু বা গোঁড়া স্বদেশপ্রেমিক বলা যায় না আর যদিও তিনি তাঁহার একমাত্র কন্যাকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই, ক্ষণবাদিনী কমলও সেইজন্য তাঁহাকে দোষারোপ করে নাই। আগ্রায় যে সকল লোকের সংস্পর্শে তাঁহাকে দেখি, চরিত্রের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা সত্ত্বেও তিনি তাহাদের সবাইকে কাছে টানিতে পারিয়াছেন। কমল তাঁহাকে যে আঘাত করিয়াছে তাহার মধ্যে প্রগল্‌ভতা ও অবিনয় আছে, কিন্তু সেও তাঁহার সান্নিধ্য কামনা করিয়াছে এবং তাঁহার সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহিয়াছে। তিনি কিন্তু অমূর্ত আইডিয়া মাত্র নহেন; তাঁহার মধ্যে মানবিক দুর্বলতাও আছে। তিনি ঝোঁকের মাথায়, ভুল বুঝিয়া কমলের সঙ্গে একবার দুর্ব্যবহারও করিয়াছেন। যদিও তাঁহার হৃদয়ের প্রশস্ততা দেহের বিপুলতারই অনুরূপ তবু তিনি নিজের কন্যার অপরাধ মার্জনা করেন নাই, কিন্তু ইহা উদারতার অভাব প্রমাণ করে না। শিবনাথ-মনোরমার প্রেম ও পলায়ন এই গ্রন্থের একটা অনুকাহিনী মাত্র; গ্রন্থকার ইহার সঙ্গত ব্যাখ্যা দেন নাই এবং সেই হিসাবে ইহাকে অপূর্ণ বলিয়া দোষারোপও করা যায়। কিন্তু এই উপাখ্যানের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা থাকুক বা না থাকুক, ইহার মধ্যে দ্বিবিধ বিশ্বাসঘাতকতা আছে। তাঁহার মেয়ে শুধু নিজের প্রণয়ীর প্রতিই প্রতারণা করে নাই, অপর এক মহিলার স্বামীকে চুরি করিয়াছে। এই-রূপ অপরাধ যে কোন সাধারণ পিতার কাছেই অক্ষমণীয় মনে হইতে পারে। নীলিমার হৃদয়ে তাঁহার প্রতি যে অনুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছে ইহাতেও তিনি সাধারণ ভদ্র গৃহস্থের মতই বিব্রত ও বিচলিত হইয়াছেন। এই উপাখ্যানটিরও

সঙ্গত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেওয়া হয় নাই, কিন্তু আশুবাবুর বিব্রত, বিচলিত অবস্থা খুবই স্বাভাবিক।

আশুবাবুর মধ্যে কমল এমন একটি লোককে দেখিতে পাইয়াছে যিনি ক্ষণিক মোহকে উপলব্ধি করেন, কিন্তু তাহার দ্বারা চালিত হয়েন না। তিনি আদর্শের স্থায়িত্বে বিশ্বাসী; কুয়াশা সূর্যের মতই নিত্য বা অনিত্য, কিন্তু সে যদি সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত না হইত তাহা হইলে মানুষের জীবনযাত্রা হয়ত অচল হইয়া যাইত। প্রত্যেক ফুলেরই বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য আছে, কিন্তু মালা গাঁথিতে হইলে একটি সূত্রের দরকার যাহা ফুলগুলিকে একত্রিত, সজ্জিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। আশুবাবু যে সকলকেই কাছে টানিতে পারিয়াছেন তাহার একটি কারণ সকলেই তাঁহার মধ্যে একটি গুণ দেখিতে পাইয়াছে যাহার উপরে নিশ্চিন্ত নির্ভর সম্ভব। পরের গাড়ি চুরি করিয়া এক রাত্রিতে উৎসব করা যায়, কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইলে সূর্যালোকে আর সমাজে বাহির হওয়া যায় না। কমলের বাবা তাহাকে মিথ্যা চিন্তা ও মিথ্যা অভিমান হইতে মুক্তি দিয়া সত্যের পথে আনিতে চাহিয়াছিলেন। আশুবাবুর সংস্পর্শে আসিয়া কমল দেখিতে পাইল যে, সত্যের যে সংজ্ঞা সে পিতার নিকট পাইয়াছিল তাহা সীমিত, সংকীর্ণ; রূপ বা গুণের মোহ যত সত্য তাহার চেয়েও বড় সত্য সেই মোহকে মোহ বলিয়া চিনিতে পারা।

আর একটি লোকের সংস্পর্শে কমল নূতন আলোকের সন্ধান পাইয়াছে—সে বিপ্লবী রাজেন। রাজেন জীবনে রাজনৈতিক বিপ্লবের ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, দেশসেবা বা সমাজসেবা তাহার আনুষঙ্গিক অংশমাত্র। তাহার হৃদয়াবেগ লইয়া মাথা ঘামাইবার ফুরসৎ নাই; ইহা সে বুঝে না ও বুঝিতে চায় না এবং মতের অমিলকে সে সহ্য করে না, বিপক্ষকে ধ্বংস করাই তাহার ব্রত। আশুবাবুর উচ্চ শিক্ষা, কমলের তার্কিকতা এবং মনের মিলের প্রতি শ্রদ্ধা—এই সবই তাহার কাছে অর্থহীন। হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে সে উদাসীন, অনভিজ্ঞ, তবু সে কমলকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে, 'আপনার নিজের বিবাহের ব্যাপারে মনের মিলটাকেই একমাত্র সত্য স্থির করে বাহ্যিক অনুষ্ঠানের গরমিলটাকে কিছু না বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেটা সত্য নয় বলেই আজ আপনাদের সমস্ত অসত্য হয়ে গেল।' সে কর্মী; তাই সে বলিয়াছে, 'মনের মিলটাকে আমি তুচ্ছ করিনে কিন্তু ওকেই অদ্বিতীয় বলে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করাটাও হয়েছে আজকালকার একটা উচ্চাঙ্গের পদ্ধতি। এতে ঔদার্য এবং মহত্ত্ব দুইই প্রকাশ পায়, কিন্তু সত্য

প্রকাশ পায় না। সংসারে যেন শুধু মনটাই আছে। আর তার বাইরে সব মায়া, সব ছায়াবাজি। এটা ভুল।' রাজেনের সঙ্গে মুচিপাড়ায় ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারিতে সেবা করিতে গিয়া কমল এই ব্যবহারিক জগতের নিয়মশৃঙ্খলের কঠোরতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইল। এমন কি সে রাজেনের দলে—অর্থাৎ বিপ্লবের কাজেও যোগ দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু রাজেন সে প্রস্তাবে কান দেয় নাই। উপন্যাসের উপসংহারে দেখি, মথুরায় অগ্নিদগ্ধ মন্দির হইতে বিগ্রহ রক্ষা করিতে গিয়া রাজেন নিজে জীবন বিসর্জন দিয়াছে। এখানেও কমলের সঙ্গে তাহার মৌলিক পার্থক্য দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। রাজেনের মৃত্যু কমলকেই সবচেয়ে বেশি আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু তবু জীর্ণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মের জন্য এই মহাপ্রাণ মানুষটি আত্মোৎসর্গ করায় 'চোখ দিয়া তাহার আগুন বাহির হইতে লাগিল, বলিল, দুঃখ কিসের? সে বৈকুণ্ঠে গেছে। হরেন্দ্রকে কহিল, কাঁদবেন না হরেনবাবু, অজ্ঞানের বলি চিরদিন এমনি করেই আদায় হয়।' এখানেও সে রাজেনের নিষ্ঠা ও একাগ্রতাকে ঠিক চিনিতে পারে নাই।

হরেনকে সে যাহাই বলুক, নিজের অভিজ্ঞতা এবং আশুবাবু ও রাজেনের সংস্পর্শ—ইহাদের সম্মিলনে তাহার নিজের মধ্যেও পরিবর্তন আসিয়াছে। একদিকে সে আশুবাবু, হরেন্দ্র এমন কি গোঁড়া অক্ষয়ের বিশ্বাসে নাড়া দিয়াছে। কিন্তু তাহার নিজের ক্ষণবাদও রূপান্তরিত হইয়াছে। একদিন শৈববিবাহের আনুষ্ঠানিক ফাঁকিকে সে জোরের সহিত সমর্থন করিয়াছিল, কিন্তু বিদায়ের পূর্বে আশুবাবুকে সে বলিয়াছে, 'আমি জানি আপনার ব্যথা লাগে, কিন্তু আচার-অনুষ্ঠানকে মিথ্যে বলে আমি উড়িয়ে দিতে ত চাইনে, চাই শুধু পরিবর্তন। কালের ধর্মে আজ যা অচল, আঘাত করে তাকে সচল করতেই চাই।' পূর্বে সে এমন কথা বলে নাই। সে অজিতের সঙ্গে মিলিত হইয়া আগ্রা পরিত্যাগ করিল। ইহারা কি অনুষ্ঠানের দ্বারা আবদ্ধ হইবে সেই সম্পর্কে কৌতূহল অনাবশ্যক। কিন্তু সে এখন চায় শান্তি, স্থিতি, এমন একটা বন্ধন যা ক্ষণিক মোহের অতীত। সেই বন্ধনে হয়ত বাহিরের অনুষ্ঠান কিছু রহিল না, কিন্তু তাহা স্থায়িত্বের আকাঙ্ক্ষায় কম্পমান। এমন কি এই পরম আনন্দের দিনে এই চরম নাস্তিক ভগবানকে মানিবার শক্তির জন্য আকুতি জানাইয়াছে: 'ভগবান ত মানিনে, নইলে প্রার্থনা করতাম দুনিয়ার সকল আঘাত থেকে তোমাকে আড়ালে রেখে এক দিন যেন আমি মরতে পারি।'

'শেষ প্রশ্ন' প্রশ্নমূলক উপন্যাস; প্রবৃত্তির বন্ধনহীনতা ও নিয়মের শৃঙ্খল,

গুহাহিত হৃদয়াবেগ ও জ্ঞানের আলোক, অতীতের সঞ্চিত স্থির বিশ্বাস আর অজানা ভবিষ্যতের অনির্দেশ্য আহ্বান—ইহাদের বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য কমল ও অন্যান্য চরিত্রের মিলন ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়া ধ্বনিত হইয়াছে। ইহাদের তর্কই উপন্যাসের কাহিনী আর তর্ক ছাড়া কাহিনী যেটুকু আছে তাহাও তর্ককে সঞ্জীবিত করিয়াছে। এই অন্যোন্যসংশ্রয়ের জন্যই ইহা উপন্যাস হিসাবে স্বকীয়তা ও সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

৪

'বিপ্রদাস' শরৎচন্দ্রের শেষ সম্পূর্ণ উপন্যাস। বাহির হইতে ইহাকে কাহিনী ও চরিত্রপ্রধান উপন্যাস বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাও আইডিয়া-ভিত্তিক উপন্যাস। শরৎচন্দ্র পূর্বে যে সকল উপন্যাস ও গল্প লিখিয়াছেন তাহাদের মধ্যে অর্থবান্ লোকের দেখা মিলে—যেমন 'পরিণীতা'র শেখর, 'দত্তা'র বিজয়া, 'নিষ্কৃতি'র গিরিশ, চন্দ্রনাথ, 'চরিত্রহীন' সতীশ ইত্যাদি। কিন্তু ইহাদের আর্থিক সচ্ছলতা উপন্যাসের আনুষঙ্গিক লক্ষণ মাত্র। পূর্বের এই সকল উপন্যাসে দুই-একটি অভিজাত লোকের চিত্র আছে যাহারা সমাজের শিরোমণি—যেমন 'দেনাপাওনা'র জনার্দন রায় বা 'বামুনের মেয়ে'র গোলোক চাটুয্যে। বেণী ঘোষালও ইঁহাদের সমগোত্রীয়; ইঁহারা একশ্রেণীর অভিজাত কুলের প্রতিনিধি স্থানীয় এবং যে কোন সমাজের কলঙ্ক। শরৎচন্দ্র ইঁহাদের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহার মধ্য দিয়া সমাজপতি তথা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইঁহারা যে শ্রেণীর কলঙ্ক তাহার মধ্যেও ভাল লোক থাকিতে পারে; তা যদি না থাকিবে তাহা হইলে এই শ্রেণী এক দিন প্রাধান্য পাইয়াছিল কি করিয়া? 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে তিনি এই আচারনিষ্ঠ অভিজাত সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ও রক্ষণশীলতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার রহস্য অনুধাবন করিয়াছেন। 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসের আশুবাবু ধনবান, উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চমনা, কিন্তু রক্ষণশীল। তবু তাঁহার সঙ্গে বিপ্রদাসের তুলনা করিলে সাদৃশ্য অপেক্ষা পার্থক্যই বেশি স্পষ্ট হইয়া পড়ে এবং আশুবাবু স্বদেশেও প্রবাসী। বিপ্রদাসই খাঁটি বাঙালী অ্যারিস্টক্র্যাট। তিনি প্রাচীনপন্থী, আচারনিষ্ঠ এবং—সেকালের জমিদার বা বড়লোকদের নিকট হইতে যাহা আশা করা যাইতে পারে—সমাজের আশ্রয়স্থল।

এই জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল কিনা বলিতে পারি না। বিপ্রদাস তাঁহার নিজের ছোট মামার নাম, কিন্তু তিনি জমিদার তো ছিলেনই না, তাঁহাকে সম্পন্ন গৃহস্থও বলা যায় না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবের জন্যই হউক, অথবা সৃজনী-প্রতিভার অবক্ষয়ের জন্যই হউক, শরৎচন্দ্র 'বিপ্রদাস' গ্রন্থে এই আইডিয়াকে রূপ দিতে পারেন নাই। নায়ক বিপ্রদাস বলরামপুর সমাজের মাথার মণি ছিলেন। ইহাও বোধ হয় ঠিক উপমা হইল না। কালিদাসের ভাষা অনুকরণ করিয়া বলিতে পারি তিনি যেন হিমালয়ের মত পূর্বাপর সীমা আগলাইয়া এই সমাজের মানদণ্ডের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি প্রাচীন আচারপন্থী, ছুঁৎমার্গে বিশ্বাসী, প্রতি পদে শাস্ত্র ও নিয়ম বাঁচাইয়া চলিতেন অথচ কাহারও উপর জুলুম করিতেন না, সকলের অভাব-অভিযোগ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পূরণ করিতেন, আবার কাহারও কাছে মাথা নত করিতেন না। তাঁহার বিমাতা দয়াময়ী সেই আমলের হিন্দু বিধবার এবং জমিদার-গৃহিণীর আদর্শস্বরূপ ছিলেন সপত্নীপুত্রকে তিনি মাতার অধিক যত্নে প্রতিপালন করিয়াছিলেন এবং মনে হয় মা ও ছেলের জীবন যেন একই সুরে বাঁধা দুইটি তন্ত্রী। বিপ্রদাসের স্ত্রী সতী আদর্শ স্ত্রী এবং আদর্শ পুত্রবধূ।

বিপ্রদাস ইস্কুল কলেজে তেমন পড়েন নাই, কিন্তু তিনি ঘরে বসিয়া যথেষ্ট পড়াশোনা করিয়াছেন। তাঁহার বিরাট লাইব্রেরি ছিল, তাহার মালিক ও একমাত্র পাঠক তিনি। তাঁহার বৈমাত্র ভাই—দয়াময়ীর ছেলে—দ্বিজদাস বাহ্যতঃ তাঁহার বিপরীত। সে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং কলিকাতায় কলেজে পড়িয়া এম এ. পাস করিয়াছে। সে সব বিষয়ে আধুনিকপন্থী, এমন কি শ্রমিক ও কিষাণদের সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম ক্ষুদে নায়ক। দয়াময়ীর আর একটি সন্তান মেয়ে; সে বিবাহিত হইয়া শ্বশুরবাড়িতে থাকিত, সুদীর্ঘ উপন্যাসে তাহাকে ও তাহার স্বামীকে কেবল শেষের দিকে দেখা যায়। যে স্ত্রীচরিত্র গ্রন্থে বেশি জায়গা জুড়িয়াছে সে আধুনিক কালের মেয়ে, বোম্বাই প্রবাসী বিলাতফেরত মিস্টার রায় বা রে'র মেয়ে বন্দনা। শিক্ষাদীক্ষা, চাল-চলন, আচার-বিচার—সব বিষয়েই সে আধুনিকা। এমন কি, তাহার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কিছু পরেই জানা গেল যে, সুধীর নামে এক যুবকের সে বাগদত্তা এবং সুধীর অব্রাহ্মণ। বন্দনার পিতা বিপ্রদাসের স্ত্রীর কাকা। আচার-বিচারে বৈষম্য সত্ত্বেও বিপ্রদাসের স্ত্রী সতীর মনে সুদূর ইচ্ছা ছিল বন্দনাকে তাহার দেবর দ্বিজদাসের সঙ্গে বিবাহ দেয়। বন্দনার বাগ্‌দানের কথা

নিশ্চয়ই তাহার জানা ছিল না। যাহা হউক, বন্দনা ও তাহার বাবার আকস্মিক অভ্যাগমে বলরামপুরের মুখুয্যেবাড়ির লোক যতই অবাক হউক, ইহাদের ধীর স্থির জীবনযাত্রায় কোন ব্যাঘাত হইল না এবং অতিথি-আপ্যায়নেরও কোন ত্রুটি হইল না। কিন্তু বন্দনার বুঝিতে দেরি হইল না যে তাহারা মান্য অতিথি এবং নিকট কুটুম্ব হইলেও এই আচারনিষ্ঠ পরিবারে অপাংক্তেয়। বন্দনা এই অপমানে ক্ষুব্ধ হইল এবং তাহার ক্ষোভ প্রকাশও করিল। কিন্তু মুখুয্যে-পরিবারের ট্র্যাডিশান এত দৃঢ়, তাহার জীবনযাত্রার ধারা এত সুশৃঙ্খল যে তাহার সমালোচনা সত্ত্বেও নিস্তরঙ্গ নদীর মত ইহা সহজভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। শুধু দ্বিজদাসের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবটা চাপা পড়িয়া গেল। অন্য এক পাত্রীর সঙ্গে দ্বিজদাসের বিবাহের প্রস্তাব খানিকটা অগ্রসরও হইতে লাগিল।

কিন্তু মুখুয্যে-পরিবারের—বিশেষ করিয়া বিপ্রদাসের—সংস্পর্শে আসিয়া বন্দনা নিজে এক নূতন জগতের সন্ধান পাইল এবং এক মহামানবের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তাহার জীবনে আমূল পরিবর্তন আসিল। প্রজা ও শ্রমিকদের মিছিল এবং তাহার বন্দে মাতরম্ মন্ত্র বিপ্রদাসের বাড়ির কাছে আসিয়া দূর হইতে বিপ্রদাসকে দেখিয়া মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইয়াছিল। এই সব আন্দোলনের অন্যতম নেতা দ্বিজদাস দাদার একান্ত অনুগত অনুজ। বাড়ির ঝি অন্নদা ওরফে অনুদিদি আশ্রিতা পরিচারিকা নয়—যেন মন্ত্রমুগ্ধা শিষ্যা। বন্দনা জনৈকা আত্মীয়ার বিবাহ উপলক্ষে কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া গেল। তাহার আগেকার জগৎ এবং বিপ্রদাসের সংসারের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখিয়া সে বিমোহিত হইয়া ওখানকার মেকি উৎসবের কলরোল পরিত্যাগ করিয়া রুগ্ন বিপ্রদাসের সেবায় আত্মনিয়োগ করিল এবং বিপ্রদাস সুস্থ হওয়ার পরও যথাসাধ্য সনাতন হিন্দু আচার পালন করিতে আরম্ভ করিল। এই পরিবর্তনের মধ্যে সে আগেকার জগতের সম্ভাব্য দুই পাত্র সুধীর ও অশোককে প্রত্যাখ্যান করিল এবং বিপ্রদাসের প্রতি গভীরভাবে আসক্ত হইল। বিপ্রদাসের প্রতি তাহার এই অনুরক্তি এবং তাহার প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি অশালীন। তবে ইহা স্থিতধী বিপ্রদাসের ব্যক্তিত্বের অসামান্য ঐন্দ্রজালিক প্রভাবের পরিচয় দেয়।

ইহার পর রঙ্গমঞ্চে হঠাৎ উপস্থিত হইল দয়াময়ীর কন্যা কল্যাণী এবং তাহার বর শশধর। এই শশধর বিপ্রদাসের সঙ্গে কোন একটা বড় রকমের শঠতা করিয়াছিল। তাহা ধরা পড়িল এমন একদিন যখন একটা বড় উৎসব উপলক্ষে

সে স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুরবাড়িতে অতিথি। বিপ্রদাস তাহাকে বাড়ি হইতে বহিষ্কার করিয়া দিতে চাহিলে দয়াময়ী মেয়ে জামাইয়ের পক্ষ লইয়া রুখিয়া দাঁড়াইলেন। ফলে বিপ্রদাসই স্ত্রী ও নাবালক পুত্রকে লইয়া গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সংসারের ভার পড়িল এবার দ্বিজদাসের হাতে। ইহার পরে প্রবাসে সতীর মৃত্যু এবং বিপ্রদাসের মাতৃহারা পুত্রকে লইয়া বলরামপুরে প্রত্যাবর্তন। সতীর মৃত্যু অনেকটা deus ex machina-র মত অথবা শরৎ-চন্দ্র যাহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন সময়মত সর্পাঘাতের ব্যবস্থার মত। ইহার ফলে বিপ্রদাস ও দয়াময়ীর পুনর্মিলন হইল। দ্বিজদাস বন্দনাকে বিবাহ করিয়া মুখুয্যেবাড়ির হাল ধরিল এবং সতীর ছেলেকে মানুষ করিবার ভার লইল। পুনর্মিলনের পর দয়াময়ী বিপ্রদাসকে সঙ্গে লইয়া তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া গেলেন।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থ সম্পর্কে মোটামুটিভাবে অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তিনিও ইহার কতকগুলি মারাত্মক ত্রুটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন। অনেকটা তাঁহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ অনুসরণ করিয়া এই ত্রুটিগুলি নির্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, দয়াময়ী এবং বিপ্রদাসের যে আচারনিষ্ঠা ইহার প্রকৃত মূল্য কতটুকু? দয়াময়ী বন্দনার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করিয়াছেন আবার মনের প্রসন্ন অবস্থায় তাহাকে রান্নাঘরের ভার দিয়াছেন। বিপ্রদাসও প্রয়োজনে তাহার সেবা ও পরিচর্যা গ্রহণ করিয়াছেন, এমন কি নিজের পূজা-অর্চনার ব্যবস্থাদির ভার তাহার হাতে দিয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহাদের আচারনিষ্ঠা কি একটা সাময়িক খেয়াল না অত্যাজ্য ধর্ম? মুখুয্যে-পরিবারের প্রতিষ্ঠা, পারস্পরিক বন্ধনও বাহির হইতে জমকালো দেখাইলেও অন্তঃসারশূন্য বলিয়া মনে হয়। ইহা খুব সহজে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে আবার সতীর মৃত্যুতে জোড়া লাগিয়াছে; কিন্তু জোড়া লাগিয়াছে কিনা তাহাও বলা যায় না, কারণ মাতা-পুত্র পারিবারিক জীবনের ছিন্ন সূত্র নিজেরা যোজনা করিতে পারেন নাই; সতীর মৃত্যু ও দ্বিজদাসের শশধরের প্রতি বৈরিতা এই পুনর্মিলনের ভিত্তি।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দনার প্রণয়ের আকস্মিকতাকে ও বারংবার পাত্র পরিবর্তনকেও এই গ্রন্থের অন্যতম ত্রুটি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিপ্রদাসের প্রতি প্রণয় নিবেদনের কুশ্রীতার প্রতি আমিও বর্তমান প্রবন্ধে এবং অন্যত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। কিন্তু এই গ্রন্থের মৌলিক ত্রুটি বিপ্রদাসের চরিত্র। এখানে শরৎচন্দ্র একজন রক্ষণশীল, আচারপরায়ণ অভিজাত মহানায়কের চরিত্র

আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। রঘুকুলের নৃপতিদের মত বিপ্রদাস ব্যূঢ়োরস্ক, বৃষস্কন্ধ, শালপ্রাংশু, মহাভুজ। তাঁহার বর্ণনা দিতে ইহার পূর্বেও কালিদাস হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহাকে দেহে মনে মহাকাব্যের নায়কের ছাঁচেই গড়া হইয়াছে। তিনি সুপণ্ডিত এবং স্থিতপ্রজ্ঞ; এমন কি মদনকে ভস্ম করিবার পূর্বমুহূর্তে মহাদেবও—কালিদাসের ভাষায়—কিঞ্চিৎ 'পরিবৃত্তধৈর্য' হইয়াছিলেন কিন্তু বন্দনার উদ্বেল প্রণয়কে উপলব্ধি করিলেও বিপ্রদাসের চিত্ত কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হয় নাই। তাঁহার জীবনের অন্যান্য দিকের প্রতি দৃষ্টি দিলেও প্রাণরসের উচ্ছলতার অভাব দেখা যায়, কিন্তু উচ্ছলতাই প্রাণরসের ধর্ম। ইহার বলেই জড়জগৎ হইতে জীবজগতের উদ্ভব হইয়াছে। বন্দনার মনেও সন্দেহ জাগিয়াছে, এই ব্যক্তি যাহাকে ভালবাসা বলেন তাহা বোধ হয় কর্তব্য মাত্র এবং যাহাকে ধর্ম মনে করেন তাহা সংস্কারের অধিক কিছু নয়। বিপ্রদাসকে নানা সমস্যা, নানা কর্তব্য, নানা আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার চিত্ত কখনও স্বকীয় কোন প্রেরণার আবেগ অনুভব করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি সব সময়েই বাহিরের বাধানিষেধ মানিয়া চলিয়াছেন। তাই অনেক সময়ই তাঁহাকে বাহিরের শক্তির দ্বারা চালিত মর্মর মূর্তি বলিয়া মনে হয়। আবার শশধরের ব্যাপারে যে অগ্নি উদ্গীর্ণ হইল তাহা দেখিয়া মনে হয় এই মহাপুরুষ বিসুবিয়সের সঙ্গে তুলনীয়—বহুকাল ধরিয়া যে অগ্নি ভিতরে ভিতরে ধূমায়িত হইয়াছিল তাহা হঠাৎ বাহির হইয়া অনেক কিছু ধ্বংস করিয়া দিয়া আবার নিশ্চল হইয়াছে।

'বিপ্রদাস' এবং অন্যান্য উপন্যাস ও গল্পের তুলনামূলক আলোচনা করিলে মনে হয় শরৎ-প্রতিভা সেইখানেই স্ফুরিত হইয়াছে যেখানে বিদ্রোহের স্পন্দন ধ্বনিত হইয়াছে অথবা যেখানে নানা বিরোধী শক্তির সংঘাতের মধ্য দিয়া মানবচিত্ত সামঞ্জস্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এমন কি তাঁহার হাস্যরসের মধ্যেও এই বৈপরীত্য ও সমন্বয়-প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই বৈচিত্র্য ও জটিলতাই শরৎ-প্রতিভার মূল সূত্র। শরৎচন্দ্র নিজেও বলিয়াছেন যে তিনি সমস্যার চিত্র আঁকিয়াছেন, সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব অপরের। কিন্তু ইহাও মানিতে হইবে যে তাঁহার সমস্ত রচনার তলদেশে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত যে ধারাটি প্রবাহিত হইয়াছে তাহা সমাজ ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধারা।

জীবনদর্শন

শরৎচন্দ্রের জীবনদর্শন

১

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে জনৈক প্রাচীন আলংকারিক কবির সঙ্গে প্রজাপতি ব্রহ্মার তুলনা করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই আপন অভিরুচি অনুসারে প্রজা সৃষ্টি করেন। এই তুলনা প্রণিধানযোগ্য। আমাদের দেশে সকল দেবতার উপরে আছেন তিনজন শ্রেষ্ঠ দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বা শিব। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু রক্ষা করেন, শিব সংহার করেন, কিন্তু সংহার করিলেও তিনি মঙ্গলেরও দেবতা। লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে বিষ্ণু ও শিবের উপাসক বহু এবং ইঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া নানা সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ও শৈব দর্শন প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মাকে আশ্রয় করিয়া কোন দর্শন গড়িয়া উঠে নাই; ব্রহ্মার উপাসক কোন সম্প্রদায়ও আছে বলিয়া শুনি নাই। বলা নিষ্প্রয়োজন, যাহাকে আমরা ব্রাহ্ম ধর্ম বা ব্রাহ্ম দর্শন বলি তাহার কেন্দ্র উপনিষদের ব্রহ্ম, প্রজাপতি ব্রহ্মা নহেন। মনে হয় ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়া খালাস; হয়ত তিনি নিজের সৃষ্টির শুধু দ্রষ্টা এবং ইহাকে চারদিক হইতে দেখিবার জন্যই তিনি চতুর্মুখ; পরশুরাম 'নির্মেকক নৃত্য' গল্পে ব্রহ্মার চতুর্মুখীনতার এই জাতীয় একটা কৌতুকময় ব্যাখ্যাও দিয়াছেন।

প্রজাপতি ব্রহ্মার যদি কোন জীবনদর্শন না থাকে তবে মানবজগতে তাঁহার একমাত্র সাকরেদ কবি বা শিল্পীর নিকট হইতেও কোন দর্শন প্রত্যাশা করা উচিত নয় এবং বোধ হয় ফরাসী লেখক Sartre ছাড়া কেহ একাধারে দার্শনিক ও স্রষ্টা হইতে চেষ্টাও করেন নাই। অথচ আমরা কবি ও শিল্পীর সৃষ্টি হইতে একটা দার্শনিক নির্যাস বাহির করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। বার্ট্রাণ্ড রাসেল তো পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে কবি বায়রন সম্পর্কে একটি অধ্যায় সংযোজন করিয়া দিয়াছেন। নামজাদা দার্শনিক হইলেও রাসেল একটু খামখেয়ালী ধরনের লোক; তাঁহার এই নির্বাচন পাঠকসাধারণের অনুমোদন লাভ করিবে না। আর Sartre বা বায়রন কেহই উঁচু দরের স্রষ্টা নহেন। তবু ইহাও মানিতে হইবে যে, আমরা সকল স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যেই সাধারণ সূত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করি এবং সৃষ্টিবৈচিত্র্যের মধ্যে এই সাধারণ সূত্রের নামই জীবন-]

দর্শন। যাঁহার সৃষ্টিবৈচিত্র্য সব চেয়ে বিস্ময়কর সেই শেক্সপীয়রের জীবনবেদ সম্পর্কে, ধর্মমত সম্পর্কে বহু গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার বলিয়াছেন যে তিনি শুধু কবি। কিন্তু তবু তাঁহার বিপুল সৃষ্টিসাগর মন্থন করিয়া রবীন্দ্রদর্শন উদ্ধার করা হইয়াছে এবং তিনি শুধু ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হয়েন নাই, বিদেশে দার্শনিক হিবার্ট-বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

সাহিত্যিকের জীবনদর্শনের জন্য এই অনুসন্ধিৎসা অমূলক বা অযৌক্তিক নয়। আলংকারিকের উক্তির মধ্যেই ইহার সমর্থন আছে। তিনি বলিয়াছেন প্রজাপতি ব্রহ্মা ও কবি—ইঁহাদের অভিরুচিমত বিশ্ব পরিবর্তিত হয়। এইখানেই সাদৃশ্যের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মার নিজের সৃষ্টি। যতদূর আমরা আন্দাজ করিতে পারি, তিনি অন্য কিছুর উপর নির্ভর করিয়া নূতন সৃষ্টি করেন না; এমন কি যে বিধাতাপুরুষ মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করেন তিনিও তাঁহারই সৃষ্টি; এই বিধাতাপুরুষের সঙ্গেও তাঁহার কোন সংযোগ আছে অর্থাৎ তাঁহার নির্দেশানুসারে বিধাতাপুরুষ মানুষের ভাগ্যনির্ণয় করেন এমন কথা আমরা কল্পনা করি না। কিন্তু কবি সম্পূর্ণ নিরালম্ব বা নিরঙ্কুশ নহেন। বিশ্ব তাঁহার কল্পনানুসারে 'পরিবর্তিত' হয় বটে কিন্তু তাঁহার নিজের অভিরুচিও বিশ্বের মধ্যেই অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং অংশতঃ বিশ্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পিতামহ ব্রহ্মাকে এখন রেহাই দিয়া শিল্পীর প্রতিভার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কবি যাহা দেখেন তাহারই স্বরূপ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। সুতরাং তাঁহার সৃষ্টি অনেকটা বিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটন। কবির সৃষ্টি বিশ্বের রহস্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তাহার আবরণ উন্মোচন করিতে পারে না; নিজের অভিজ্ঞতাপ্রসূত অভিরুচি তাঁহার দৃষ্টিকে খানিকটা সীমিত করিবেই। সুতরাং কবির সৃষ্টি অনেকটা দর্শনও বটে। এই অর্থেই বলা যাইতে পারে যে কবির কাব্য জীবনের ক্রিটিসিজ্‌ম্।

২

প্রত্যেক দার্শনিক ও সাহিত্যিকই জীবনের সত্যের সন্ধান করেন। সত্য কি তাহা লইয়া মতভেদের অবধি নাই, যদিও সত্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে কাহারও সন্দেহ নাই। মনে হয় দার্শনিক ও শিল্পীদের মধ্যে যত প্রভেদ ও দ্বন্দ্ব তাহা

হইল সত্যে পহুঁছিবার পন্থা লইয়া। কাহারও জীবনদর্শন বুঝিতে হইলে তাঁহার নির্ধারিত বা অবলম্বিত পন্থারও বিচার করিতে হইবে। শরৎচন্দ্রের জীবনদর্শন তাঁহার শিল্পকর্মে প্রতিফলিত হইয়াছে। সেই শিল্পকর্মই অবশ্য মুখ্য। কিন্তু তিনি প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার মতামতের ব্যাখ্যাও দিয়াছেন। সেই সকল প্রবন্ধ তাঁহার সাহিত্য-কর্মকে বুঝিতে সাহায্য করে; ইহাই তাহাদের প্রধান সার্থকতা। এই প্রসঙ্গে তিনটি প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: 'নারীর মূল্য', 'সমাজ ধর্মের মূল্য' এবং 'স্বরাজ সাধনায় নারী'। প্রথম দুইটি প্রবন্ধ প্রস্তুতি-পর্বে (বর্মা থাকিতে) লেখা এবং তৃতীয়টি পরিণতি-পর্বে রচিত। লেখার ধরনে পার্থক্য থাকিলেও ইহাদের মধ্যে বিষয়বস্তুর ও সুরের ঐক্য আছে।

কিরণময়ী চরিত্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে মেটারলিঙ্কের একবার উল্লেখ করিয়াছি। যদিও মরমী নাট্যকার মেটারলিঙ্কের সঙ্গে বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের সাদৃশ্য নাই তবু মেটারলিঙ্কের একটি প্রবন্ধের সাহায্যে শরৎচন্দ্রের জীবনদর্শন বুঝাইতে চেষ্টা করা যাইতে পারে। মেটারলিঙ্ক মানুষের ন্যায়বিচার-বুদ্ধির রহস্য খুঁজিয়াছেন মানুষের মগ্নচৈতন্যে, সেখানে যে মন্দির প্রোথিত (The Buried Temple) আছে তাহার মধ্যে। আমরা যদি কাহারও প্রতি অন্যায় করি সেই অন্যায় শুধু প্রতিপক্ষেরই ক্ষতি করে না, আমাদিগকে অর্থাৎ অন্যায়-কারীকেও ভিতরে ভিতরে দুর্বল করে এবং আত্মঘাতের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। এইভাবেই বিচারের চক্র আবর্তিত হয়। কিরণময়ী চরিত্রের বিশ্লেষণ করিবার সময় এই নীতিরই উল্লেখ করিয়াছি। মেটারলিঙ্ক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহামানব নেপোলিয়নের পতনের অভিনব ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে পথের কণ্টক প্রাচীন রাজপরিবারের নিকট আত্মীয় Duc d' Enghien-কে শঠতার দ্বারা অপর রাজ্য হইতে অপহরণ করিয়া আনাইয়া নেপোলিয়ন ন্যায়-নীতি লঙ্ঘন করিয়া হত্যা করেন এবং নিজে সম্রাট পদবী গ্রহণ করেন। এই অন্যায়ে কেহ বাধা দিতে বা প্রকাশ্য আপত্তি করিতে সাহস করিল না। নেপোলিয়ন মনে করিলেন কৌশল ও বাহুবলই অমোঘ অস্ত্র। মেটারলিঙ্কের মতে, এই জয়োদ্ধত বীর বুঝিতেই পারিলেন না তিনি এইভাবে নিজেরও কত ক্ষতি করিলেন। এই নির্ভেজাল অন্যায়ের সাফল্যে তাঁহার বিচারবুদ্ধি বিভ্রান্ত হইল; ইহার পর তিনি স্পেনের সিংহাসনের প্রতি লুব্ধ হইয়া স্পেনের রাজা ও যুবরাজের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করিয়া স্বীয় ভ্রাতা জোসেফকে সেখানকার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই কারসাজি এবং পরস্বাপহরণ কাহারও কাছে গোপন

রহিল না এবং ইহারই ফলে আরম্ভ হইল দীর্ঘস্থায়ী Peninsular War, যেখানে নেপোলিয়নের একটানা বিজয়াভিযান প্রথম ধাক্কা খাইল। এই বৃহত্তর অন্যায় নেপোলিয়নের বুদ্ধিকে আরও আচ্ছন্ন করিল, কারণ এখানেই তিনি নিরস্ত হইলেন না। ইহার পরে এই অতি প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ এবং অতিকৌশলী সেনাপতি জীবনের বৃহত্তম দুষ্কার্য—রুশদেশ আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। কোন দিক দিয়াই এই আত্মঘাতী অপকর্মের সঙ্গত যুক্তি পাওয়া যায় না। পর পর ন্যায়নীতিকে ফাঁকি দিয়া পার পাইয়াছিলেন বলিয়াই এই মহামানবের বিচারবুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়াছিল এবং এই বিচার-বিভ্রমই শ্রেষ্ঠ যুদ্ধবিশারদকে চরম বিপর্যয়ের পথে ঠেলিয়া দিল। ইহাই ন্যায়বিচার এবং ইহার বীজ রোপিত হইয়াছিল পূর্বের একটি ছোট্ট ঘটনায়—Duc d' Enghien-এর হত্যায়।

কি কারণে জানি না শরৎচন্দ্র অল্প বয়সেই নারীর প্রতি অবিচার দেখিয়া বিচলিত হয়েন। তিনি উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ছিলেন ; ব্রাহ্মণ সমাজে কুলীন কন্যাদের দুর্ভাগ্য তাঁহার চিত্তকে আঘাত করিয়া থাকিবে। আবার উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্নবর্ণের প্রতি অত্যাচার করিয়া সেই নিম্নবর্ণকেই যে শুধু উৎপীড়িত করিয়াছে তাহাই নহে, নিজেরাও কিরূপ হতবল হইয়াছে তিনি তাহাও লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সর্বাপেক্ষা যে অন্যায় তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছে তাহা হইল হিন্দু—বিশেষ করিয়া উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবার অসহায় অবস্থা। আর আমাদের পাঁচ-জনের মত তিনি সনাতন ধর্মের প্রবক্তাদের মুখে শুনিয়া থাকিবেন যে সতীত্ব নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং এই ধর্ম এত অত্যাজ্য যে বিধবা হইলেও নারীকে ইহা আঁকাড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে এবং এই কারণেই বিধবাদিগকে কঠোর ব্রহ্মচর্যের নাগপাশে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে, কারণ তাহা না হইলে তাহাদের পদস্খলন হইবে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া শরৎচন্দ্র কুলত্যাগিনীদের জীবন সম্পর্কে কৌতূহলী হইয়া উঠেন এবং বর্মা যাইবার পূর্বে বহু কুলত্যাগিনী পতিতার ইতিহাস সংকলন করেন। এইভাবে, তাঁহার নিজের ভাষা উদ্ধার করিয়া বলিতে পারি, তিনি 'সমাজতত্ত্বের ছাত্র' হইয়া উঠেন এবং বর্মায় বসিয়া সমাজ-তত্ত্ব বিষয়ে বিস্তর পড়াশোনা করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য বাহিরের অলংকরণ মাত্র ; নিজের সিদ্ধান্তই মুখ্য। এই সকল সিদ্ধান্ত এক হিসাবে মৌলিকও, কারণ তিনি অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এই সকল সিদ্ধান্তে পহুঁছিয়াছিলেন। ইহার অনেকখানি হয়ত এখন পুরানো, বাসি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার আলোকে যে সকল উপন্যাস ও গল্প লিখিত হইয়াছে তাহা সজীব ও

অমর এবং এই সকল উপন্যাস বুঝিতে হইলে শরৎচন্দ্রের এই জীবনদর্শন সহায়ক হইবে।

জড়জগৎ হইতে জীবজগতের সৃষ্টি এবং জীবজগতের বিবর্তনের ফলে মানুষ ও তাহার সভ্যতার উৎপত্তি। শরৎচন্দ্র গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে সর্বত্রই পুরুষজাতি স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পরাক্রান্ত এবং সেই পরাক্রমের ফলে অবলা স্ত্রীজাতি বলশালী পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। পুরুষ এই বলশালিতার সুযোগ লইয়া নারীকে গৃহে পুরিয়াছে, তাহাকে বলিয়াছে, 'তোমরা পূজার্হা, কারণ তোমরা গৃহের দীপ্তি।' ইহার অর্থ—সুগৃহিণী হওয়া ছাড়া নারীর আর কোন কর্তব্য নাই, একনিষ্ঠ সতীত্ব ছাড়া তাহার আর কোন ধর্ম নাই। পুরুষের সম্পর্কে এই কথা খাটে না, সে নানা ভাবে নানা ক্ষেত্রে তাহার ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের অবকাশ পাইয়াছে এবং একই স্ত্রীর প্রতি অবিচলিত অনুরক্তি তাহার পক্ষে অপরিহার্য ধর্মও নয়, এমন কি পুরুষ সম্পর্কে প্রযোজ্য সতীত্বের কোন প্রতিশব্দও অভিধানে নাই। 'সমাজ নারীর ভুল-ভ্রান্তি এক পাইও ক্ষমা করিবে না, পুরুষের ষোল আনা ক্ষমা করিবে।'

কুলত্যাগিনীদের বিষয়ে শরৎচন্দ্র দুই-তিনটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। 'এই হতভাগিনীদের শতকরা সত্তর জন সধবা।...ইহাদের প্রায় সকলেরই হেতু...অত্যধিক দারিদ্র্য ও স্বামী প্রভৃতির অসহনীয় অত্যাচার উৎপীড়ন।' বার্নার্ড শ' Mrs Warren's Profession নাটকে এই কথাই লিখিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোক পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করে অসংযত লালসার মত্ততাবশে নয়, দারিদ্র্যের তাড়নায়। এই নাটক লিখিত হইয়াছিল ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল চার বছর পর এবং অভিনীত হইয়াছিল ১৯০২ সালে। শ'য়ের এই নাটক খুব আলোড়ন ও আন্দোলনের সৃষ্টি করিলেও সেই সময় তরুণ শরৎচন্দ্র—তিনি শ' অপেক্ষা বিশ বছরের ছোট —ইহার কোন খোঁজখবর রাখিতে পারেন এইরূপ কল্পনা করা যায় না এবং পরবর্তীকালেও তাঁহার রচনায় বা চিঠিপত্রে বার্নার্ড শ'য়ের বিশেষ কোন উল্লেখ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং শরৎচন্দ্র নারী সম্পর্কে যে উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন ইহা তাঁহার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির উজ্জ্বল স্বাক্ষর দেয়।

আর একটি বিষয়েও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বার্নার্ড শ'য়ের দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য দেখা যায়। শরৎচন্দ্র মেয়েমানুষকে শুধু মেয়েমানুষ রূপে দেখেন নাই, তাহাকে

মানুষ হিসাবে দেখিতে চাহিয়াছেন। তাহারও পুরুষের মতই দোষগুণ আছে; সতীত্বই তাহার একমাত্র ধর্ম বা গুণ নহে এবং অসতী হইলেই যে সে ধরার নরক-সিংহদুয়ারে সন্ধ্যাবাতি জ্বালাইবে এইরূপ মনে করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন সতীত্বকে ফেটিশ (fetish) করিয়া তোলা উচিত নয়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে সতীসাধ্বী হইলেই সেই রমণী ভাল লোক হইবে এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই, অবস্থা বিশেষে সতী নারী চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতে পারে এবং নানারকমের অন্যায় কাজ করিতে পারে। ইহারা পতিব্রতা স্ত্রী বা আচারপরায়ণা বিধবা বলিয়াই ইহাদিগকে পূজার্হা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাঁহার নিজের রচনা হইতে রাসমণি ('বামুনের মেয়ে') নয়নতারা ('নিষ্কৃতি') স্বর্ণমঞ্জরী ('অরক্ষণীয়া') দিগম্বরী ('রামের সুমতি') কাদম্বিনী ('মেজদিদি') প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অপর দিকে, অপরিণত 'শুভদা'র কাত্যায়নী বারবনিতা হইলেও তাহার দয়ামায়া ও সুবিবেচনা আছে। তরুণ লেখক তাহাকে উঁচু স্তরে উন্নীত করেন নাই, সাধারণ মানুষ হিসাবেই চিত্রিত করিয়াছেন।

একটু অনুধাবন করিলে বহু পার্থক্যের অন্তরালে বার্নার্ড শ'য়ের ও শরৎচন্দ্রের মতবাদের মধ্যে আরও ঐক্য দেখা যায়। বার্নার্ড-শ' বলিয়াছেন যে নারী দেবীও নহে, দাসীও নহে। সে শুধু মানবজাতির স্ত্রী-সংস্করণ—অর্থাৎ পুরুষের চরিত্রে যে সকল দোষগুণ দেখা যায়, নারীতেও তাই দেখা যাইবে; এবং পুরুষের যে সকল অধিকার আছে, নারীরও তাহাতে দাবী আছে ইহা মানিতে হইবে। উভয়েই যৌনসম্পর্ককে স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু শিরোধার্য করেন নাই। শ' নিজের বিবাহ সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, যৌনমিলনের উদ্দেশ্য তাহার মধ্যে ছিল না; জীবনের অন্য অনেক প্রয়োজন আছে যেখানে ইহার কোন স্থান নাই তাহাও তিনি বলিয়াছেন। 'নারীর মূল্য' গ্রন্থে শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'নারীর সম্মান তাহার নিজের জন্য নহে, তাহার সম্মান নির্ভর করে পুত্রপ্রসবের উপর। পুরুষের কাছে এই যদি তাহার নারীজীবনের একটি মাত্র উদ্দেশ্য হইয়া থাকে ইহা কোন মতেই তাহার গৌরবের বিষয় হইতে পারে না।' অন্যত্রও তিনি একাধিকবার এই জাতীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। নিরুপমা দেবীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। তিনি মনে করিতেন নিরুপমা দেবী যে বালবিধবা হইয়াছিলেন তাহা দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু সেইখানেই তাঁহার জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল এইরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। শরৎচন্দ্রের শিল্পত্ব ও

প্রেরণায়—নিরুপমার ভাষায় শরৎচন্দ্রের কিছু কিছু কিরণ ধার করিয়া—তিনি লেখিকা হিসাবে সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। সেই সার্থকতা উপেক্ষণীয় নয় এবং শরৎচন্দ্র ইহাতে গর্ব অনুভব করিতেন। তিনি সন্তানের জননী হইতে পারেন নাই, স্বামিসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মতে, মেয়ে-মানুষ না হইতে পারিলেও তিনি মানুষ হইতে পারিয়াছেন। এই জন্যই বার্নার্ড শ' এবং শরৎচন্দ্র উভয়ের জীবনদর্শনের মধ্যেই পিউরিটান চিন্তাধারার স্পর্শ অনুভব করা যায়। উভয়েই যৌনসম্পর্ককে গৌণ স্থান দিয়াছেন।

বার্নার্ড শ'য়ের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া শরৎচন্দ্রের জীবনদর্শন আলোচনায় ফিরিয়া আসা যাক। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, যেহেতু নারী দুর্বল সেইজন্য প্রায় সকল ধর্মে নারীকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। 'ইহার ব্যতিক্রম একমাত্র ইস্‌লাম ধর্ম।···মহম্মদ নারী জাতিকে যে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, পুত্রকন্যার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া তুলিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, বিশেষ করিয়া বিধবাকে—যাহার অবস্থা আরব ও ইহুদীদের মধ্যে সবচেয়ে শোচনীয় ও নিরুপায়—তাহাকে দয়া ও ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখিতে হুকুম করিয়া গিয়াছেন এ-সব কথা অস্বীকার করা যায় না।' আমাদের দেশে হিন্দুদের মধ্যে শুধু যে নারীই তাহার যোগ্য মর্যাদা পায় নাই তাহা নহে। সমাজকে জাতিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া উচ্চবর্ণের দ্বারা নিম্নবর্ণের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার ও অপমানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই সকল উৎপীড়নকে পাকাপোক্ত করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে নানা শাস্ত্রগ্রন্থ রচিত হইয়াছে এবং শাস্ত্রালোচনার একমাত্র অধিকারী হইয়াছে উচ্চতম বর্ণ-হিন্দু ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা প্রচার করিয়াছেন, শাস্ত্র অপৌরুষেয়, তাই অপরিবর্তনীয় এবং তাঁহারাই তাহার একমাত্র প্রবক্তা। কিন্তু একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যায় যে, শাস্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন কালের রচিত বিধিনিষেধ প্রবেশ করিয়াছে: অর্থাৎ ইহা সন্দেহের অতীত যে, যুগে যুগে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সুবিধামত নূতন নির্দেশ অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছেন। এই স্তূপীকৃত অন্যায় ও অত্যাচারের বোঝায় হিন্দু সমাজ ভারাক্রান্ত; ইহা মানুষের জীবনযাত্রার পথে কেবল বাধা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। সেই বাধা দূর করিয়া প্রত্যেক মানুষ স্বচ্ছন্দে পথ চলার অধিকার ফিরিয়া পাক—ইহাই শরৎচন্দ্রের জীবনদর্শন।

৩

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। পুরুষ নারীর উপর অবিচার করিয়া আসিয়াছে। উচ্চবর্ণের হিন্দু নিম্নবর্ণের উপর উৎপীড়ন করিয়া আসিয়াছে এবং এই উভয়বিধ অত্যাচারের জন্য শাস্ত্রীয় বুলি আওড়াইয়া আসিয়াছে। ইহাতে সমাজ সমগ্রভাবে দুর্বল, সংকীর্ণ ও জরাজীর্ণ হইয়াছে। হয়ত প্রধানতঃ এই কারণেই হিন্দু যুগে যুগে বিদেশী আক্রমণের দ্বারা পর্যুদস্ত হইয়াছে। আমরা আমাদের প্রাচীন, সনাতন সভ্যতার গৌরব করিয়া থাকি। সেই সনাতন সভ্যতার স্বরূপ শরৎচন্দ্র বহু গ্রন্থে উদ্ঘাটন করিয়াছেন। খুব স্বল্প পরিসরে 'বামুনের মেয়ে'তে যে চিত্র আঁকা হইয়াছে তাহা বিচার করিলেই, যে জীবন-দর্শন শরৎচন্দ্রের প্রতিভাকে উদ্বোধিত করিয়াছিল তাহার সামগ্রিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় পাওয়া যাইবে। কৌলীন্যের ভয়াবহ রূপ দেখিতে পাই প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার কন্যা সন্ধ্যার দুর্গতিতে এবং জ্ঞানদার অপ্রতিরোধনীয় পদস্খলনের মধ্য দিয়া সেবারতা হিন্দু বিধবার স্থান চিহ্নিত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণের শুচিশুদ্ধ গ্রামে অসহায় দুলে পরিবার আশ্রয় পায় নাই এবং উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণ যুবক অরুণ ঘরছাড়া হইয়াছে। এই সমাজের শিরোমণি হইলেন জমিদার স্বভাবকুলীন গোলোক চাটুয্যে—নীচতায়, শঠতায়, নিষ্ঠুরতায় যাঁহার জোড়া অন্য যে কোন সভ্য সমাজে দুর্লভ। এই জন্যই শরৎসাহিত্যের মহানায়ক সব্যসাচী স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, আমাদের অতীত ইতিহাসের সম্পর্কে গৌরব করার কিছু নাই। চিরাগত আচারনিষ্ঠার মূর্ত প্রতীক বিপ্রদাসের মধ্যে শরৎচন্দ্র অন্য রকমের চিত্র আঁকিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সেই চিত্র সার্থক হয় নাই। বরং চলতি হাওয়ার পন্থী কমল অনেক বেশী সজীব।

'সমাজতত্ত্বের ছাত্র' হইলেও শরৎচন্দ্র সমাজের উৎপত্তি সম্পর্কে কোন গবেষণা করেন নাই। কতকগুলি মানুষ একসঙ্গে যূথবদ্ধভাবে থাকিতে গেলেই কতকগুলি নিয়মকানুনের দরকার এবং এই সকল বিধিনিষেধের সমষ্টির নামই 'সমাজ ধর্ম'। ইহাকে অপৌরুষেয়, অপরিবর্তনীয় বলিয়া মানিয়া লইবার কোন কারণ নাই। যাঁহারা এই কথা বলিয়াছেন তাঁহারাও ছলনা করিয়াছেন। পরিবর্তনশীলতা মানুষের ধর্ম, বোধ হয় প্রাণেরই ধর্ম। কাজেই যুগে যুগে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের পরিবর্তন হইয়াছে; শুধু পরিবর্তনকারীরা নিজেদের প্রক্ষিপ্ত শ্লোককে বেদবাক্য, 'ঋষিরুবাচ' বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন।

পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী; বিতর্ক শুধু এই পরিবর্তনের মাপকাঠি লইয়া।

শরৎচন্দ্র মনে করেন এই পরিবর্তনে উদর ও জিহ্বার অর্থাৎ ভোগলিপ্সার উপর নির্ভর না করিয়া বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তির সাহায্য লওয়া সঙ্গত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমাদের দেশের দলপতিরা নিজেদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বিধিনিষেধ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই ভাবেই সময় এবং সুযোগ বুঝিয়া পরিবর্তন ও সংশোধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইভাবেই চাতুর্বর্ণ্য, কৌলীন্য, অস্পৃশ্যতা, পুরুষের বহু বিবাহ, নারীর অপরিত্যাজ্য সতীত্ব ধর্ম, বিধবার সহমরণ বা আজীবন ব্রহ্মচর্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এইভাবেই সমাজ অধঃপাতের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের মতে 'মূল্যের একটা নৈসর্গিক নিয়ম আছে ··কৃত্রিম উপায়ে [যেমন 'বলবানের গায়ের জোরে'] তাহাকে বাড়াইলে কমাইলে শেষ পর্য্যন্ত যে সুফল ফলে না, সেন-রাজার কৃত্রিম কুলীন-করা বামুনের দাম যে ক্রমাগত বাড়িয়াই চলে নাই, পেরুর ইঙ্কার জোর করা আভিজাত্য যে তাহাকে ধ্বংস না করিয়া ছাড়ে নাই এই সত্য যে-কেহ··· অস্বীকার করিবে সেই অনিবার্য মৃত্যুর পথেই দিন দিন ধাবিত হইবে, তাহাতে আর সংশয় মাত্র নাই।' ইসলামধর্ম নারীর প্রতি যে মর্যাদা দিয়াছে ·· ৎচন্দ্র তাহার সপ্রশংস বিবরণ দিয়াছেন ; কোন ইসলামধর্মীয় লেখকও তাহার বেশি কিছু বলিতে পারিতেন না। কিন্তু যখন ভেদনীতিতে বিশ্বাসী ইংরেজ সরকার ১৯৩৫-৩৬ সালে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মারফতে হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে অবিচার করিয়া মুসলমানদের কিছু সুবিধা দিলেন, তখন তিনি মুসলমান-সমাজকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, 'অন্যায়, অবিচার—এক জনের প্রতি হলেও সে অকল্যাণময়। তাতে শেষ পর্যন্ত না মুসলমানের, না হিন্দুর, না জন্মভূমির—কাহারও মঙ্গল হয় না।' এই Communal Award বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পরিণতি দেশবিভাগ।

দেশবিভাগের মূল্য দিয়াই আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। কিন্তু সব্যসাচীর মুখ দিয়া শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ কথা নয়। সেইদিন শরৎচন্দ্র যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এই উপমহা-দেশের বিগত তিন বা চার দশকের ইতিহাস তাহার তাৎপর্যের সাক্ষ্য দেয়।

মানুষ সংঘবদ্ধ হইতে চাহিলেই তাহাকে সমাজ ও সামাজিক নিয়মতন্ত্র রচনা করিতে হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মতে, মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্যই সমাজ, সমাজের সুবিধার জন্য মানুষ জন্মগ্রহণ করে না বা বাঁচিয়া থাকে না। সুতরাং যেদিন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় সেইদিন ব্যক্তির প্রয়োজনের জন্য সমাজকে

প্রসারিত হইতে হইবে, সমাজকে অটুট রাখিবার জন্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সংকীর্ণ করিলে চলিবে না। ইহাই 'সমাজধর্ম' এবং ইহাই তাহার 'মূল্য'। এই মত শরৎচন্দ্র নানা প্রসঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছেন। একটি উদ্ধৃতি দিলেই যথেষ্ট হইবে: 'আমি বলি মেয়েমানুষ যদি মানুষ হয় এবং স্বাধীনতায়, ধর্মে, জ্ঞানে—যদি মানুষের দাবী আছে স্বীকার করি, ত এ দাবী আমাকে মঞ্জুর করতেই হবে, তা সে ফল তার যাই হোক। হাড়ী ডোমকে যদি মানুষ বলতে বাধ্য হই এবং মানুষের উন্নতি করার অধিকার যদি মানি, তাকে পথ ছেড়ে আমাকে দিতেই হবে, তা সে যেখানেই গিয়ে পৌছাক। আমি বাজে ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে কিছুতেই তাদের হিত করতে যাইনে।'

ব্যক্তির সঙ্গে যদি সমাজের বিরোধ হয়, তখন কোন একজন বা মুষ্টিমেয় কয়েকজন যাহাকে সত্য বলিয়া মনে করিবে তাহা নির্ভয়ে প্রকাশ করিবার এবং তদনুসারে কাজ করিয়া যাইবার অধিকার মানিতে হইবে। যে তাহা মানিতে পারে সেই 'সত্যাশ্রয়ী' এবং সত্যাশ্রয়ীর মূলমন্ত্র 'অভয় মন্ত্র'। শরৎচন্দ্র শেষ জীবনে গান্ধীবাদ হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তবু 'অভয় আশ্রমে'র অভয় মন্ত্রকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। সাহিত্যের রসোপলব্ধির যেমন আশ্রয় সহৃদয়ের ব্যক্তিগত অনুভূতি, তেমনি সত্যের উৎসও স্বাধীন ব্যক্তিগত ভাবনা ও যুক্তি। মহাত্মা গান্ধী হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের দ্বারা সমস্ত ভারতের সম্মিলিত শক্তিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে নিয়োজিত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং এই জন্য খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে ভারতবর্ষকে সামিল করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে মস্ত বড় ফাঁকি ছিল; তুর্কীর খলিফার সঙ্গে ভারতবর্ষের কোন সংযোগ ছিল না আর নিজের দেশেই খলিফা ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছিলেন। সেই ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক প্রশ্নের সঙ্গে বর্তমান আলোচনার সম্পর্ক গৌণ। শরৎচন্দ্রের বক্তব্য শুধু এই যে, সংখ্যার দ্বারা বা শুধু প্রাচীনতার দ্বারা সত্য নির্ধারিত হয় না। এই সীমিত পটভূমিতে শরৎচন্দ্রের কয়েকটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করিলেই তাঁহার জীবনদর্শনের ব্যাপক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। 'দেশের মুক্তিসংগ্রামে কি দেশের দেশশুদ্ধ লোকেই কোমর বাঁধিয়া লাগে? না ইহা সম্ভব, না তাহার প্রয়োজন হয়? আমেরিকা যখন স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিয়াছিল, তখন দেশের অর্ধেকের বেশি লোকে ত ইংরাজের পক্ষেই ছিল। আয়র্লণ্ডের মুক্তিযুদ্ধে কয়জনে যোগ দিয়াছিল? যে বলশেভিক গভর্নমেণ্ট আজ রুশিয়ার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছে, দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে সে ত

এখনও শতকে একজনও পৌঁছে নাই।...কেবলমাত্র ভিড়ের পরিমাণ দেখিয়াই সত্যাসত্য নির্ধারিত হয় না, হয় শুধু তাহার তপস্যার একাগ্রতার বিচার করিয়া।'

৪

নারীকে সন্তানের জন্মদান করিতে হয় এবং প্রতিপালন করিতে হয়। এই জৈবিক কারণেই সে পুরুষ অপেক্ষা দুর্বল এবং এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া পুরুষ শুধু যে তাহার উপর উৎপীড়ন করিয়াছে, তাহা নহে, তাহার সম্মুখে সতীত্ব আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছে, যেন ইহাই তাহার একমাত্র ধর্ম এবং অত্যাজ্য ধর্ম। শরৎচন্দ্র সতীত্বকে ধর্ম বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু ইহাই একমাত্র ধর্ম তাহা স্বীকার করেন নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সতীত্ব আর একনিষ্ঠ প্রেম এক বস্তু নয়। রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী প্রভৃতিকে সতী নারী বলা যাইতে পারে না, কিন্তু তাহাদের প্রেমের একনিষ্ঠতা অনস্বীকার্য। শরৎচন্দ্রের এই মত তাঁহার সৃষ্টিতেও প্রতিফলিত হইয়াছে এবং সেই সৃষ্টিকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। এই কারণেই তাঁহার প্রেমের চিত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর মধ্যে একটা অনতিক্রম্য ব্যবধানের পরিচয় পাওয়া যায়। এইজন্যই তিনি একাধারে বাস্তব-মুখী, পিউরিটান এবং রোমান্টিক। আমরা নারী জাতিকে কামনার বস্তু বলিয়া মনে করি এবং সেই কারণেই তাহাকে 'কামিনী', 'রমণী' প্রভৃতি আখ্যা দিয়া থাকি। শরৎচন্দ্রের নারী মেয়েমানুষ, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও বড় কথা সে মানুষ।

নারীর দুর্বলতা এবং সন্তান প্রসব ও প্রতিপালনের জন্য তাহার অপরিহার্যতা —ইহারই জন্য সে তাহার যথার্থ মূল্য পায় নাই। শরৎচন্দ্র মনে করেন যে, পুরুষ যদি স্নেহ ও প্রীতির দ্বারা নারীর দুর্বলতাকে ঢাকিয়া দিত তাহা হইলে সে হয়ত যোগ্য মর্যাদা পাইত। শরৎচন্দ্রের নিজের কথা উদ্ধার করিলেই তাঁহার বক্তব্য স্পষ্ট হইবে: 'আমাদের দেশে বিজ্ঞজনেরাও বলিয়াছেন, ছয়টা রসের মধ্যে মধুর রসটাই শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠ রসের উৎপত্তি মানবের যৌনবন্ধন হইতে। বস্তুতঃ সামাজিক মানব যত প্রকারের সম্বন্ধে রসভোগ করিতে শিখিয়াছে, সর্বশ্রেষ্ঠ এই মধুর রসের মধ্যেই যাবতীয় রসের সমাবেশ ও বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়...।' ইহাও বলিয়াছেন, 'নারীর মূল্য নির্ভর করে পুরুষের স্নেহ

সহানুভূতি ও ন্যায়ধর্মের উপরে। ভগবান্ তাহাকে দুর্বল করিয়াই গড়িয়াছেন, বলের সেই অভাবটুকু পুরুষ এই সমস্ত বৃত্তির মুখের দিকে চাহিয়াই সম্পূর্ণ করিয়া দিতে পারে, ধর্মপুস্তকের খুঁটিনাটি ও অবোধ্য অর্থের সাহায্যে পারে না।'

শরৎচন্দ্র এখানে সামান্য একটু ভুল করিয়াছেন, যদিও তাহার সঙ্গে তাঁহার যুক্তির কোন সম্পর্ক নাই। তবু সেই ভুলটির উল্লেখ করিয়াই মূল বিতর্কের অবতারণা করিব। বিজ্ঞজনেরা অর্থাৎ সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা শৃঙ্গার, হাস্য, বীর, করুণ প্রভৃতি আটটি বা নয়টি কাব্যরসের কথা বলিয়াছেন। সেখানে মধুর রস বলিয়া কোন রসের উল্লেখ নাই। পরবর্তীকালে বৈষ্ণবেরা শৃঙ্গার হইতে উৎপন্ন মধুর রসের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ইহার সঙ্গে অম্লমধুরতিক্তকষায় প্রভৃতি ছয় রসের কোন সম্পর্ক নাই। সে যাহাই হউক, যৌনমিলন হইতে যে নরনারীর সম্পর্কে মাধুর্যের উৎপত্তি, এই মৌলিক বাস্তব সত্যকে তিনি স্বীকার করিয়া লইলেও তাঁহার অনেক রচনায় তিনি শৃঙ্গার রসকে বাদ দিয়া মধুর রসের অবতারণা করিয়াছেন। চন্দ্রমুখী, বিজ্‌লীবাই দেহোপজীবিনী, কিন্তু তাহাদের প্রেমে কামগন্ধ নাই। গুণান ও হেমনলিনীর সম্পর্কের বর্ণনায় শরৎচন্দ্র স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিয়াছেন যে মহৎ প্রেম শুধু কাছে টানে না, দূরেও সরাইয়া দেয়। শৃঙ্গার রস ও মধুর রসের বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিবার জন্যই যেন সরোজিনী-উপাখ্যানের অবতারণা করিয়া শরৎচন্দ্র সাবিত্রীকে সতীশের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দিয়াছেন। 'অনুরাধা' গল্পে শৃঙ্গাররসের সম্ভাবনা আভাসিত হইয়াছে, কিন্তু জোর দেওয়া হইয়াছে মধুর রসের উপরে। ইহার জন্য গল্পটি 'ফেকাশে' হইয়া গিয়াছে। এই কারণে শরৎচন্দ্রের পিউরিটান বা রিরংসাবিমুখ মনোভাব তাঁহার শিল্পকে খানিকটা সীমিত করিয়াছে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে অন্নদাদিদি ও অভয়ার কাহিনীতে এই প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু অন্য দুইটি কাহিনীতে পূর্ণতর রসসৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের মধ্যে নানা ব্যবধান রচিত হইয়াছে, কিন্তু নানাভাবে ঔপন্যাসিক মধুর রসকে শৃঙ্গাররসের পটভূমিকায় অঙ্কিত করিয়া রতিভাবের করুণ অভিব্যক্তি দিয়াছেন। রাজলক্ষ্মী নানা জায়গায়, কখনও আভাসে ইঙ্গিতে, কখনও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছে যে সে নিজের সন্তানের জননী হইতে চায় এবং অন্য কোন নারী শ্রীকান্তের স্ত্রী অর্থাৎ শয্যাসঙ্গিনী হইতে পারে এই কল্পনায় সে ভীত, [illegible] হইয়া পড়িয়াছে। এই ঈর্ষার মধ্য দিয়া তাহার ব্যর্থ যৌনমিলনেচ্ছা

ধ্বনিত হইয়াছে। সুনন্দার সহিত সে যে ধর্মচর্চা করিয়াছে তাহাতে শ্রীকান্তের কোন স্থান নাই। এইভাবে অবহেলিত হইয়া শ্রীকান্ত তাহাকে ত্যাগ করিয়া পুঁটুকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া সে প্রিয়তমের অপরিপক্ক উপলব্ধিকে ব্যঙ্গ করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে, সে পরজন্মে বিশ্বাস করে এবং পরজন্মে যাহাতে শ্রীকান্তকে সম্পূর্ণরূপে পাইতে পারে সেই জন্যই তাহার এই জন্মের ধর্মচর্চা। শ্রীকান্ত যাহাকে অবহেলা মনে করিয়াছে তাহা শ্রীকান্তকে পাইবার জন্য তপস্যারই অঙ্গ। এইভাবে মধুররস শৃঙ্গাররসের অঙ্গ হইয়াছে। কমললতার ইতিহাসে এই দুই রসের মিলন ও বিচ্ছেদের যে চিত্র আঁকা হইয়াছে তাহার মধ্যে শোক ও জুগুপ্সা সঞ্চারিত হওয়ায় শান্তরসে কাহিনীর উপসংহার হইয়াছে। অপরের কাছে মন্মথ সরকার যে ভাবেই প্রতিভাত হউক, ঊষাঙ্গিনী তাহার প্রতি কায়মনোবাক্যে আকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং ক্রমে মধুররস শৃঙ্গাররসে সম্পূর্ণতা লাভ করিল। ব্যবহারিক জীবনের ভাষায় বলা যায় প্রণয় যৌনমিলনে পরিপূর্ণতা লাভ করিল। ইহার পরেই মন্মথ সরকারের চরিত্রের গর্হিত দিকটা প্রকাশিত হইয়া পড়ায় ঊষাঙ্গিনী-কমললতার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল, যে সন্তান উভয়ের মধ্যে সংযোগের সেতু হইতে পারিত সে বাঁচিল না এবং এই সকল পরস্পরবিরোধী ভাবের সমন্বয়ের ফলে কমললতার মনে নির্বেদের সৃষ্টি হইল। মধুররসে যে কাহিনীর আরম্ভ নানা বিচিত্র রসের মধ্য দিয়া তাহা শান্তরসে পরিসমাপ্তি লাভ করিল।

এই দিক দিয়া বিচার করিলেও 'গৃহদাহ' উপন্যাসের জটিলতা ও রসঘনতা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উপন্যাসের প্রারম্ভে মহিম ও অচলার মধুর ও সুদৃঢ় প্রেমের চিত্র আমাদিগকে আকর্ষণ করে এবং যে ভাবে সুরেশ আসিয়া এই প্রণয়ের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করিল এবং ব্যর্থ হইয়া সাময়িকভাবে নিরস্ত হইল তাহাতে আমরা যুগপৎ আনন্দিত ও শঙ্কিত হইলাম। প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর মধুর রস বিবাহে নরনারীর পরিপূর্ণ মিলনে সার্থকতা লাভ করিল। কিন্তু ইহার পর সুরেশের অভ্যাগমে, মধ্যবর্তিনী' মৃণালের রসিকতায়, স্বল্পবাক্ মহিমের আপাত-ঔদাসীন্যে এই নবদম্পতির যৌনমিলনের মাধুর্য সাময়িকভাবে অন্তর্হিত হইয়া গেল। দুই-একটি ছোট ইঙ্গিতের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র এই তিক্ততার ব্যঞ্জনা দিয়াছেন। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি একদিন সাময়িক বিরক্তিতে অচলা সুরেশকে বলিয়া ফেলিয়াছিল, 'আমাকে তোমরা নিয়ে যাও—যাকে ভালবাসিনে তার ঘর করার জন্যে আমাকে তোমরা ফেলে রেখে দিও না।' পরদিন সে যখন যথা-

নিয়মে তাহার ও মহিমের শয্যা প্রস্তুত করিতে ঘরে ঢুকিল, 'তখন সমস্ত মনটা যে তাহার কোথায় এবং কি অবস্থায় ছিল মানবচিত্ত সম্বন্ধে যাহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে তাহারই অগোচর রহিবে না।' যৌনমিলনের সঙ্গে মধুররসের সম্পর্ক কত নিবিড় শয্যারচনা সম্পর্কিত এই ব্যঞ্জনাময় পরোক্ষ উক্তিতে তাহাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

সুরেশ অচলার দাম্পত্য জীবনে অনধিকার প্রবেশ করিয়া যে তাণ্ডবের সৃষ্টি করিল তাহার মধ্যে মধুর রসের অনুপ্রবেশের অবকাশ কম। বরং ইহাদের নূতন সম্পর্কের প্রাথমিক পর্যায়ে যে শঠতা, লুকোচুরি ও মিথ্যা অভিনয় ছিল তাহাতে অচলা অস্বস্তিই বোধ করিয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে তাহার প্রতি সুরেশের যে প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার মাধুর্যই তাহাকে আকৃষ্টও করিয়াছে ; তাই পরস্ত্রীলুব্ধ পুরুষের অসঙ্গত আচরণকে সে সবলে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই। ছলনা যখন চরম বিশ্বাসঘাতকতায় রূপান্তরিত হইয়াছে তখন তাহার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গিয়াছে। যে পিচ্ছিল পথে সে এখন পা বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছে তাহার চরম পরিণতি তাহাকে অভিভূত, বিভ্রান্ত করিয়াছে এবং পরে সে যে শূন্যতা বোধ করিয়াছে তাহা সাহারা মরুভূমি হইতেও ভয়ঙ্কর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ব্যভিচারীর প্রতি তাহার স্নেহ একেবারে লুপ্ত হয় নাই, বিতৃষ্ণার মধ্যেও সুরেশের সুগভীর প্রেমকে সে স্বীকার করিয়াছে এবং এইভাবে বিপথগামী শৃঙ্গার ও মাধুর্য তাহার জীবনের চরম ট্র্যাজেডি রচনা করিয়াছে। সুরেশের ট্র্যাজেডি আবার অন্য রকমের। সে নাস্তিক, দৈহিক মিলনের মধ্যেই সে চরম সার্থকতা খুঁজিয়াছিল। কিন্তু যে মিলনে মনের সম্মতি নাই তাহা যে কত বিস্বাদ, কত পীড়াদায়ক ইহা সে বুঝিতে পারিল পরিপূর্ণ ভোগের পরিসমাপ্তিতে। তাই যে সুন্দরী রমণীর মাধুর্য তাহাকে উন্মত্ত করিয়াছিল, 'আজ সে তাহার মনকে সম্মুখে আকর্ষণ করিল না, বরং পীড়ন করিয়া পিছনে ঠেলিতে লাগিল।' এই ট্র্যাজেডি করুণ, বীভৎস, ভয়ানক তবু মধুর।

৫

শরৎচন্দ্র একাধিকবার বলিয়াছেন যে, তিনি সাহিত্যিক, দার্শনিক নহেন। সুতরাং তিনি সমস্যার চিত্র আঁকিয়াছেন, কিন্তু সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেন নাই। তবু যিনি সমস্যার গভীরে প্রবেশ করেন, তিনিই সমাধানের আভাস দেন। সেই হিসাবে সাহিত্যিকও অংশত দার্শনিক। সমাজ নারীকে তাহার যথোচিত মূল্য দেয় নাই। তিনি ইহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশে নারী যে অনেক বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া অনেক ব্যাপারেই পুরুষের সামিল হইয়াছে শরৎচন্দ্রের রচনার ভারতব্যাপী জনপ্রিয়তা সেই মুক্তির আন্দোলনকে সঞ্জীবিত করিয়া থাকিবে। কিন্তু তবুও দেখা যায় যে, সামাজিক উৎপীড়নই মানুষের দুর্ভাগ্যের একমাত্র হেতু নহে। সমাজ রাজলক্ষ্মীর উপর যে উৎপীড়ন করিয়াছিল নিজ চেষ্টায় রাজলক্ষ্মী তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর্থিক দিক হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এমন কি প্রথম দিকের সঙ্কোচ কাটাইয়া শ্রীকান্ত তাহাকে স্ত্রী বলিয়াও পরিচয় দিয়াছিল। ইহার পরও যে বাধা তাহাদের মিলনকে অসম্পূর্ণ রাখিয়াছে তাহা রাজলক্ষ্মীর ব্যক্তিগত ধর্মবোধ। এমন সমাজ কল্পনা করা কঠিন যেখানে ধর্মবিশ্বাসী লোক থাকিবে না এবং ধর্মশাস্ত্র সব সময় সকল ব্যক্তির হৃদয়াবেগের সঙ্গে তাল রাখিয়া বিধিনিষেধ রচনা করিবে ইহাও সম্ভব নয়। কমললতা ও অচলার সমস্যাও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। ইহাদের জীবনের দুর্ভাগ্যময় পরিণতির মূলে রহিয়াছে মন্মথ সরকারের অচিন্তনীয় শঠতা ও অচলার হৃদয়বৃত্তির অদ্ভুত জটিলতা। সুতরাং পথের দাবীকে মিটাইতে হইলে তাহাকে রোধ করারও প্রয়োজন হইবে।

এই প্রসঙ্গে অন্যদিক হইতে শরৎচন্দ্রের অবাধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-ভিত্তিক দর্শনের সীমা নির্দেশ করা যাইতে পারে। আমাদের সমাজে জমিদারি প্রথা, বর্ণাশ্রম, অস্পৃশ্যতা, জীর্ণ শাস্ত্রের অনুশাসন—এই সকল ব্যবস্থাপনার ফলে বহু অন্যায় পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। শরৎচন্দ্র ইহাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া এই পুঞ্জীভূত আবর্জনা দূরীকরণের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আবার ইহাও মানিতে হইবে যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অংশতঃ ক্ষুণ্ণ করিয়াই সমাজের সৃষ্টি হয় এবং সমাজ যে বিধিনিষেধ রচনা করে তাহা কোন একজনের সুবিধা দেখিয়া চলে না বলিয়াই সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য হয়। এই সব বিধিনিষেধের পরিবর্তন দরকার, কিন্তু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া যে নূতন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে তাহার মধ্যেও কেহ পথ চলার সম্পূর্ণ অবাধ অধিকার দাবী করিতে

পারে না। কোন ব্যবস্থা প্রাচীন বলিয়াই তাহাকে শিরোধার্য করা যেমন সঙ্গত হইবে না আবার ক্ষণই সত্য বলিয়া ক্ষণিক মোহের ভিত্তিতেই ব্যক্তির সমগ্র জীবন গড়িয়া তোলা যায় না বা সমাজের নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ক্ষণিক মোহ বা আকর্ষণের উপর নির্ভর করিয়া শিবনাথ ও শিবানী যে শৈববিবাহে মিলিত হইয়াছিল তাহার ক্ষণভঙ্গুরতাই এই দর্শনের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রমাণ করে। রাজেন কমলকে যে কথা বলিয়াছিল ইহাই 'পথের দাবী'র দর্শনের উপর সবচেয়ে অকাট্য যুক্তি, 'কর্মের জগতে মানুষের ব্যবহারের মিলটাই বড়, হৃদয় নয়।···নিয়মের শাসন শৃঙ্খল···একে খাটো করলে হৃদয়ের নেশার খোরাক যোগানো হয়। সে উচ্ছৃঙ্খলতারই নামান্তর।' শরৎচন্দ্র অনেকটা সপ্রশংসভাবে ১৯১৭ সালের সোভিয়েট বিপ্লবের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকই সেই বিপ্লবের অংশীদার হইয়াছিল। কিন্তু বিপ্লব সাধন এক বস্তু আর বিপ্লবোত্তর শাসনব্যবস্থা অন্য বস্তু। শরৎচন্দ্র বলশেভিক গভর্ণমেণ্টের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু সেই সরকারের আর যে কৃতিত্বই থাক, ইহা কি নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, রুশদেশে বুদ্ধিজীবী হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ লোক জাতিধর্ম এবং দলনির্বিশেষে জীবনযাত্রায় অবাধ স্বাধীনতা পাইয়াছে অথবা তাহাদের চলার পথ অব্যাহত হইয়াছে? ১৯১৭ সালের মহাবিপ্লবের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে ১৯৭৭ সালে কোন কোন বিদগ্ধ সমালোচক তো বলিয়াছেন যে, লেনিন এই সময় জীবিত থাকিলে হয়ত নূতন বিপ্লবের কথা চিন্তা করিতেন! সাহিত্য সমালোচনাকে রাজনৈতিক বিতর্কের দ্বারা কণ্টকিত করা উচিত হইবে না। সুতরাং এই প্রসঙ্গ ছাড়িয়া শুধু শরৎসাহিত্যের বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কাম্য হইলেও প্রতিপদে তাহাকে সঙ্কুচিত করিতে হয় এবং এই আপসরফার মধ্য দিয়াই ব্যক্তিজীবনও সার্থকতা লাভ করে। কমলের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সব্যসাচীর রাজনৈতিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য মানুষের জীবনের ও ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তাঁহার বিপ্লবী দল দুইটি কঠোর আইন পাস করিয়াছে: তাঁহার কার্যের কোন সমালোচনা করা যাইবে না এবং তাঁহার বিরুদ্ধে কোনরূপ বিদ্রোহের চেষ্টার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড! ইহাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি বলা চলে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে সব্যসাচী ও কমল—স্বাধীনতার এই দুই বিভিন্ন পথিক একই অনতিক্রম্য বাধার সম্মুখীন হইয়াছে।

৬

বর্তমান আলোচনায় নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ আছে। ভরসা করি রবীন্দ্রনাথের শরৎ-সমালোচনা দিয়াই গ্রন্থ শেষ করিলে বেমানান হইবে না। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ কবি, তিনি বিশ্ববরেণ্য কবি। তিনি একটি কবিতায় মালতী নাম্নী এক 'সাধারণ মেয়ে'র জবানিতে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সমালোচনা করিয়াছেন। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের রচনা হইলেও কবিতাটি 'সাধারণ' পাঠকসমাজে সুপরিচিত নয়; অন্ততঃ ইহার তাৎপর্যের বিশ্লেষণ ও বিচার কোথাও দেখি নাই। অপরপক্ষে, ইহাও বলা যাইতে পারে, ইহা রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার একটি এবং ইহা তাঁহারই একটি মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে, শরৎচন্দ্রের কথা শুধু ইহাকে সরসতা দান করিবার জন্যই উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এই কৌতুকোজ্জ্বল কবিতাকে গুরুগম্ভীর সমালোচনা মনে করিয়া বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলে হয়ত রসোপলব্ধির বিকারেরই পরিচয় দেওয়া হইবে। আবার ইহাও সত্য যে, শরৎচন্দ্রের উল্লেখ এত স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ যে তাহা একেবারে তাৎপর্যহীন হইতে পারে না এবং 'সাধারণ মেয়ে'র অনুরোধের মধ্য দিয়া শরৎসাহিত্যের তাৎপর্যের একটি প্রধান সূত্রেরও সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

'সাধারণ মেয়ে' ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের কাছে আবেদন করিতেছে:

তোমাকে দোহাই দিই
একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি।
বড় দুঃখ তার
তারো স্বভাবের গভীরে
অসাধারণ যদি কিছু তলিয়ে থাকে কোথাও
কেমন করে প্রমাণ করবে সে
এমন কজন মেলে যারা তা ধরতে পারে।

এই মেয়েটির 'কাঁচা বয়স'; সে নালিশ করিয়াছে যে, শরৎচন্দ্র কাঁচা বয়সের কোন মেয়ের কথা লিখেন নাই। বরং তিনি পঁয়ত্রিশ বছরের মহিলাকে পঁচিশ বছরের সামিল করিয়াছেন। কথাটার মধ্যে খানিকটা যথার্থতা আছে; রমা, রাজলক্ষ্মী, কমললতা, সাবিত্রী, ষোড়শী—ইহারা কেহই কাঁচা বয়সের মেয়ে নয়; রাজলক্ষ্মী তো নিজেই কবুল করিয়াছে যে সাতাশ বছর পার করিয়া সে আর যৌবনের দাবী করিতে পারে না। বোধ হয় শুধু 'অরক্ষণীয়া'র জ্ঞানদার

মধ্যে শরৎচন্দ্র 'কাঁচা বয়সের মায়া' এবং সেই বয়সের মেয়ের দুঃখের কথা লিখিয়াছেন।

কিন্তু এই আনুষঙ্গিক আপত্তি বাদ দিলে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, শরৎচন্দ্রের প্রধান নায়িকারা কেহই সাধারণ মেয়ে নয়। তিনি পল্লীজীবনের কথা, দরিদ্রের কথা, সাধারণ লোকের আটপৌরে জীবনযাত্রার কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার নায়িকারা প্রায় সবাই অনন্য-সাধারণ। আবার অনন্যসাধারণ হইলেও তাহাদের মধ্য দিয়া সাধারণ মেয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হইয়াছে। রাজলক্ষ্মী কাঁচা বয়সে খুব সাধারণ ঘরের, অথবা তাহার অপেক্ষাও নিম্নস্তরের ঘরের মেয়ে ছিল। ঘটনাচক্রে সে অসাধারণ পরিবেশের আবর্তে আন্দোলিত হইল, তাহার পুরাতন পরিচয় মুছিয়া গেল, সে যেন অন্য জগতে প্রবেশ করিল। কিন্তু সেইখানেও দেখা গেল তাহার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিশিয়া আছে সাধারণ রমণীর একনিষ্ঠ প্রেম, ধর্মবোধ বা সংস্কার এবং মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা। অলকার প্রাথমিক অবস্থা রাজলক্ষ্মীর মতই। সেও অচিন্তিতপূর্ব ঘটনা সন্নিবেশে অসাধারণ হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই নূতন পরিবেশে তাহায় অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে ; ষোড়শী ভৈরবী ভৈরবীসম্প্রদায়ের মধ্যেও একেবারে খাপছাড়া। আবার ঘটনাচক্রে তাহার বাহিরের পরিবেশ যখন আর একবার পরিবর্তিত হইল তখন দেখা গেল তাহার চিত্ত সাধারণ নারীর প্রণয় ও মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হইয়াছে। এই সাধারণত্বই তাহার অসাধারণত্ব। 'পথের দাবী'র সুমিত্রার অতীত যেমন বিচিত্র, তাহার বর্তমান তেমনি বিপদসঙ্কুল ও অভিযান-চঞ্চল এবং তাহার ব্যক্তিত্বও তেমনি বিস্ময়কর। কিন্তু যেদিন তাহার দয়িত নিরুদ্দেশ যাত্রায় হয়ত চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন, সেইদিন তাহার নির্বাক বেদনা ও অবরুদ্ধ অশ্রু লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, ভারতী বা যে কোন কাঁচা বয়সের সাধারণ রমণীর মতই সে দুর্বল ও 'প্রণয়ভীরু'।

ইহাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের লক্ষণ। আমাদের দেশের সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি রমণী অলৌকিক শক্তিসম্পন্না নায়িকা। আবার যুগে যুগে সাধারণ মেয়েরা ইহাদের মধ্যে তাহাদের নিজেদের স্বরূপ ও আদর্শ আবিষ্কার করিয়াছে। ইউরোপীয় সাহিত্যেও দেখিতে পাই মিডিয়া, ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রা প্রভৃতি অসাধারণ নায়িকার বিস্ময়কর বহিরাবরণের অন্তরালে সাধারণ রমণীর রাগদ্বেষাদি চিত্রিত হইয়াছে, আবার নোরা, এমা বোভারী প্রভৃতি অতি সাধারণ রমণী মহা-

কাব্যোচিত বিশালতা লাভ করিয়াছে। শরৎ-সাহিত্যও এই সাধারণত্ব ও অসাধারণত্বের সম্মিলনেরই সাক্ষ্য বহন করে। এইখানেই তাহার বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'শেষের কবিতা'র অমিত ও লাবণ্যের মিলন ও বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া প্রাত্যহিক জীবনের ভালো-মন্দ মিশানো সচরাচরতা এবং অসীমের জন্ম আকাঙ্ক্ষার সমন্বয়ের চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই কাব্যধর্মী উপন্যাসে নানা ভাবের বিশ্লেষণ বা স্তরনির্দেশের পরিচয় নাই। সহসা অমিত ও লাবণ্য কেতকী ও শোভনলালকে বরণ করিয়া প্রত্যহের ম্লানস্পর্শের মধ্যে মিশিয়া গেল। কালের যাত্রার প্রাক্কালে অমিত বলিয়া গেল :

জীবন আঁধার হল, সেই ক্ষণে পাইনু সন্ধান
সন্ধ্যার দেউল দীপ চিত্তের মন্দিরে তব দান।
বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরি প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে।

শরৎচন্দ্রের রচনায় বিভিন্ন ভাব ও রস আরও সংসক্ত ও জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে। অংশতঃ 'শেষের কবিতা'র ভাষা উদ্ধার করিয়া বলা যাইতে পারে, 'যা মোর ধূলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে' তাহারই আনন্দ ও বেদনা, কালিমা ও বিশুদ্ধতা, সংঘাত ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়া তিনি প্রেমের 'অমৃত মূরতি' গড়িয়াছেন।